হোমিও সাথী

ডাঃ এস. পি. দে

ভূমিকা

এই প্রবন্ধ সংকলন পুস্তিকাকারে প্রকাশের কোনো পরিকল্পনা আমার কোনদিনই ছিল না। হোমিও-জ্যোতি, সর্বভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সংস্থার পত্রিকা এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান সভায় ভাষনের জন্য হোমিওপ্যাথির অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকায় স্বাভাবিক কারণেই এর ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছিল। সুধী সতীর্থ বর্গ এবং আগ্রহী ছাত্র-সমাজের ক্রমাগত তাগিদে এগুলি একত্র গ্রথিত করায় প্রয়াসী হয়েছি। যে সব পত্রিকায় এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সেই সব পত্রিকার প্রকাশক, সম্পাদক ও কর্তৃপক্ষের নিকট তাই আমার অশেষ ঋণ এবং যাদের আগ্রহাতিশয্যে এই সংকলনের প্রকাশ বাস্তবে রূপ লাভ করলো তাঁদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। আরও কিছু নতুন প্রবন্ধ সংযোজন করলে হয়ত সুষ্ঠু পারস্পর্য বজায় রাখা সম্ভব হতো। কিন্তু একান্ত সময়াভাব এবং শারীরিক অসুস্থতা হেতু আপাততঃ সেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত রইলাম। সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট থেকে আশানুরূপ সাড়া পেলে পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংযোজনের ইচ্ছা রইল।

ইংরেজী প্রবন্ধগুলির বঙ্গানুবাদ, প্রুফ-রিডিং ইত্যাদি পুস্তিকা প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরে আমার পুত্র শ্রীমান আলোক বরনের নিরলস পরিশ্রম ও সাহায্য ছাড়া এই সংকলন বাস্তবে রূপ লাভ করতো না। প্রুফ-রিডিং এবং প্রেস সংক্রান্ত অন্যান্য কাজে আমার কন্যা কল্যাণীয়া গৌরী ও অপর্ণাও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বঙ্গানুবাদে আমার বাল্যবন্ধু ডাঃ সরোজ হালদার এবং প্রিয় ছাত্র-বন্ধু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথ ডাঃ রাখাল দাস মল্লিকও আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। মূল প্রবন্ধগুলি থেকে প্রেস কপি তৈরী ও প্রেস সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে আমার ছাত্র-বন্ধু ডাঃ মধুসূদন ঘোষ, ডাঃ মহাদেব দে, ডাঃ পশুপতি কৌশল, ডাঃ পরভেজ আকতার এবং ডাঃ মহঃ

মহিউদ্দিন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে সাহায্য করে এসেছে। নিছক ধন্যবাদ দিয়ে তাদের ছোট করতে চাই না।

সবশেষে সুধী পাঠক-পাঠিকার নিকট পুস্তিকাটির উৎকর্ষের জন্য সর্ব প্রকার মতামতের আবেদন জানাই। প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই প্রবন্ধ সংকলনের দ্বারা কেউ যদি বিন্দুমাত্রও উপকৃত হন তবেই আমার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো।

১১৫ এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯।
১০ই এপ্রিল-২০১২

সূর্য পদ দে

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

হোমিওপ্যাথি কি?

রোগীর লক্ষণের সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীকে রোগমুক্ত করিবার যে চিকিৎসা-পদ্ধতি, তাহাকেই হোমিওপ্যাথি বলা হয়- একথা হোমিওপ্যাথ মাত্রেরই জানা আছে। কিন্তু এই জানার মধ্যে প্রভেদ আছে এবং তাহা আছে বলিয়াই আজ বাংলা তথা ভারতবর্ষে যথার্থ হোমিওপ্যাথের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। কি সেই প্রভেদ যাহা আমাদের প্রকৃত হোমিওপ্যাথ হইয়া উঠিবার পথে অন্তরায় হইয়া আছে- তাহাই আজ সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচিত ও অনুভূত হওয়া প্রয়োজন।

সদৃশ বিধানমতে চিকিৎসা। কিসের সদৃশ? একটি লক্ষণের, একটি কারণের, একটি যান্ত্রিক পরিবর্তনের, না মায়াজমের? এই প্রশ্নগুলির মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদের কারণ এবং হোমিওপ্যাথিতে অকৃতকার্যতার ইতিহাস।

একটি রোগী হয়ত দশটি লক্ষণ দিল। কারণরূপে হয়ত অতীতের আঘাতের এবং বংশগত সাইকোসিসের ইতিহাস পাওয়া গেল। রোগের উৎপত্তির ইতিহাসে পাওয়া গেল বৃষ্টিতে ভেজার কাহিনী এবং কষ্টের উপশম ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লক্ষণ পাওয়া গেল- গরমে বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় উপশম।

এই রোগীটি প্রথমে একজন হোমিওপ্যাথের নিকট গেলেন, যিনি একখানি মেটিরিয়া মেডিকা মোটামুটি পড়িয়াই ডাক্তারী করেন। তিনি আঘাতের ইতিহাস পাইয়া এবং পূর্বে আর্ণিকা আঘাতজনিত অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া সুফল পাইয়াছেন বলিয়া খুব খুশী হইয়া আর্ণিকা দিলেন। এক্ষেত্রে আঘাতের কারণ হিসাবে আর্ণিকা অবশ্যই সৃদশ হইল। কিন্তু দেখা গেল রোগীর অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হইল না। এরপর তিনি বর্ষায় ভেজার ইতিহাসের সৃদশ্যরূপে রাসটক্স্ দিলেন। তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় রোগী অপর একজন চিকিৎসকের নিকট গেলেন। তিনি মায়াজমের উপর নির্ভর করিয়া মেডোরিনাম দিলেন এবং তাহাতে কিছু কিছু কষ্টের উপশম হইল। কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিয়াও এবং

মেডোরিনাম উচ্চ শক্তিতে প্রয়োগ করিয়াও রোগীর অবস্থার বিশেষ উন্নতি না দেখিয়া তিনি ঔষধ পরিবর্তন করিলেন এবং এবারেও ব্যর্থ হইলেন।

রোগী এবার অপর এক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইলেন, যাঁহার চেম্বারে সর্বক্ষণই প্রচন্ড ভীড়। তিনি রোগীর তিন-চারটি কষ্টদায়ক লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া পালসেটিলা দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই রোগীর উপরিউক্ত লক্ষণগুলি বেশ কমিয়া গেল। কিন্তু কয়েক দিন পরে রোগী পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি পালসেটিলা, নাক্স্ভম্ ও ব্রায়োনিয়া-এই তিনটি ঔষধের তিনটি করিয়া মোট নয়টি লক্ষণের সাদৃশ্য পাইয়া তিনটি ঔষধই একবারে দিলেন। রোগীর কিছু কিছু কষ্টের সাময়িক উপশম হইল বটে, কিন্তু রোগী ক্রমশঃই দূর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল এবং ঔষধ একদিন বন্ধ রাখিলেই পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বেশী কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। এইবার শেষোক্ত চিকিৎসক জনৈক উপদেষ্টা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি সব শুনিয়া উক্ত চিকিৎসকের শেষোক্ত ঔষধ নির্বাচনের প্রশংসা করিলেন এবং সাইকোটিক মায়াজম রোগ-নিরাময়ের পথে বাধারূপে কাজ করিতেছে মনে করিয়া পূর্বোক্ত ঔষধ তিনটির সহিত মেডোরিনাম উচ্চ শক্তিতে একযোগে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিলেন। এবারে কিন্তু ফল হইল বিপরীত। রোগীর সব কষ্টই বৃদ্ধি পাইল। কিছু কিছু নতুন লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল এবং পুরাতন লক্ষণগুলির হ্রাস-বৃদ্ধিতে পরিবর্তনের সূচনা হইল। এইবার রোগী হতাশ হইয়া রোগ-নিরাময়ের আশা একরূপ ছাড়িয়াই দিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাহার কোন এক বন্ধুর নিকট হইতে জনৈক যথার্থ হোমিওপ্যাথের সন্ধান পাইয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি মনোযোগ-সহকারে সবকিছু শুনিয়া এবং মহাত্মা হ্যানিম্যানের নির্দেশনুসারে রোগী-লিপি প্রস্তুত করিয়া কয়েকমাস ধরিয়া রোগীকে কেবলমাত্র প্লাসিবো খাওয়াইয়া রাখিলেন এবং পরে মাত্র এক মাত্রা ন্যেট্রম-সাল্ফ প্রয়োগ করিয়া রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন।

এই ঘটনা হইতে কি ইহাই প্রমাণিত হইল না যে, কেবল সদৃশ হইলেই প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হয় না। অর্গ্যানন হইতে জানিতে হইবে সদৃশ বলিতে হ্যানিম্যান কি বুঝাইয়াছেন। অর্গ্যানন ছাড়া

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অন্ধের হাতি দেখার ন্যায় ঘটনা। অর্গ্যাননে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, রোগাক্রান্ত অবস্থার সদৃশ, অর্থাৎ রোগীর সব লক্ষণ-সমষ্টির একটি সামগ্রিক চিত্র (Totality of symptoms)- এর সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। লক্ষণের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও কানাই বাবু যেমন সত্যেন বাবু হইতে পারেন না, তেমনই লক্ষণের সাদৃশ্য সত্ত্বেও পালসেটিলা কখনই নেট্রম সালফ হইতে পারে না। মেটিরিয়া মেডিকার ঔষধ চিত্রের সহিত রোগীচিত্রের সাদৃশ্য চাই। চিত্রের সহিত চিত্রের সমধর্মিতা, উহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য নহে,- এই কথাটি অন্ত র দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে এবং চিত্রের সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাইবার জন্য চেষ্টা, যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিলে, তবেই আমরা যথার্থ হোমিওপ্যাথরূপে পরিচিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিব। আংশিক সাদৃশ্য মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে আমরা রোগীর কষ্টের উপশম করিতে পারি, কিন্তু চির-রোগে (chronic disease) সম্পূর্ণ নিরাময় বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা কখনই করিতে পারিব না।

ঔষধের লক্ষণ-চিত্রের আংশিক পরিচিতিই আমাদের এই ব্যর্থতার কারণ। ঔষধের চিত্র যে চিকিৎসক উত্তমরূপে জানেন, রোগী-চিত্র তাঁহার নিকট অবশ্যই স্পষ্ট হইয়া দেখা দিবে।

আসুন, আমরা ঔষধের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণকে না জানিয়া মেটিরিয়া মেডিকার লক্ষণ-সমুদ্রে ডুব দিয়া ঔষধ- চিত্ররূপ অমৃত উদ্ধার করি। তাহা হইলে দেখিবেন, রোগী-চিত্র লাভ করা কত সহজ, সাবলীল ও আনন্দদায়ক। সেই আনন্দের স্বাদ একবার পাইলে তখন আর একাধিক ঔষধ একযোগে প্রয়োগ করিয়া 'যেন তেন প্রকারেণ' রোগীর কষ্টের উপশম করিবার প্রবণতা কোনোদিনই দেখা দিবে না। হীরকখনির সন্ধান পাইলে কেহ কি আর লৌহখনিতে আবদ্ধ থাকিতে চাহিবেন?

হোমিওপ্যাথ কে?

যাহা কিছু চক চক করে তাহাই যেমন সোনা নহে, তেমনই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রোগীতে প্রয়োগ করিলেই হোমিওপ্যাথ হওয়া যায় না। যে কোন চিকিৎসকের একান্ত প্রয়োজনীয় সাধারণ গুণাবলী ছাড়াও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হইতে হইবে। তবেই তিনি হোমিওপ্যাথ নাম ধারণ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। অন্যথায় হোমিওপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথ সম্বন্ধে সাধারনের ভ্রান্ত ধারণার অবসান হইবে না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা খুবই দূরুহ বলিয়া আমি মনে করি। তথাপি সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, অদম্য অধ্যবসায়, নিরলস প্রচেষ্টা এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের দ্বারা এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করা সম্ভব। অন্যের সমালোচনা নহে, আজ আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্ম-সমালোচনার সময় আসিয়াছে- আমরা কে কতটুকু নিম্নোক্ত গুণাবলীর অধিকারী?

(১) জীবিত মানুষের মধ্যে জীবনীশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইতে হইবে। সুস্থতা, রোগগ্রস্ততা এবং আরোগ্য জীবনীশক্তিরই রূপান্তর মাত্র এই উপলব্ধিই হইল হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের প্রথম সোপান। দুর্ভাগ্যবশত; জীবনীশক্তিতে বিশ্বাসী নহেন, এমন হোমিওপ্যাথের সংখ্যা নগণ্য নহে। তাই আমরা রক্তে ও প্রস্রাবে শর্করা কমাইতে সাইজিজিয়াম, রক্তের চাপ কমাইতে রাউয়ালফিয়া, যকৃতে শক্তিবৃদ্ধিতে চেলিডোনিয়াম, কারডুয়াস প্রভৃতির মাদার টিনচারস্ হামেশাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। সমগ্র মানুষকে বাদ দিয়া দেহযন্ত্রের এবং জীবনীশক্তি বাদ দিয়া শুধুই মানুষটির চিকিৎসা চলিতেছে।

(২) ভেষজের এবং জীবাণুর সুক্ষ্ম শক্তিতে বিশ্বাসী হইতে হইবে। জীবনীশক্তিতে বিশ্বাসী না হইলে ঔষধের ও জীবাণুর সুক্ষ্ম শক্তিতে বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব নহে। তাই, আমরা সুনির্বাচিত ঔষধ নিম্নশক্তিতে এবং অধিক পরিমাণে ব্যবহার করি তাহার বস্তুগত প্রতিক্রিয়া (Physiological

action)-র আশায়। ফলে শুধু, রোগীর কষ্টের সাময়িক উপশম দেওয়া ছাড়া সারাজীবনে বহু হোমিওপ্যাথ একটিও চির-রোগের স্থায়ী নিরাময়ে সক্ষম হন না। ঔষধের গুণগত শক্তি(Dynamic action) যে অসীম ক্রিয়ার অধিকারী, তাহা যদি আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি, তবে কখনোই নিম্নশক্তিতে নিজেদেরকে আর আবদ্ধ রাখিতে প্রয়াস পাইব না। জীবাণুর সুক্ষ্ম-শক্তিতে বিশ্বাস নাই বলিয়াই আমাদের মধ্যে সংশয় দেখা দেয়- হোমিওপ্যাথিক ঔষধ জীবাণু ধ্বংস করিতে পারে কি? তাই, বিকোলাই, ম্যালেরিয়া, টিটেনাস, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের নাম শুনিলে আমরা ভয় পাই এবং অন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের শরণাপন্ন হইবার পরামর্শ দিই।

(৩) সত্যের প্রতি অনুরাগী হইতে হইবে এবং পরীক্ষালব্ধ সত্য ঘটনাকেই একমাত্র হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। কোনোপ্রকার ভিত্তিহীন মতবাদ, যুক্তিহীন অভিজ্ঞতা বা নীতিহীন আধুনিকতার আশ্রয় গ্রহণ করা চলিবে না।

মহাত্মা হ্যানিম্যান গতানুগতিকতার স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দেন নাই। পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার দ্বারা যাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাই ত্যাগ করিয়াছেন এবং একমাত্র পরীক্ষালব্ধ সত্যকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্যকে শুধুমাত্র পুরাতন মতবাদের দোহাই দিয়া আধুনিকতার খোলস পরাইতে চাহিতেছি। মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক সত্য কি পুরাতন বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে? হ্যানিম্যান পৌনে দুইশত বৎসর পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, বর্তমান যুগে তাহার পরিবর্তন প্রয়োজন, এই মতবাদের ধারক ও বাহকগণ উগ্র আধুনিকতার নামে হোমিওপ্যাথিতে পেটেন্ট, টনিক, একযোগে একাধিক ঔষধের প্রয়োগ হোমিও-স্পেসিফিক প্রভৃতি অ-হোমিওপ্যাথিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন এবং করিতে শিখাইতেছেন। পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তন, অভিজ্ঞতার নামে যথেচ্ছাচার প্রকৃত হোমিওপ্যাথ সৃষ্টির পথে আজ প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৪) হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় খুব প্রখর শক্তি-সম্পন্ন হওয়া একান্ত দরকার। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি ইত্যাদির কোনটি কম শক্তিসম্পন্ন হইলে সঠিক রোগী-চিত্র পাইতে অনেক সময় যথেষ্ট অসুবিধা হয়।

(৫) পর্যবেক্ষণ করিবার উপযুক্ত মানসিকতা এবং একাগ্রতা থাকা চাই। রোগী-লিপি প্রস্তুত করিতে, ঔষধ ও রোগীচিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং সর্বোপরি ঔষধ প্রয়োগের পর তাহার প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করিতে পর্যবেক্ষণ- ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা প্রকৃত হোমিওপ্যাথ মাত্রই স্বীকার করিবেন। এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অভাবই হোমিওপ্যাথিতে অসাফল্যের প্রধান কারণ বলিয়া মনে করি।

(৬) কোনোপ্রকার ভ্রান্ত, বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হইলে চলিবে না। সত্যের নিকট আনুগত্য স্বীকার করিলে তবেই সর্বপ্রকার গোঁড়ামী ও ভ্রান্ত ধারণার অবসান সম্ভব। ভিত্তিহীন অভিজ্ঞতা হইতে গৃহীত ধারণা, পূর্ব সুরীদের ভ্রান্ত ধারণার অন্ধ অনুকরণ এবং সহজে বাজিমাৎ করিবার কৌশল একবার বদ্ধমূল হইলে তাহা দূর করা অত্যন্ত দুরূহ। নিজে যাহা জানি বা বুঝি, তাহাই ঠিক; অন্যেরা কেহ কিছুই জানেন না বা বোঝেন না- এই বদ্ধমূল ধারণা হইতেই হোমিওপ্যাথিতে দলাদলির সৃষ্টি এবং রোগী ও ঔষধ সম্পর্কেও এই ধরণের বদ্ধমূল ধারণাই বহু অসাফল্যের কারণ।

(৭) বিশ্বস্ততার সহিত হ্যানিম্যানের নির্দেশিত পন্থায় রোগী-লিপি প্রস্তুত করিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। চিররোগে রোগী-লিপি ছাড়া চিকিৎসা করা অসম্ভব বলিয়াই আমার মনে হয়। রোগী-লিপি ছাড়া ঔষধের ক্রিয়া নির্ণয় করা বা দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র দেওয়া কোন প্রকৃত হোমিওপ্যাথের পক্ষে সম্ভব নহে।

(৮) হোমিওপ্যাথিক রীতি অনুসারে রোগের উত্তেজক, ধারক ও বাহক কারণগুলি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে। জীবাণু রোগ সৃষ্টি করে- এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু রোগসৃষ্টিতে জীবাণুর স্থান অনেক পরে। জীবাণুর পূর্বে এবং পরে আরও অনেক কারণ আছে, যেগুলি জানিলে, তবেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্ভব।

(৯) রোগ- আরোগ্যের পথের বাধাগুলি সম্যক্ অবগত হইয়া তাহা দূরীকরণের জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। রোগী নিয়মিত মদ্যপান করে এবং রাত্রি জাগরণ করে। এসব ক্ষেত্রে নাক্সভমিকা যতই খাওয়ানো যাক না কেন, অভ্যাস পরিবর্তন না করাইলে আরোগ্য করা সম্ভব নহে। এইরূপ অনেক বাধা আছে। সেগুলি না জানিয়া শুধু ঔষধ নির্বাচন করিলেই প্রকৃত হোমিওপ্যাথের কর্তব্য শেষ হইবে না।

(১০) রোগ ও রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর খাদ্য, পানীয়, অন্যান্য দ্রব্য, অভ্যাস ও পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(১১) হোমিওপ্যাথির মূল নীতিগুলির উপর শ্রদ্ধাশীল হইতে হইবে এবং কোন কারণেই নীতি-বিগর্হিত পথে না চলিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু অতি দ্রুত কি উপায়ে ধনী হওয়া যায়, এই মানসিকতায়, চিন্ত াভাবনাহীন ঔষধ নির্বাচনই অহোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রধান কারণ। গোঁড়ামীর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও নিজের উপর আস্থা এবং হোমিওপ্যাথি-শাস্ত্রের উপর দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা পুর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন করা যায়- হয়ত বা একটু দেরীতে।

(১২) লক্ষণের মূল্যায়ণ ও তদ্বারা ঔষধ ও রোগীচিত্র সম্যক্ অবগত হওয়ার কঠিন প্রচেষ্টায় ব্রতী হইতে হইবে। লক্ষণের সঠিক মূল্যায়ণ করিতে যিনি সক্ষম , হোমিওপ্যাথিতে সাফল্য তাঁহার করতল-গত। খ্যাত, অখ্যাত যে চিকিৎসকের মধ্যেই এই বিশেষ গুণটি বিদ্যমান, তিনি আমার নমস্য।

(১৩) চিররোগে হ্যানিম্যানের দীর্ঘ ১২ বৎসরের নিরলস অনুসন্ধ্যানের ফসল মায়াজম্। এই মায়াজমতত্ত্বে বিশ্বাসী হইতে হইবে এবং মায়াজম বিরোধী ঔষধ প্রয়োগে চিররোগের মুলোচ্ছেদ করিবার কঠিন ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় সারাজীবন শুধু রোগের সাময়িক উপশম দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। চির-রোগগ্রস্ত রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া যে শান্তি লাভ করা যায়, তাহা চিরকাল অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে।

(১৪) উচ্চশক্তিযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অপব্যবহারের ফলে রোগীর যে অপরিমেয় ক্ষতি, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে- ইহা সম্যক অবগত হইয়া, উচ্চশক্তিযুক্ত ঔষধ মুড়ি-মুড়কির ন্যায় প্রয়োগ করা হইতে বিরত হইতে হইবে। অন্যথায় অন্য কাহারো নিকট না হোক, নিজের বিবেকের নিকট অবশ্যই জবাবদিহি করিতে হইবে।

(১৫) সুনির্বাচিত উচ্চশক্তিযুক্ত এক মাত্রা ঔষধ প্রয়োগের ফলে কত রকমের পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে, সেই সকল পরিবর্তনের তাৎপর্য কি এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে কি করণীয়, তাহা অনুধাবন করিবার মত পর্যবেক্ষণ- ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম ব্যবস্থাপত্র মোটামুটি সুনির্বাচিত হয়। কিন্তু ঔষধ প্রয়োগের পর যে পরিবর্তন আসে আমরা তাহার তাৎপর্য অনুধাবন না করিয়াই দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র দিই। ইহাই হোমিওপ্যাথিতে অসাফল্যের সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ বলিয়া আমার বিশ্বাস।

(১৬) দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র কি, কেন, কোথায়, কখন এবং কিভাবে নির্ণয় করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। একটি ঔষধ প্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাসী হইতে হইবে। একত্রে যাঁহারা একাধিক ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দেন, তাঁহারা কি করিয়া দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্ণয় করেন, তাহা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের বাহিরে।

(১৭) কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িক উপশম-প্রদানকারী ঔষধের প্রয়োগ বিধেয় এবং অপরিহার্য্য। সেই সব ক্ষেত্রে উচ্চশক্তিযুক্ত আরোগ্যকারী ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। হোমিওপ্যাথি মৃত লোক বাঁচাইতে পারে না। যে সব রোগীর আরোগ্যলাভ সম্ভব, সেই সব রোগীই আরোগ্যলাভ করে- একথা হ্যানিম্যান, ডাঃ কেন্ট প্রভৃতি সকলেই বলিয়াছেন। যে রোগীর জীবনীশক্তি এমন স্তরে নামিয়া গিয়াছে যে, ঔষধের ক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করিবার শক্তি নাই-সেই সব রোগীকে আরোগ্যকারী ঔষধ উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করিলে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেহযন্ত্রের বিপর্যয় অনিবার্য হইয়া উঠে এবং রোগী দ্রুত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে নিম্নশক্তির সাধারণ-ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীকে যতটা সম্ভব উপশম দেওয়ার চেষ্টা করাই প্রকৃত চিকিৎসকের একমাত্র কর্তব্য।

(১৮) ঔষধের ক্রিয়াকাল জানিতে হইবে এবং তদনুসারে প্রথম ব্যবস্থাপত্রের ফল নির্ধারণ করিতে হইবে। গভীর-ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সাত বা দশদিন পরে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র স্থির করিবার চেষ্টা করিলে ব্যর্থতাই আসিবে।

(১৯) সর্বপ্রকার গোঁড়ামী ত্যাগ করিতে হইবে এবং ভুল ঔষধ নির্বাচন করিয়া অহেতুক দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিবার প্রবণতা বর্জন করিতে হইবে। যেহেতু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ক্রিয়ার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, তাই ভুল ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও মাসের পর মাস অপেক্ষা করা এবং রোগীকে অনিবার্যভাবে মৃত্যুর দিকে আগাইয়া দেওয়া চিকিৎসকের কর্তব্য নহে।

(২০) ঔষধ-চিত্র, ঔষধের ক্রিয়াকাল এবং ঔষধের প্রয়োগজনিত পরিবর্তনগুলি সম্যক্ উপলব্ধি করিবার জন্য হ্যানিম্যানের মেটিরিয়া মেডিকা পিউরা, অ্যালেনের এনসাইক্লোপিডিয়া প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিয়া ঔষধের প্রুভিং সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে।

প্রকৃত হোমিওপ্যাথ হইতে হইলে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যথাসাধ্য জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া যে হোমিওপ্যাথি গড়িয়া উঠিবে, সেই হোমিওপ্যাথিই হইবে ভারতবর্ষের কোটি কোটি রোগ যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের আশার আলো, চিকিৎসকের পরম লক্ষ্য এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের বিস্ময়।

চিকিৎসক জীবনের সর্বোচ্চ ও একমাত্র ব্রত

হ্যানিম্যান তাঁর অর্গ্যাননের প্রথম সূত্রে লিখেছেন, চিকিৎসক-জীবনের একমাত্র ব্রত হল- অসুস্থকে তার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়া অর্থাৎ আরোগ্য করা। চিকিৎসক মাত্রই তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সচেতন। তাছাড়া চিকিৎসক রোগী-চিকিৎসা করে তাকে আরোগ্য করবেন-এটা তো খুবই স্বাভাবিক। কে না একথা জানেন? কিন্তু তবু হ্যানিম্যান তাঁর অর্গ্যাননের প্রথম সূত্রে একথা লিখতে গেলেন কেন তা অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে।

হ্যানিম্যানের সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা বিদ্যমান ছিল। রোগী চিকিৎসার কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। চিকিৎসকেরা রোগের কারণ-নির্ণয়ে অধিকাংশ সময় ব্যয় করতেন-যে কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল তাঁদের কাল্পনিক ধারণা মাত্র। সব রোগেই তাঁরা রোগীর রক্তে কোন ক্ষতিকর বস্তুর সন্ধান করতেন এবং সেটাকেই রোগের কারণ বলে কল্পনা করতেন। এই ক্ষতিকর বস্তুর সন্ধান, দেহ-যন্ত্র, কলা, কোষ ইত্যাদির পরিবর্তন, গবেষণাগারে রক্ত, মল, মূত্র, কফ ইত্যাদির পরীক্ষালব্ধ ফল পর্যালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের অধিকাংশ সময় এবং শক্তি ব্যয়িত হতো। ফলে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর তথাকথিত রোগ-নির্ণয়ের বহু পূর্বেই রোগী হয়ত মৃত্যুবরণ করতো। রোগীর যন্ত্রণালাঘবের কোন চেষ্টা না করে আমরা যদি গবেষণাগারে রোগের কাল্পনিক কারণ নির্ণয়ে সময় ব্যয় করি-তবে কি চিকিৎসকের কর্তব্য ঠিকমত পালন করা হবে? কখনই না। বিভিন্ন পরীক্ষা এবং গবেষণাগারে প্রাপ্ত নিদর্শন আমাদের চিকিৎসায়সাহায্য করবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইগুলি পাওয়ার জন্য রোগীকে অবহেলা করে তার কষ্ট লাঘবের জন্য কোন ব্যবস্থা না করা এক অমার্জনীয় অপরাধ। তাছাড়া তখনকার দিনে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, রোগের কারণ ছিল অজ্ঞাত। তবু চিকিৎসকেরা নিজেদের জীবনের ব্রত ভুলে যেয়ে সেই অজ্ঞাত কারণের অনুসন্ধানেই তাঁদের সমস্ত শক্তি ও জ্ঞান ব্যয় করতেন। তাই হ্যানিম্যান চিকিৎসক-সমাজকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে

সচেতন করানোর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। আজও আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি রোগী মাসের পর মাস বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছে ও হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এল! তার রোগ নির্ণয় সম্ভব নয় বলে কোনো চিকিৎসাও সম্ভব না হওয়ায়। কিন্তু এই কয়েক মাসের ঘোরাঘুরির মধ্যে তার রোগ আরও বৃদ্ধি পেল এবং হয়ত বা আরোগ্যের বাইরেই চলে গেল।

এছাড়া হ্যানিম্যানের একথা লেখার আরও একটা কারণ এই যে, যে কোন উপায়ে রোগীর কষ্টের সাময়িক উপশম দেওয়ার চেষ্টাও চিকিৎসকের সর্বোচ্চ আদর্শ নয়। তার কারণ, ক্রমাগত উপশমের ফলে রোগ জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত আরোগ্য-সম্ভাবনাহীন হয়ে উঠবে।

অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার কথা ১৭৫ বৎসর পরও আমরা, হোমিওপ্যাথরা সেই উপশম এবং তথাকথিত রোগ নির্ণয়ের মোহে অন্ধের মত ছুটে চলেছি- রোগীর প্রকৃত আরোগ্যের কথা ভুলে যেয়ে বা উপেক্ষা করে।

কাজেই, চিকিৎসক জীবনের একমাত্র ব্রত সম্বন্ধে হ্যানিম্যান যা লিখেছেন তা পৌনে দুইশত বৎসর আগেও যেমন, আজও তেমনই (অভ্রান্তভাবে) প্রযোজ্য। এই ব্রত সম্বন্ধে যিনি সচেতন, তিনিই প্রকৃত হোমিওপ্যাথ তথা চিকিৎসক।

অদৃশ্য শক্তি ও তার কাজ
(Dynamis and Dynamic action)

পৃথিবীতে যত শক্তি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ডাইনামিস্ এটা হ'লো একটা গুনগত শক্তি যা চোখে দেখা যায় না, পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা যায় না বা বস্তুবাদী জগতকে বিশ্বাস করানো যায় না। অথচ এই শক্তির উপর বিশ্বাসই হোমিওপ্যাথির গোড়ার কথা বা মূল ভিত্তি। ডাইনামিস্ এবং ডাইনামিক অ্যাকশন, বা ক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম না করে হোমিওপ্যাথি করার ফল হলো মাদার টিন্চার দিয়ে, একসঙ্গে তিন-চারটে ঔষধ দিয়ে, হোমিওপ্যাথিক টনিক, স্পেসিফিক, ইত্যাদি ব্যবহার করে রোগীর আরোগ্যের পরিবর্তে আশু উপশমের চেষ্টা করা।

আমাদের মানবদেহ মস্তিস্ক, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা ইত্যাদি অনেক যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের দ্বারা গঠিত। একটিমাত্র ভ্রুণাঙ্কুরিত ডিম্বাণু থেকে কি শক্তিতে এই পুর্ণাবয়ব মানবদেহ সৃষ্টি হয় তা চিন্তা করতে হলে আমাদের এই অদৃশ্য ডাইনামিক শক্তিকে বিশ্বাস করতেহবে। যে শক্তি অতি নিখুঁতভাবে একটা সুনির্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত নিয়ম অনুসারে মানবদেহের এই অপূর্ব এবং বিস্ময়কর গঠনকার্য সম্পন্ন করে। শুধু তাই নয়, জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই শক্তি আমাদের দেহে বিরাজ করে প্রতিটি দেহকোষকে সঞ্জীবিত রাখে। সমস্ত দেহযন্ত্রই এই অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ক্রিয়াশীল, কিন্তু এই শক্তির অভাবে সব যন্ত্রই অচল-অর্থাৎ মৃত। এই শক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে। হ্যানিম্যান মানবদেহের এই শক্তিকে জীবনী শক্তি বলেছেন। এই জীবনী শক্তি যতক্ষণ স্বাভাবিক এবং অনাক্রান্ত থাকে- ততক্ষণ আমরা সুস্থতা অনুভব করি। সব কাজে আনন্দ অনুভব করি। এরই নাম স্বাস্থ্য। কিন্তু বাইরের কোন রোগ উৎপাদক শক্তি যদি জীবনীশক্তিকে আক্রমণ করে জয়লাভ করে, তবে আমাদের শরীর ও মনে কতকগুলি অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, যার সমষ্টিগত অবস্থাকে আমরা রোগ বলি। রোগাক্রান্ত অবস্থায় এই শক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এই জীবনীশক্তির প্রভাবে রোগ- লক্ষণ প্রকাশ না পেলে রোগের

শুরুতে তা নির্ধারণ করা অসম্ভব হতো। রোগ আরোগ্যের জন্য আমরা যে ঔষধ ব্যবহার করি, তার অদৃশ্য সুক্ষ্ম শক্তি জীবনীশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে রোগ-উৎপাদক শক্তিকে পরাভূত করে। জীবনীশক্তি তখন ঔষধজ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করে এবং ঔষধের ক্রিয়াকাল শেষ হওয়া মাত্র রোগী সুস্থতা লাভ করে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বেঁচে থাকতে এবং রোগমুক্ত হতে এই অদৃশ্য শক্তিই একমাত্র সহায়। আবার, রোগজীবাণু ইত্যাদির মধ্যে নিহিত এই সূক্ষ শক্তিই রোগ- আক্রমণের হেতু। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এই শক্তি নিহিত আছে। কোথাও প্রকাশিত আবার কোথাও বা সুপ্ত অবস্থায়। যে লবণ আমরা রোজই খাই তার সাধারণ অবস্থায় কোন ঔষধজ ক্ষমতার কথা জানা যায় না। কিন্তু সেই লবণকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাত্রাকৃত (Potentised) করলে তার অন্তর্নিহিত এই শক্তি প্রকাশ পায়, এবং সুস্থ শরীরে তা প্রয়োগ করলে বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে। তাই নেট্রাম-মিউর হোমিওপ্যাথিতে একটা উচ্চ-স্থানাধিকারী ঔষধ বা অনেক দুরারোগ্য পুরাতন রোগ সারাতে পারে। এইভাবে সোনা, রূপা, সীসা, মাটি, বালি ইত্যাদি থেকে আমাদের অনেক ঔষধ তৈরী হয়েছে। যেসব জিনিস বাহ্যত রোগ আরোগ্যের ক্ষমতারহিত, সেইসব জিনিসকে বিচূর্ণন (Trituration), তরলীকরণ (Dilution) এবং আঘাতদান (সাক্কাসান) দ্বারা যদি শক্তিকৃত করা যায়, তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম-শক্তি নিহিত আছে। এই শক্তিকেই ডাইনামিস্ বলা হয়েছে। মহামতি কেন্ট এই শক্তিরই নাম দিয়েছেন সিম্পল্ সাবষ্টেন্স যা না বুঝলে হোমিওপ্যাথি বোঝা অসম্ভব। কাজেই, ডাইনামিস্ না মেনে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কি করে সম্ভব হতে পারে? সুক্ষম শক্তিতে বিশ্বাসী হলে- শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মধ্যে কি বিরাট শক্তি লুকিয়ে আছে এবং তার দ্বারা কি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হতে পারে তা সম্যক উপলব্ধি করা যাবে, অন্যথায় নয়। মার সন্তানের উপর আকর্ষণ, চন্দ্রের সহিত জোয়ার ভাটার সম্বন্ধ, লোহার প্রতি চুম্বকের আকর্ষণ প্রভৃতি এই ডাইনামিক ক্রিয়ারই প্রকাশ।

স্বাস্থ্য, রোগ ও আরোগ্য

শরীর ও মনের সাম্যাবস্থাই স্বাস্থ্য। শরীর ও মনের এই অবস্থায় আমরা কোন অস্বাভাবিকতা অনুভব করি না। মানবদেহের সব ক্রিয়া একটা ছন্দোবদ্ধগতিতে চলতে থাকে, যার ফলে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। যতক্ষণ আমরা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি মেনে চলি ততক্ষণ এই স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত স্বাভাবিক স্বাস্থ্য আমরা উপভোগ করি। স্বাস্থ্য-বিধি সংক্রান্ত নিয়মভঙ্গ করলেই ঘটে ছন্দপতন দেখা দেয় অসুস্থতা। অবশ্য স্বাস্থ্য-বিধি মেনে চললেই যে সব রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তা নয়। বংশগত রোগ-প্রবণতা নিয়ে জন্মালে স্বাস্থ্য-বিধি পুরোপুরি মেনে চললেও একদিন রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পাবে। কারণ বংশগত রোগ-প্রবণতাও তো রোগ- লক্ষণ অর্থাৎ অস্বাভাবিকতা। প্রচ্ছন্ন এইসব রোগ-লক্ষণই উপযুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠে ভবিষ্যতে বিরাট রোগাবস্থার সৃষ্টি করে। তাছাড়া রোগ জীবাণু দ্বারা সংঘটিত রোগ যেগুলি সামাজিক স্বাস্থ্য বা জনস্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে, সেগুলিতেও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সবসময় রোগ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে না- যেমন বসন্ত, ডিফথিরিয়া, এনকেফালাইটিস, পোলিওমাইলাইটিস্ ইত্যাদি। তাছাড়া সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হলো প্রকৃত সুস্থ লোক আজ জগতে বিরল। অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে, স্বাস্থ্যের যে সংজ্ঞা উপরে দেওয়া হয়েছে সেই ধরণের সুস্থ লোক হয়ত খুঁজেই পাওয়া যাবে না। প্রচ্ছন্ন অস্বাভাবিকতাকে কেউ রোগ বলে মনে করেন না। এই কারণেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করে তার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব। কারণ, রোগী ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আপাতসুস্থতাকেই স্বাস্থ্য বলে মনে করেন এবং চিকিৎসার আর প্রয়োজন বোধ করেন না।

রোগঃ মানবদেহের অভ্যন্তরে এক অদৃশ্য জীবনীশক্তি ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। এই জীবনীশক্তির অপ্রতিহত কর্মক্ষমতাই হলো স্বাস্থ্য। রোগ-সৃষ্টিকারী যতপ্রকার কারণ আছে সেগুলির মধ্যে এক অদৃশ্য রোগ-

উৎপাদিকা শক্তি বর্তমান থাকে। এই অদৃশ্য শক্তির (Dynamis) প্রভাবেই দেহাভ্যন্তরস্থ অদৃশ্য জীবনীশক্তি আক্রান্ত হয়। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কতকগুলি অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথমে এই লক্ষণগুলি প্রচ্ছন্ন থাকে। শরীর ম্যাজম্যাজ করা, কাজে উৎসাহ না থাকা, ক্ষুধা কমে যাওয়া, মনমরা ভাব, আলস্য ইত্যাদিরূপে এই অবস্থার প্রথম প্রকাশ দেখা দেয়। রোগী এই অবস্থায় সাধারণতঃ চিকিৎসার কোন প্রয়োজন মনে করেন না। ফলে ক্রমশঃ রোগের বৃদ্ধি ঘটে এবং দেহাভ্যন্ত রস্থ যন্ত্রগুলি আক্রান্ত হতে থাকে। অবশ্য প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সবচেয়ে কম প্রয়োজনীয় যন্ত্র (Organ) গুলি প্রথমে আক্রান্ত হয়। তারপর ধীরে ধীরে হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা, মুত্রগ্রন্থি ইত্যাদি দেহের অন্যান্য মূল্যবান অংশে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। রোগের শুরু থেকে (Stage of Dynamic Pathology) এই সব যান্ত্রিক পরিবর্তন পর্যন্ত (Organic Pathology) যত লক্ষণ তৈরী হয় তাদের সমষ্টিগত অবস্থাই হলো রোগ। এর শুরু ক্রিয়াঘটিত (functional) লক্ষণসমূহে এবং শেষ গঠনগত (Organic) লক্ষণসমূহে। লক্ষণ-সমষ্টিকে রোগ না ভেবে যান্ত্রিক পরিবর্তনগুলিকেই সাধারণতঃ রোগ বলে ধরা হয়। ফলে রোগের প্রথমাবস্থায় (Functional Stage) আমরা রোগ নির্ধারণ করতে পারি না। যান্ত্রিক পরিবর্তন হলো রোগের শেষ পরিণতি। চিকিৎসাকালে আমরা এইভাবে শেষ থেকে শুরু করি বলেই রোগ নিরাময় অত্যন্ত দুরূহ হয়ে ওঠে। যক্ষ্মা রোগের প্রারম্ভে যে সব ক্রিয়াঘটিত লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলির সঠিক চিকিৎসা করতে পারলে যক্ষ্মারোগ ফুসফুস ধ্বংস করতে পারে না। কাজেই রোগী-চিকিৎসা অনেক সহজ হয়। কিন্তু সকলেই জানেন যক্ষ্মা রোগ একবার পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে এবং যান্ত্রিক পরিবর্তনসহ অগ্রগামী হলে তাকে আরোগ্য করা কত কঠিন। সব রোগের ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। কাজেই লক্ষণসমষ্টির এক সামগ্রিক অবস্থাই হলো রোগ। এর বেশী বা কম কিছু নয়। কি কারণে রোগ হয়েছে, রক্ত ইত্যাদিতে কি কি অস্বাভাবিকতার প্রকাশ আছে, এক্স-রেতে কি ধরা পড়েছে, মল-মুত্র পরীক্ষায় কি পরিবর্তন পাওয়া যাচ্ছে-এগুলি রোগের এক একটা দিক মাত্র। সম্পূর্ণ চিত্র নয়। রোগের কারণ হিসাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে যেগুলিকে গণ্য করা হয় তার-অধিকাংশই কারণ নয়,

রোগের ফল। যদিও সেইসব রোগ-ফল আবার রোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ইউরিমিয়া-রোগীর রক্তে ইউরিয়া বেড়ে যাওয়াটা প্রকৃত কারণ নয়। বরং একটি প্রধান লক্ষণ (Objective symptom) মূত্রগ্রন্থি (Kidney) সঠিক কাজ না করার ফলে এই অবস্থা দেখা দেয়। কিন্তু রক্তে এই অত্যধিক ইউরিয়া জমে যাওয়া রোগীর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটায় এবং রোগী আচ্ছন্ন (কোমা) অবস্থায় অথবা তড়কা হয়ে মারা যায়। তেমনি লিভার বড় হওয়াটা রোগ নয়, রোগের একটি পরিণত লক্ষণ মাত্র। তাই হ্যানিম্যান বলেছেন, লক্ষণ-সমষ্টির বাইরে রোগ লুকিয়ে থাকতে পারে না। দেহাভ্যন্তরে যাই ঘটুক না কেন, বাইরে (লক্ষণরূপে) তার প্রকাশ হবেই- তা সে ক্রিয়াঘটিত লক্ষণই হোক, আর গঠনগত লক্ষণই হোক। আমরা যে সুস্থ আছি তাও আমরা বুঝি সুস্থ্যতার পরিচয় বহনকারী স্বাভাবিক অনুভূতির সমষ্টিগত অবস্থার দ্বারা। অসুস্থতার লক্ষণের সমষ্টিগত অবস্থা থেকে সুস্থতার উপলব্ধির সমষ্টিগত অবস্থায় ফিরিয়ে আনাই হলো চিকিৎসকের কাজ। যন্ত্র বা যন্ত্রাংশকে জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাখা নয়। কাজেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হওয়ার আগে রোগের এই প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অন্যথায় শিব গড়তে ভূত গড়া হবে। রোগী আরোগ্য না করে তার যন্ত্রাংশের মেরামতির কাজ করেই চিকিৎসক জীবন শেষ করতে হবে।

আরোগ্যঃ লক্ষণসমষ্টির সামগ্রিক অবস্থার স্থায়ী বিলুপ্তিই হলো আরোগ্য। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। লক্ষণ-সমষ্টি বলতে শুধু রোগী যে কষ্টসমূহ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন, সেইগুলিকেই বোঝায় না। চিকিৎসক নিজে রোগী পরীক্ষা করে যা পান, রক্ত, মল, মূত্র ইত্যাদির পরীক্ষায় যা পাওয়া যায়, এক্স-রে, ই.সি.জি, ই.ই.জি, ইত্যাদি করে যা পাওয়া যায়-এই সবগুলিই লক্ষণসমষ্টির অন্ত র্ভুক্ত। একটা পিত্ত-পাথরির (Gall stones) রোগীতে রোগীর সব কষ্ট চলে গেল অথচ পিত্তের থলিতে পাথর থেকে গেল-একে আরোগ্য বলা যায় না। পিত্তের থলির পাথরগুলি থাকবে না এবং রোগীর কোন কষ্টও থাকবে না, কি দেহে কি মনে-একেই বলে আরোগ্য। অনেকে এটা ঠিক বুঝতে চেষ্টা করেন না, বলেন-হোমিওপ্যাথিতে লক্ষণ চলে যায় কিন্তু

রোগ থেকে যায়। এটা একেবারেই অসম্ভব। রোগ মানেই তো লক্ষণ। কাজেই লক্ষণ না থাকলে রোগ থাকে কি করে আবার রোগ থাকলে লক্ষণসমষ্টি যাবেই বা কি করে? এই সত্য সম্যক উপলব্ধি করলে অনেক সংশয় কেটে যাবে। রোগী পরীক্ষা করতে না জানলে, রোগের যান্ত্রিক পরিবর্তনগুলি বুঝতে না পারলে, ল্যাবরেটরী থেকে প্রাপ্ত লক্ষণগুলি বুঝতে না পারলে আরোগ্য সম্বন্ধে এই ধরণের ভুল ধারণা থাকবেই। কাজেই স্বাস্থ্য, রোগ এবং আরোগ্য বুঝতে হলে চিকিৎসাশাস্ত্রের সব বিষয়ে সম্যকজ্ঞান থাকা একান্ত দরকার।

হোমিওপ্যাথিতে "লক্ষণ-সমষ্টি"
("Totally of Symptoms" in Homeopathy)

হোমিওপ্যাথিক দৃষ্টিভঙ্গিতে "লক্ষণ-সমষ্টি"(Totality of Symptoms) বলতে কি বোঝায়?

লক্ষণ-সমষ্টির অর্থ সব লক্ষণের যোগফল। এই সহজ কথাটার অর্থ বোঝাবার জন্য আবার প্রবন্ধ লেখার দরকার কি? একথা অনেকের মনেই উঁকি দিতে পারে। কিন্তু কথাটার অর্থ কি সত্যই অতটা সহজ? আমার তো তা মনে হয় না। একজন রোগীতে মোট পঞ্চাশটি লক্ষণ থাকতে পারে। কিন্তু সেই লক্ষণগুলি যদি এলোমেলোভাবে সংগ্রহ করা হয়, তবে সেগুলি থেকে একটা মাত্র ঔষধ নির্বাচন করা প্রায়শই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলির সঙ্গে তিন-চারটি বা তার বেশী ঔষধের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। অথচ হোমিওপ্যাথিক নীতি অনুসারে একবারে একটি মাত্র ঔষধই দিতে হবে এবং তা লক্ষণ-সমষ্টির ভিত্তিতেই নির্বাচিত হবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ঐ পঞ্চাশটি লক্ষণের যোগফলই লক্ষণ-সমষ্টি নয়। লক্ষণ-সমষ্টি তার চেয়ে বেশী কিছু, সেই কিছু কি সেটাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। হ্যানিম্যান বলেছেন, "লক্ষণ-সমষ্টিই হলো রোগ এবং এই লক্ষণ-সমষ্টিকে সমূলে দূরীভূত করাই হলো আরোগ্য"। একটা নিউমোনিয়া রোগীর লক্ষণ-সমষ্টি হলো জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা, ফুসফুস বা তার অংশ বিশেষ শক্ত হয়ে যাওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুততর হওয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া রক্ত, কফ ও এক্স-রে পরীক্ষা করে যেসব লক্ষণ পাওয়া যায় সেগুলিও তার অন্তর্ভূক্ত। এই লক্ষণ-সমষ্টি দ্বারা নিউমোনিয়া চিনতে কোনো অসুবিধা না হলেও রোগী চেনা যায় না। কিন্তু কোন রোগীর ধরা যাক একেবারেই জলপিপাসা নেই, জিহ্বা শুষ্ক, সন্ধ্যায় সকল কষ্টের বৃদ্ধি। এসব লক্ষণ কিন্তু নিউমোনিয়ার লক্ষণ-সমষ্টির মধ্যে পড়ে না। তাই এই লক্ষণগুলিই রোগীর স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক। কাজেই হ্যানিম্যান রোগ বলতে যে লক্ষণ-সমষ্টি বলেছেন তা তথাকথিত রোগ নির্ণায়ক লক্ষণ নয়- রোগীর স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক লক্ষণসহ রোগ লক্ষণের সমষ্টিকেই বুঝিয়েছেন। রোগীর ব্যক্তি সত্তার লক্ষণ বাদ দিয়ে রোগের লক্ষণ সমষ্টির কথা তিনি বলেননি এবং হোমিওপ্যাথিতে তা হতেও পারে না।

একটা ঔষধের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। সালফার, ক্যালকেরিয়া লাইকোপড়িয়াম প্রভৃতি ঔষধের শত শত লক্ষণ কারও পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। অথচ রোগীর লক্ষণ-সমষ্টির সাথে ঔষধের লক্ষণ সমষ্টির সাদৃশ্য দেখেই ঔষধ নির্বাচন করতে হয়। ঔষধের লক্ষণ-সমষ্টি যখন মনে রাখাই সম্ভব নয় তখন ঔষধ নির্বাচন হবে কি ক'রে? ঔষধের শত শত লক্ষণ মনে না রেখেও আমরা প্রতিদিন সেই সব ঔষধ ব্যবহার ক'রে চলেছি এবং ভাল ফলও পাচ্ছি। ভাবলে অবাক হই কত বড় বড় ঔষধের মাত্র আট দশটা লক্ষণ জেনেই সেই সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে সেইসব ঔষধ হামেশা ব্যবহার ক'রে কত দুরারোগ্য রোগীতে আশাতীত ফল পেয়েছি। কি করে এটা সম্ভব হয়? সব লক্ষণ অর্থাৎ তথাকথিত লক্ষণ সমষ্টি না জেনেও কি করে ঔষধ ব্যবহার করি দু-চারটি মাত্র লক্ষণ মিলিয়ে? তা কি করে সম্ভব? সে ক্ষেত্রে তো শুধু উপশমই হবে। আরোগ্য তো হবে না। কিন্তু আরোগ্য হচ্ছে যে। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে লক্ষণ-সমষ্টি বলতে সব লক্ষণের যোগফল নয়, অন্য কিছু।

পূর্বে বর্ণিত রোগীর ক্ষেত্রে রোগ ও রোগীর সব লক্ষণ কি একটা ঔষধে মেলে? প্রায়ই দেখা যায় মিলে না। অথচ রোগী আরোগ্য লাভ করে। এর কারণ- লক্ষণ সমষ্টি বলতে হ্যানিম্যান লক্ষণের যোগফল বোঝাননি। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন লক্ষণ-সমষ্টির একটা সামগ্রিক চিত্র। রোগসহ রোগীর একটা চিত্র যদি আমরা পাই তাহলেই বঝুতে হবে লক্ষণ-সমষ্টি পেয়েছি। এই চিত্র পেতে যদি দেখা যায় রোগীর কিছু কিছু লক্ষণ এই চিত্রের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে না- তাতে কোন ক্ষতি নেই। ঔষধ চিত্রের সাথে সাদৃশ্য মিলিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করলেই রোগী -চিত্রের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন লক্ষণও স্বাভাবিকভাবেই চলে যাবে। কারণ রোগী-চিত্র সমুলে দূরীভূত হলে- ঔষধ চিত্রের সাথে না মেলা লক্ষণগুলি থাকবে কোথায়?

ঠিক তেমনি, একটা ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নিয়ে গঠিত ঔষধ চিত্রই আমরা মনে রাখি। তার জন্য সব লক্ষণ মনে না রাখলেও চলে। লাইকোপডিয়াম, ক্যালকেরিয়ার কটা লক্ষণ আমরা জানি? অথচ আমরা মোটামুটি লাইকো বা ক্যালেকেরিয়ার একটা পূর্ণ চিত্র বর্ণনা করতে পারি। ছবি আঁকা সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ একজন লোকের কাছেও কোন বিশেষ ছবি খুব ভাল লাগতে পারে। ভাল লাগার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি হয়তো কিছুই বলতে পারবেন না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ছবিটার প্রতিবিম্ব তাঁর মনে গেঁথে যেতে পারে। আমরা জীবনে বহু লোককে চিনি ও মনে রাখি। তাঁদের

কারও শরীরের সবগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের জানা নাও থাকতে পারে- কিন্তু তার জন্য তাঁদেরকে চিনতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না।

কাজেই সব লক্ষণ না জেনেও রোগী-চিত্র তথা ঔষধ-চিত্র পাওয়া যায় এবং এই চিত্রের উপর ভিত্তি করে ঔষধ-নির্বাচন করলে রোগীর সব লক্ষণই চলে যায়।

এবারে দেখা যাক কিভাবে এই চিত্র আমরা পাই। কোন রোগীতে এই চিত্র পেতে হ'লে প্রথমেই দরকার একটা প্রথম শ্রেণীর রোগী-লিপি (case taking) তৈরী করা। এই রোগী-লিপিতে যেন কোন কিছু বাদ না যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ রোগী-বিবরণ সংগ্রহ করার সময় কোন মূল্যবান তথ্য যদি বাদ পড়ে যায় তবে কিছুতেই রোগীর সার্থক চিত্র পাওয়া যাবে না। ফলে আপাতসদৃশ ঔষধ নির্বাচনের দ্বারা সাময়িক উপশম দেওয়া যাবে মাত্র বা বহু ব্যর্থতার পর অনেক ঘুরে অনেক দেরীতে হয়ত সার্থক চিত্র পাওয়া যাবে। কাজেই লক্ষণ-সমষ্টির সার্থক চিত্র পেতে হ্যানিম্যান-নির্দেশিত পথে যথাযথভাবে রোগী বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে।

এরপর আসে রোগীর লক্ষণগুলির সঠিক বিশ্লেষণ। একে হোমিওপ্যাথিতে অ্যানামনেসিস্ বলা হ'য়েছে। এর মধ্যেই আসে রোগের প্রারম্ভিক কারণ; ধারক, বাহক ও উত্তেজক কারণ, রোগীর অতীত, ব্যক্তিগত এবং বংশ ইতিহাস ও তা থেকে সিদ্ধান্ত, রোগের সাধারণ এবং স্বাতন্ত্রজ্ঞাপক লক্ষণগুলির পৃথকীকরণ ইত্যাদি। এই অ্যানামনেসিসের দৃষ্টিভঙ্গির উপরই সার্থক চিত্র নির্ণয় করা বহুলাংশে নির্ভর করে।

এরপরে আসে লক্ষণের মূল্যায়ণ এবং ক্রমানুসারে সেগুলিকে সাজান, হোমিওপ্যাথিতে এটি অত্যন্ত দুরুহ অথচ আনন্দদায়ক পদক্ষেপ।

যে হোমিওপ্যাথ যেভাবে লক্ষণের মূল্যায়ণ করবেন, লক্ষণ-সমষ্টির চিত্র সেইভাবে তার কাছে প্রতিভাত হবে। তাই একই রোগীতে দশ জন হোমিওপ্যাথ দশটি ঔষধ নির্বাচন করেন। এর মধ্যে কার মূল্যায়ণ সঠিক তার পরিচয় পাওয়া যাবে ঔষধের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ক'রে। এই মূল্যায়ণই হোলো চিত্র প্রাপ্তির প্রধান উপায়। মূল্যের ক্রম-অনুসারে লক্ষণগুলিকে সাজালেই রোগী-চিত্র জীবন্ত হয়ে দেখা দেবে। এমনকি হয়ত এও দেখা যাবে যে, সংগ্রহ করা কুড়িপঁচিশটি লক্ষণের মধ্যে মাত্র পাঁচ-সাতটি লক্ষণ থেকেই সার্থক চিত্র পাওয়া গেল। কিন্তু সবকঠি লক্ষণ থেকে মূল্যায়ন ছাড়া কোন চিত্রই পাওয়া সম্ভব হলো না।

কাজেই, রোগীর লক্ষণ-সমষ্টির চিত্র পাওয়ার জন্য সব কটি লক্ষণের প্রয়োজন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। এমন কি সময় সময় একটি মাত্র বিশেষ স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক লক্ষণ দ্বারা এই চিত্র পাওয়া যায়। এই স্বাতন্ত্রজ্ঞাপক লক্ষণের মধ্যে কারণ-সমূহ, রোগীর ধাতুগত লক্ষণ, কনকমিট্যান্টস্, অদ্ভুত এবং বিরল লক্ষণের মূল্য সর্বাধিক। এই রোগী-চিত্রের সাথে এবার আমাদের মেটেরিয়া মেডিকা বর্ণিত ঔষধ চিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পেতে হবে। তাই ঔষধ চিত্রের সম্যক জ্ঞান থাকলে তবেই রোগী-চিত্র পাওয়া সম্ভব। রোগী চিত্র গ্রহণ ক'রে যদি তার সদৃশ একটা ঔষধ চিত্র না পাওয়া যায় তবে রোগী-চিত্র গ্রহণের সার্থকতা কোথায়?

এবার দেখা যাক, ঔষধ-চিত্র লাভ করার উপায় কি? প্রুভিং এর সময় প্রুভারদের মধ্যে একটি ঔষধের যত লক্ষণ দেখা গেছে সেগুলি সবই মেটিরিয়া মেডিকার অন্তর্ভুক্ত। যেসব লক্ষণ বেশীর ভাগ প্রুভারের মধ্যে দেখা গেছে, যে ঔষধ যে ধরণের প্রুভারের মধ্যে বেশীরভাগ লক্ষণ দেখিয়েছে, যে সব লক্ষণ ঔষধটির পুনরায় প্রুভিং এর ফলে পাওয়া গেছে এবং সেসব লক্ষণের ভিত্তিতে ঐ ঔষধ প্রয়োগ করে ফল পাওয়া গেছে, সেইসব লক্ষণই ঔষধ-চিত্র নির্ধারণে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে। প্রুভারের শারীরিক গঠন, প্রুভিং এ প্রাপ্ত মানসিক লক্ষণ, কন্‌কমিট্যান্স এবং অন্যান্য অদ্ভুত লক্ষণ এককথায় ঔষধের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক সব লক্ষণ নিয়েই ঔষধ-চিত্র গঠিত হয়।

লক্ষণের মূল্যায়নের উপরই রোগী-চিত্র এবং ঔষধ-চিত্র নির্ভর করে। কিভাবে এই মূল্যায়ণ করলে সার্থক চিত্র পাওয়া যাবে তা পৃথক প্রবন্ধে বলা হয়েছে। যেদিন বিভিন্ন ঔষধ-চিত্র রূপ পরিগ্রহ করে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে সেদিনই আমাদের মেটিরিয়া পড়া সার্থক হবে, এবং কেবলমাত্র তখনই আমরা সার্থক রোগী-চিত্র গ্রহণ করে, তার সদৃশ্য ঔষধ নির্বাচন করে রোগীকে আরোগ্য করতে পারবো- তার পূর্বে নয়। কদাচিৎ ভাগ্যক্রমে দু-একটি রোগী আরোগ্য করা বা সাময়িক উপশম দিতে পারা-হোমিওপ্যাথ তথা হোমিওপ্যাথির কখনই লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

কন্‌কমিট্যান্টস্
(Concomitants)

কন্‌কমিট্যান্ট সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও মত এত পরস্পরবিরোধী যে যাই লিখি না কেন হয়ত বিতর্ক এড়াতে পারবো না। তবুও বিতর্কমূলক বিষয়গুলির আলোচনার প্রয়োজন আছে- আমাদের নিজেদেরই স্বার্থে। কন্‌কমিট্যান্ট কি তা যদি আমরা ঠিকমত অনুধাবন করার চেষ্টা না করি তবে রোগীর ক্ষেত্রে সেগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাবে না। অথবা কন্‌কমিট্যান্ট নয় এমন লক্ষণকে অহেতুক মূল্য দিয়ে-ভুল করা হবে।

কন্‌কমিট্যান্ট শব্দের ডাক্তারী অভিধানগত অর্থ হলো- মূল লক্ষণের আনুষঙ্গিক হিসাবে আসে এমন লক্ষণ- যা রোগের মেয়াদের মধ্যে আশা করা যায় না বা দেখতে পাওয়া যায় না। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে- Concomitant বুঝতে হলে Practice of Medicine, Pathology প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অপরিহার্য। Practie of Medicine-এ বর্ণিত রোগ নির্ণয় সঠিকভাবে জানলে তবেই Concomitant বোঝা যাবে। অন্যথায় নয়। এই কারণেই হোমিওপ্যাথিতে এইসব বিষয়গুলি যথোচিত গুরুত্ব সহকারে শেখা এবং শেখানো উচিত।

যেমন- একটা নিউমোনিয়া রোগীতে জ্বর, কাশি, বুকে ব্যাথা, ফুসফুসের কোন অংশের Consolidation হওয়া, ষ্টেথেসকোপে টিউবুলার ব্রিদিং পাওয়া, ঠোঁটের পাশে হারপিস জাতীয় উদ্ভেদ দেখা দেওয়া, প্রতি মিনিটে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা খুব বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলি নিউমোনিয়ার সাধারণ লক্ষণ হিসাবে আমরা আশা করি বা পেয়ে থাকি। Practice of Medicine এ এগুলি সব নিউমোনিয়ার মূল লক্ষণ হিসাবে লেখা আছে। কাজেই এর কোনটাই একে অন্যের Concomitant হতে পারে না। কিন্তু ঐ নিউমোনিয়া রোগী যদি

কাশতে গেলেই পায়ে বা শরীরের কোন দূরবর্তী স্থানে ব্যাথা অনুভব করে তবে ঐ পায়ের ব্যাথা লক্ষণটি কাশি এই মূল লক্ষণের Concomitant হবে। কারণ কাশতে গেলে বুকে ব্যাথা অনুভব করা নিউমোনিয়া রোগীতে খুবই স্বাভাবিক এবং ঐ রোগের মেয়াদকালীন একটা সাধারণ লক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু কাশতে গেলে পায়ে ব্যাথা হবে এমন কোন লক্ষণের কথা কোন Practice of Medicine এ নেই। এই রোগীকে যে ঔষধুই দেওয়া হোক তার মধ্যে এই Concomitant লক্ষণটি অবশ্যই থাকা চাই। কারণ এই লক্ষণটি এক্ষেত্রে রোগীর স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞাপক। এই রোগীকে নিউমোনিয়ার তথাকথিত নামকরা ওষুধ যেমন- ফসফরাস, এন্টিমটার্ট, লাইকো, কেলি কার্ব, ইপিকাক ইত্যাদি আরোগ্য করতে সক্ষম হবে না- কিন্তু কসটিকাম বা ক্যাপসিকাম প্রয়োগে রোগী আরোগ্য হতে পারে। আবার এই রোগীতে যদি ক্রমাগত মুখ থেকে লালা ঝরতে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে প্রচুর জলপিপাসা ও ভিজে জিভ থাকে- **তবে লাল পড়া এই মুল লক্ষণটির Concomitant হবে ভেজা জিভ ও প্রচুর জলপিপাসা**। কিন্তু নিউমোনিয়া রোগীতে লালা পড়া একটা মূল লক্ষণ হতে পারে না। কারণ লালা পড়া এবং আর্দ্র জিভ সত্ত্বেও প্রচুর জলপিপাসা নিউমোনিয়া রোগের সাধারণ লক্ষণ হিসেবে কোন Practice of Medicine এ লেখা নেই- যদিও এর প্রত্যেকটি লক্ষণ এই রোগীর স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক এমনকটি ক্ষেত্রবিশেষে ওষুধ নির্বাচনে একমাত্র সহায়ক লক্ষণও হতে পারে। বাঁচার আশা নেই এমনি এক নিউমোনিয়া রোগীকে এই স্বাতন্ত্রজ্ঞাপক লক্ষণগুলি দেখে মার্ক সল দিয়ে আরোগ্যলাভ করতে দেখেছি। অর্গ্যাননে এই রকম লক্ষণকে Peculiar, Striking বা Individualising লক্ষণ বলা হয়েছে- কিন্তু এগুলি Concomitant নয়। কারণ Concomitant হতে হলে এগুলির মধ্যে একটা লক্ষণ অন্ততঃ রোগের মূল বা সাধারণ লক্ষণ হওয়া চাই। কিন্তু এই লক্ষণগুলি যদি একটা ডিফথিরিয়া রোগীতে পাওয়া যায়-তবে লালা পড়া ও আর্দ্রজিভ এই সাধারণ লক্ষণের Concomitant হবে প্রচুর জলপিপাসা।

পালসেটিলার একটা প্রধান লক্ষণ শীত শীতভাবসহ যন্ত্রণা। যন্ত্রণা হলেই শীতভাব থাকবে এমন কথা Practice of Medicine-এ লেখা

নেই। কাজেই এখানে শীতভাব-যন্ত্রণা এই মূল লক্ষণের Concomitant। এই লক্ষণ পেলে আমরা পালসেটিলার কথা অবশ্যই চিন্তা করবো। কিন্তু বিলিয়ারি কলিক বা রেনাল কলিক-এ যদি এই শীতভাব থাকে- তবে তা Concomitant নাও হতে পারে। কারণ Pathology-র জ্ঞান থেকে আমরা জানি Biliary tract বা Urinary tract এ Infection হলে-শীতভাবসহ এই ধরণের কলিক পেন হতে পারে। এখানে শীতভাব এবং কলিক পেন এই দুটোই Infection জনিত সাধারণ লক্ষণ একে অন্যের Concomitant নয়। কিন্তু বাতের যন্ত্রণা, মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদি অবস্থায় যদি এই শীতভাব থাকে- তখন এটা Concomitant হিসেবে গণ্য হবে। কারণ এইসব অবস্থায় শীতভাবসহ যন্ত্রণার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

যন্ত্রণার সাথে আক্রান্ত স্থানে অবশভাব (Pain with numbness) এটা সাধারণ লক্ষণ হতে পারে- আবার Concomitant হতে পারে। আঘাত লেগে কোন স্থানে যন্ত্রণা হ'লে সেখানে কমবেশী অবশভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। এখানে যন্ত্রণা ও অবশভাব দুটি পৃথক লক্ষণ, Concomitant নয়। অথবা দীর্ঘদিন ধ'রে কোন স্থানে যন্ত্রণা হতে থাকলে স্নায়ুর অবসাদজনিত অবশভাব দেখা দিতে পারে। এখানেও যন্ত্রণা ও অবশভাব দুটি পৃথক লক্ষণ। কিন্তু সবেমাত্র কোন স্থানে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে এবং শুরু থেকেই যন্ত্রণার সাথে অবশভাব আছে। এখানে Practice of Medicine বা Pathology-তে এই অবশভাবের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। কাজেই এখানে এই লক্ষণটি Concomitant সন্দেহ নেই।

পেটের যন্ত্রণার সাথে পাকস্থলীতে খালি খালি ভাব Duodenal ulcer এর রোগীর ক্ষেত্রে Concomitant নয়-দুটি পৃথক লক্ষণ। কিন্তু এই রোগীর ভরাপেট খাওয়ার পর কষ্টের সামান্য উপশম হলেও যদি যন্ত্রণা চলতে থাকে এবং তার সাথে পাকস্থলীতে খালি খালি ভাব থাকে তবে পাকস্থলীতে শূণ্যভাব-যন্ত্রণা এই মুল লক্ষণের Concomitant অবশ্যই।

হাতপায়ে জ্বালাসহ হাত পা গরম Concomitant নয়-দুটি পৃথক লক্ষণ। কিন্তু কলেরার Collapse অবস্থাতেও সর্বশরীরে অসহ্য জ্বালা ও আচ্ছাদন রাখবার অনিচ্ছা পৃথক লক্ষণ নয়। Collapse এই মূল লক্ষণের Concomitant হলো জ্বালা ও আচ্ছাদনে অনিচ্ছা- উভয়ই।

কলচিকাম-এর একটা প্রধান লক্ষণ রান্না করা হ'চ্ছে এমন খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে প্রচন্ড বমনেচ্ছা। যদি দীর্ঘদিনের একটা ডিসপেপসিয়া রোগীতে এই লক্ষণ থাকে যার খাদ্যে একেবারেই রুচি নেই, পেট সব সময় বায়ুতে ভর্তি, তবে সেক্ষেত্রে এই বমনেচ্ছা একটা সাধারণ লক্ষণ মাত্র। কিন্তু একটা বাতের রোগীতে বা অন্য কোন চির-রোগে যদি এই লক্ষণ থাকে তবে সেটা নিশ্চয়ই একটা Concomitant এবং কলচিকামকে অবশ্যই নির্দেশ করবে।

মেটিরিয়া মেডিকায় এরকম প্রচুর Concomitants আছে। আরও উদাহরণ দিতে গেলে প্রবন্ধের অহেতুক কলেবর বৃদ্ধি এবং পাঠকদের বিরক্তির কারণ হতে পারি। তাই এখানে শুধু এটুকুই বলবো যে একই লক্ষণ কখনও Concomitant আবার কখনও বা সাধারণ লক্ষণ হতে পারে। কোন রোগে, কখন, কি অবস্থায় একটা সাধারণ লক্ষণ Concomitant হয় আবার একটা Concomitant সাধারণ লক্ষণ হয়-এটুকু বুঝতে পারার উপর হোমিওপ্যাথির সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে।

আমরা অনেকে রোগীর প্রধান একটি, দুটি বা তিনটি কষ্টের আনুষঙ্গিক যত লক্ষণ থাকে তার সবগুলিকেই Concomitant মনে করি। কিন্তু তাই যদি হয় তবে আমরা প্রতিটি লক্ষণের Location, Sensation, Modalities ও Concomitant জানতে চেষ্টা করি কেন? একটা রোগীর হয়ত মাথার যন্ত্রণা, বমনেচ্ছা ও কোষ্ঠবদ্ধতা আছে। আমরা যদি বমনেচ্ছা ও কোষ্ঠবদ্ধতাকে মাথার যন্ত্রণার Concomitant মনে করি তবে তো আমাদের কাছে এগুলি মাত্র একটা লক্ষণ হিসেবেই গ্রহণযোগ্য হবে অর্থাৎ 'মাথার যন্ত্রণা', কিন্তু সত্যি কি তাই? মোটেই না।

বরং আমরা তিনটি লক্ষণকে তিনটি পৃথক হেডিং এ লিখি এবং এদের প্রত্যেকটির Location, Sensation, Modalities এবং Concomitant জানার চেষ্টা করি। যেমন- যখনই মাথার যন্ত্রণা হয় তখনই যেন মনে হয় মাথার উপর দিয়ে কিছু একটা চলে বেড়াচ্ছে। যন্ত্রণার প্রকৃতি হাতুড়ি পেটার মত। কপাল ও মাথার তালুতেই যন্ত্রণা বেশী এবং ঠান্ডা জলে উপশম ইত্যাদি। অনুরূপভাবে বমনেচ্ছার সঙ্গে কেবলই মনে হয় বমি হলে আরাম হবে, হিমশীতল জলপানে বমনেচ্ছার উপশম, বমনেচ্ছার সাথে মুখে প্রচুর লালা (Concomitant- Lobelia) ইত্যাদি। কোষ্ঠবদ্ধতারও ঐ রকম বহু আনুষঙ্গিক লক্ষণ থাকতে পারে যার কোনটি হয়ত কোষ্ঠবদ্ধতার Concomitant কোনটি Modality ইত্যাদি। তবে যদি এমন হয় যে যতক্ষণই মাথার যন্ত্রণা কেবল ততক্ষণই কোষ্ঠবদ্ধতা ও বমনেচ্ছা, যন্ত্রণা চলে গেলে অন্য দুটিও সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে এবং অন্য দুটি লক্ষণের কোন স্বাতন্ত্র-জ্ঞাপক লক্ষণ নেই- তখন কিন্তু বমনেচ্ছা ও কোষ্ঠবদ্ধতা মাথার যন্ত্রণার Concomitant হতে পারে। কাজেই আমরা দেখলাম Concomitant হতে হলে- সেই লক্ষণটির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না অন্য কোন মূল লক্ষণের আনুষঙ্গিক হিসেবেই সব সময় তাকে থাকতে হবে এবং তার কোন Pathological কারণ বা ব্যাখ্যা থাকবে না। যদি Pathology বা Practice of Medicine- এর জ্ঞান দ্বারা রোগের লক্ষণটির কারণ ব্যাখ্যা করা যায় তবে তা Concomitant নয়। মূল লক্ষণটির সাথে Concomitant "হরিহর আত্মা"র মত মিশে থাকবে- পৃথক করা যাবে না। কাজেই তিনটি শর্ত পূরণ হলে তবেই কোন লক্ষণ Concomitant হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য।

যথা- ১) রোগের একটা মূল বা সাধারণ লক্ষণ থাকবে।

২) Concomitant সব সময়েই মূল লক্ষণের সঙ্গে মিশে থাকবে- তার কোন আলাদা অস্তিত্ব থাকবে না।

-৩

এবং ৩) রোগী যে রোগে ভুগছে সেই রোগের Pathology দ্বারা Concomitant এর ব্যাখ্যা করা যাবে না।

হোমিওপ্যাথিতে লক্ষণের মূল্যায়ণে এবং রোগীর স্বতন্ত্রীকরণে Concomitant লক্ষণের অবদান অসামন্য একথা নিশ্চয়ই সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। কাজেই হোমিওপ্যাথ মাত্রেরই এ সম্বন্ধে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন একটা সম্যক ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক ব'লেই আমি মনে করি।

হেরিং এর আরোগ্য নীতি
(Hering's Law of Care)

রোগ চিকিৎসার যে নীতি হ্যানিম্যান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত করে গেছেন এবং যা এক শাশ্বত সত্য বলে আজ স্বীকৃত, সেই "থেরাপিউটিক ল অব নেচার" এর মত রোগ আরোগ্যেরও একটা নির্দিষ্ট নীতি আছে। হ্যানিম্যান নিজে ঐ ধরণের কোন নীতির কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু আরোগ্য বোঝার কয়েকটা লক্ষণের কথা "অর্গ্যানন ও ক্রনিক ডিসিজ" গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন। যেমন তিনি বলেছেন আরোগ্যের সময় সবচেয়ে শেষে আসা লক্ষণগুলি আগে দূরীভুত হয়; অথবা চিকিৎসাকালে যদি লুপ্ত চর্মরোগ পুনরায় দেখা দেয় বা কোন স্রাব নির্গত হতে শুরু করে তবে রোগী আরোগ্যের দিকে যাচ্ছে বলে বুঝতে হবে, ইত্যাদি।

ডাক্তার হেরিং বিভিন্ন রোগীতে আরোগ্যের ধারা পর্যবেক্ষণ করে একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং তিনি তা একটা নীতির আকারে প্রকাশ করেন- যা হেরিং এর আরোগ্য নীতি বলে হোমিওপ্যাথিক সমাজে প্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নীতি অনুসারে যে কোনো প্রাকৃতিক চির-রোগ কেবলমাত্র নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করেই আরোগ্য হবে- অন্য কোন উপায়ে হবে না। অন্য উপায়ে যে আরোগ্য সম্ভব নয় সেটা এক বহু "পরীক্ষিত সত্য বলেই গৃহীত হয়েছে এবং আমরা প্রতিদিন আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তার প্রমাণ পাচ্ছি। যাই হোক হেরিং এর আরোগ্য নীতি হলো:-

১) আরোগ্য পথে রোগীর লক্ষণ উপর থেকে নীচে অপসারিত হবে।

২) ভেতর থেকে বাইরের পথে দূরীভূত হবে এবং

৩) রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সময় যে ক্রম অনুসরণ করে প্রকাশ পেয়েছিল তার বিপরীত ক্রম অনুসরণ করে দূরীভুত হবে অর্থাৎ যে লক্ষণ

সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছিল সেই লক্ষণ সকলের শেষে দূরীভুত হবে এবং যা সবশেষে এসেছিল সেটাই সবার আগে দূরীভুত হবে।

উপরে বর্ণিত তিনটি উপায় আপাতদৃষ্টিতে পৃথক মনে হলেও কার্যতঃ তারা একই। দেখা যাক কেন?

প্রথমতঃ - আমরা দেখবো ওপর থেকে নিচে লক্ষণ দূরীভুত হবে বলতে কি বোঝায়। এর অর্থ এই নয় যে প্রথমে মাথার লক্ষণ ভাল হবে,তারপর গলা, ঘাড়, বুক, হাত, পেট, পা ইত্যাদি ভাল হবে। উপর থেকে নিচে বলতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্র এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্র বোঝান হয়েছে। যেমন কারও যদি মাথার যন্ত্রণা এবং হৃৎপিন্ডের লক্ষণ বর্তমান থাকে তবে আরোগ্যের সময় যেহেতু মাথা হৃৎপিন্ডের উপরে আছে কাজেই মাথা আগে ভাল হবে এটা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে হৃৎপিন্ডের লক্ষণই আগে দূরীভূত হবে। কারণ, হৃৎপিন্ড মাথার স্নায়ুর চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান যন্ত্র। কাজেই ঠিক আক্ষরিক অর্থে উপর থেকে নীচে লক্ষণ দূরীভূত নাও হতে পারে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থেই এটা প্রযোজ্য। যেমন কারও যদি বিভিন্ন সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা থাকে তবে আরোগ্যের সময় প্রথমে দেহের উপরের সন্ধিস্থলগুলি (ঘাড়, কাঁধ, কনুই,কব্জি ইত্যাদি) এবং তারপর নিম্নাঙ্গের সন্ধিস্থলগুলি যন্ত্রণামুক্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ- লক্ষণগুলি ভেতর থেকে বাইরে এই ক্রম অনুসারে দূরীভূত হবে, যেমন কারও হৃৎপিন্ডের যন্ত্রণা ও সন্ধিস্থলের বেদনা থাকলে আগে তার ভেতরের যন্ত্র অর্থাৎ হৃৎপিন্ড রোগমুক্ত হবে, তারপর সন্ধিস্থলের লক্ষণ দূরীভুত হবে। হাঁপানী এবং চর্মরোগ একযোগে বর্তমান থাকলে আগে হাঁপানী এবং পরে চর্মরোগ আরোগ্য হবে। চর্মরোগ চাপা পড়ে হাঁপানী দেখা দিলে সঠিক ঔষধ প্রয়োগের পর প্রথমেই হাঁপানীর কষ্ট লাঘব হবে এবং লুপ্ত চর্মরোগ পুনরায় দেখা দেবে। হাঁপানী সম্পূর্ণ আরোগ্য হবার পর চর্মরোগ আরোগ্য হবে। এখানে সুনির্বাচিত ঔষধ ভেতর থেকে লুপ্ত রোগ লক্ষণকে বাইরে প্রকাশ পেতে বাধ্য করবে। অন্যথায় আরোগ্য হবে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় শর্তটিরও অর্থ একই। অর্থাৎ আগে অধিক মূল্যবান এবং পরে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান দেহযন্ত্রগুলি রোগমুক্ত হবে।

তৃতীয়তঃ- লক্ষণগুলি যে ক্রম অনুসরণ করে দেখা দেয় তার বিপরীতক্রম অনুসরণ করে আরোগ্য হয়। যেমন কোন রোগীর কুড়ি বৎসর যাবৎ কোষ্ঠবদ্ধতা, পনের বৎসর যাবৎ অম্লাধিক্য, দশ বৎসর যাবৎ মাথার যন্ত্রণা, আট বৎসর যাবৎ লিভার বড় হওয়া, পাঁচ বছর যাবৎ মাথা ঘোরা, দু'বৎসর যাবত শ্বাসকষ্ট এবং দু'মাস যাবৎ সমস্ত শরীর ফুলে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমানে চলছে। হোমিও চিকিৎসায় সুনির্বাচিত ধাতুগত ঔষধ পড়লে এবং রোগের কারণ দূরীভুত হয়ে যদি রোগী আরোগ্যলাভ করে তবে প্রথমেই তার শরীরের ফুলে যাওয়াটা চলে যাবে। তারপর একে একে শ্বাসকষ্ট, মাথাঘোরা, যকৃতের অস্বাভাবিকতা, মাথার যন্ত্রণা, অম্লাধিক্য এবং সবশেষে কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীভুত হবে। এছাড়া অন্য কোনো নিয়মে আরোগ্য হতে পারে না।

কাজেই এ ধরণের রোগী যদি তার কোষ্ঠবদ্ধতার এবং অম্লাধিক্যের জন্য প্রথমে ঔষধ দিতে বলে এবং হোমিও চিকিৎসক যদি তাকে খুশী করার জন্য চেলিডোনিয়াম, কার্ডুয়াস ইত্যাদি মাদার টিনচার বা রোবিনিয়া, সালফিউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি শক্তিকৃত ঔষধ দেন তবে সাময়িক একটু উপশম হলেও হতে পারে। কিন্তু আরোগ্য হবে না- হতে পারে না। কারণ এখানেও সেই একই নিয়ম প্রথমে অধিকতর মূল্যবান এবং পরে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান দেহযন্ত্র আরোগ্যলাভ করবে। কারণ রোগের শুরুতে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই প্রথমে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান এবং পরে ক্রমানুসারে অধিকতর মূল্যবান দেহযন্ত্র আক্রান্ত হয়। কাজেই আরোগ্যের সময় রোগীরই স্বার্থে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে বিপরীত ক্রম অনুসরণ করে অর্থাৎ মূল্যবান দেহযন্ত্র আগে রোগ মুক্ত হয়ে সবশেষে সবচেয়ে কম মূল্যবান দেহযন্ত্র রোগমুক্ত হবে।

আমরা আজকাল রোগীকে খুশী করতে এবং অল্পায়াসে বাজিমাৎ করতে রোগী যেটা থেকে আশু উপশম চায় সেটার জন্যই ঔষধ দিই। স্বভাবতঃই সে ঔষধ সামগ্রিক চিত্র মিলিয়ে দেওয়া হয় না- তা সম্ভবও নয়। তাই যকৃতের জন্য, মাথার যন্ত্রণার জন্য, ঘুমের জন্য, ক্ষুধার জন্য আলাদা আলাদাভাবে অনেকগুলি ঔষধ একত্রে দিই। ফল কি হয়, ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তবে আরোগ্য যে হয় না, এ সম্বন্ধে আমি

নিশ্চিত। অন্ততঃ একটি রোগীতেও তা হতে আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। হাঁপানী ও চর্মরোগ একসঙ্গেই বর্তমান থাকলে রোগীর অনুরোধে কুৎসিতদর্শন একজিমাকে প্রথমে ভাল করার চেষ্টায় ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগীর একজিমা একটু কমলেও কমতে পারে, কিন্তু রোগীর জীবন সংশয় অনিবার্য। জীবনে বহুক্ষেত্রে এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। তাই যাঁরা সিজিজিয়াম মাদার দিয়ে রক্তের শর্করা, রাউলফিয়া সারপেনটিনা মাদার দিয়ে রক্তচাপ ইত্যাদি দ্রুত কমিয়ে দিয়ে রোগীর নিকট হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতার বড়াই করেন- তাঁরা অচিরেই দেখতে পান তাঁদের এই উপশমজনিত চাপাপড়া লক্ষণ সমূহ কি মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনে।

তাই সব পাঠক-পাঠিকাকে আমার বিনীত অনুরোধ রোগীকে ঔষধ প্রয়োগের পর পর্যবেক্ষণ করুন, লক্ষণগুলি হেরিং-এর নীতি অনুসারে দূরীভুত হচ্ছে কিনা? যদি তা না হয় নিজের ভুল সংগে সংগে সংশোধন করুন। রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য হবে।

মায়াজম্
(Miasm)

হোমিওপ্যাথিতে মায়াজমের গুরুত্ব এত বেশী যে এর সম্বন্ধে একটা পরিস্কার ধারণা ও জ্ঞান সব হোমিওপ্যাথেরই থাকা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মায়াজম্, সম্বন্ধে আমাদের মতবিরোধ হোমিওপ্যাথির উন্নতির পথে বোধহয় প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। "মায়াজম্ রোগজীবাণু ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কাজেই "মায়াজম্", "মায়াজম্" করে চীৎকার করার কিছু নেই, বরং মায়াজম্ বিষয়টি হোমিওপ্যাথির পাঠ্যসূচী থেকে উঠিয়ে দেওয়া উচিত"- এটাই অনেক হোমিওপ্যাথের মত বলে আমি শুনেছি। কিন্তু সত্যি কি তাই? বিষয়টি কি এতই সহজ? এর মধ্যে কি কোনই যথার্থতা নেই? মায়াজম্ বিষয়টি বা শব্দটি উড়িয়ে দিলেই কি হোমিওপ্যাথির যথার্থ উন্নতি হবে? না। কখনোই তা হতে পারে না। বরং এই মায়াজমের মধ্যেই চির-রোগ আরোগ্যের সব চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এটা কল্পনাবিলাস নয়- অভিজ্ঞতালব্ধ অকাট্য সত্য কথা।

"মায়াজম্" শব্দটির অভিধানগত অর্থ হলো এমন কোন কিছু যা শরীরকে দূষিত করে। হ্যানিম্যানের সময়েও "মায়াজম্" কথাটির প্রচলন ছিল। অর্গ্যাননে চিররোগের শরুতে হ্যানিম্যান বলেছেন তাঁর সময়ে একমাত্র সিফিলিসকে মায়াজমেটিক রোগ বলে মনে করা হতো। কারণ কারও সিফিলিস হলে যদি তা সুচিকিৎসিত না হয়, তবে বংশানুক্রমে এই রোগের প্রভাব চলতে থাকে। অর্থাৎ যার এই রোগ হয় তার শরীরে এই রোগের একটা স্থায়ী চিহ্ন (stigma) বর্তমান থাকে। তিনি তাঁর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-জীবনের বারো বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে সিফিলিস ছাড়াও আরও দু'টি চিররোগের সন্ধান পেলেন। এদের নাম দিলেন -সাইকোসিস ও সোরা। কাজেই মায়াজম বা মায়জমেটিক অবস্থা হ্যানম্যানের নতুন আমদানী করা শব্দ বা অবস্থা নয়, তৎকালীন একটা

প্রচলিত শব্দ, যার অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি ব্যাপকভাবে হোমওপ্যাথিতে এর ব্যবহার ও প্রচলন ঘটালেন। মায়াজম্ শব্দটি পাল্টে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যে অর্থে এর ব্যবহার এবং এর দ্বারা যে অবস্থার কথা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে- তার পরিবর্তন কোনদিনই সম্ভব নয়। কারণ চিকিৎসা করতে হলে এই অবস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে হবে এবং সার্থকভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু মায়াজমকে জীবাণু বলে মনে করলে এই অবস্থাগুলির সঙ্গে কখনও পরিচয় ঘটবে না এবং তার প্রতিকারও সম্ভব হবে না।

তা হলে দেখা গেল, মায়াজম্ হচ্ছে এমন কিছু যা একবার মানবদেহে ঢুকলে এবং সুচিকিৎসিত না হলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে, যা সারাজীবন ধরে চলতে থাকে এবং সন্তান সন্ততিদের মধ্যেও তার ফলজনিত অস্বাভাবিক অবস্থার চিহ্ন প্রায়শই সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে। ভবিষ্যতে সুবিধাজনক পরিবেশে এই সুপ্ত অবস্থা প্রকাশ্য অসুস্থতার রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। মায়াজম্ সম্বন্ধে এত মতবিরোধের কারণ এই যে হ্যানিম্যান মায়াজমের সঠিক সংজ্ঞা কোথাও দেন নি। শুধু এইটুকু বোঝা যায়, মায়াজম্ সব রোগের মূল কারণ (Fundamental Cause)। প্রথমে চির রোগের (Chronic diseases) কারণ হিসাবে সোরিক, সিফিলিটিক এবং সাইকোটিক মায়াজমের কথা বলেছেন- পরে তরুণ রোগের কারণ হিসাবে, অনেক রকম মায়াজমের কথা বলেছেন- যেমন ফিক্সড্ মায়াজম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন, সোরা না থাকলে কোন প্রকার প্রকৃত তরুণ রোগও হতে পারে না। তরুণ রোগের ক্ষেত্রে অপবৃত্তি (Indisposition) এবং চির-রোগের ক্ষেত্রে সিউডো-ক্রনিক। (Pseudo Chronic disease) ছাড়া আর সব রোগই মায়াজম্ জনিত এবং তাদের পিছনে সোরা অবশ্যই আছে। "অর্গ্যানন অ্যান্ড ক্রনিক ডিজিজ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার মায়াজমের উল্লেখ থাকায় এবং ১৮৩২ সালে কলেরার কারণ সম্বন্ধে লেখা তাঁর একটা চিঠির জন্য মায়াজমের সংজ্ঞা নিয়ে নানারকম মত ও সংশয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু ঠিকমত অনুধাবন করে আমি কোথাও কোন অসঙ্গতি খুঁজে পাইনি।

সমস্যা হলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এবং তার লেখার অর্থ ও ব্যাখ্যার পার্থক্য নিয়ে।

কলেরার কারণ সম্বন্ধে লেখা তাঁর চিঠিতে আছে যে, কলেরা যেভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তাতে মনে হয় যে, "কলেরা সতেজ (animated) মায়াজমেটিক বস্তু দ্বারা সৃষ্ট হয়।" সতেজ বস্তু (animated being) বলতে তিনি নিশ্চয়ই জীবাণু জাতীয় কিছু বোঝাতে চেয়েছেন। কারণ আমরা জানি কলেরার কারণ হলো "কোমা ভিব্রিও" বা "কলেরা ব্যাসিলাস।" হ্যানিম্যানের সময় মাইক্রোসকোপ ছিল না। কাজেই, জীবাণুর সঠিক আকৃতি জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এর থেকেই এটা প্রমাণিত হয় না যে, মায়াজম অর্থে হ্যানিম্যান জীবাণুকেই বুঝিয়েছেন। কারণ এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে তিনি শুধু "animated being" বলেননি-বলেছেন "miasmatic animated being" - অর্থাৎ শুধু কোন প্রকার জীবাণু হলেই হবে না সেই জীবাণুর অবশ্যই মায়াজম্ সুলভ বৈশিষ্ট্য থাকা চাই।

এরপর আসে ফিক্সড মায়াজম্- এর কথা। হাম, বসন্ত ইত্যাদি রোগ যখনই দেখা দেয় তখনই একই রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তাই তাদের কারণগুলিকে তিনি ফিক্সড মায়াজম্ বলেছেন। আমরা এখন জানি এই সব রোগের কারণ হলো ভাইরাস। হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক রোগের কারণকে তিনি হাফ-অ্যাকিউট (half-acute) মায়াজম্ বলেছেন। কারণ পাগলা কুকুরে কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে এর লক্ষণ প্রকাশ পায় না। অনেক সময় দীর্ঘদিন পরেও এই লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু একবার লক্ষণ প্রকাশ পেলে খুব দ্রুত রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে এবং সব লক্ষণই তরুণ রোগের মত হয়ে দেখা দেয়। বর্তমানে আমরা জানি, এই রোগেরও কারণ হলো ভাইরাস। এইসব কারণে বর্তমান হোমিওপ্যাথিক সমাজ মায়াজম্ অর্থে জীবাণু বলে থাকেন। কিন্তু জীবাণু দ্বারা সংঘটিত নয় এই ধরণের রোগগুলির ব্যাখ্যা কি এতে দেওয়া যাবে? যেমন মৃগী, রক্তের উচ্চচাপ, ক্যানসার, মানসিক রোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি। এইসব রোগের মায়াজম্ ঘটিত কারণ আমরা জানি। কিন্তু জীবাণু কি তা জানি

না। তাহলে মায়াজম্ জীবাণু হবে কি করে? তাছাড়া দীর্ঘদিন যাবত ঔষধ ব্যবহারের ফলে যে কৃত্রিম চির-রোগ সৃষ্টি হয়, তার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে ড্রাগ-মায়াজম্। তাহলে কি ঔষধের মধ্যেও জীবাণু আছে? তা যখন নেই তখন মায়াজম্ অর্থে জীবাণু হ'তে পারে কি করে? সবশেষে সোরার মায়াজম্ আমরা জানি ইচ্-ভেসিকেল (Itch Vesicle)- এর রসের মধ্যে থাকে। কিন্তু এর জীবাণু কি, আজও আমরা জানি না। অথচ এই সোরাই আট ভাগের মধ্যে সাত ভাগ চির-রোগের জন্য দায়ী। সোরাই যদি জীবাণু দিয়ে ব্যাখ্যা করা না যায়, তবে জীবাণু ও মায়াজম্ এক মনে করা হাস্যস্কর নয় কি? তাছাড়া একই মায়াজম্ ঘটিত অবস্থার বিভিন্ন ঔষধ আছে। তার থেকে রোগীর ধাতুগত ও লক্ষণ সমষ্টির চিত্র-সদৃশ একটা ঔষধ নির্বাচন করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু মায়াজম্ অর্থে জীবাণু ধরলে কি জীবাণুর ঔষধ নির্বাচন করা যাবে? আমাদের ঔষধ কি যক্ষ্মা, কলেরা, বি-কোলাই ইত্যাদি রোগের জীবাণু টেষ্ট টিউবে ধ্বংস করতে পারে? তা যদি না পারে, তবে জীবাণুর বিরুদ্ধে ঔষধ নির্বাচন হবে কি করে, কাজেই মায়াজম্ অর্থে জীবাণু মেনে নিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করা যাবে না- আমাদের রোগী চিকিৎসায় কোন লাভ হবে না- শুধু আধুনিকতার নামে, মিথ্যা প্রগতির নামে কোন কিছু আমদানী করতে গেলে তার পরিণাম ভায়াবহ হয়ে দেখা দেবে। হোমিওপ্যাথির ধ্বংসই ত্বরান্বিত হবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে মায়াজম যদি জীবাণু না হয়, তবে এটা কি? কোন কিছুকে মায়াজম্ হতে গেলে তার কি কি ক্ষমতা থাকা দরকার তা আমি পূর্বেই বলেছি। জীবাণুর মধ্যে কিছু কিছু জীবাণু এই মায়াজম্ গুণ সম্পন্ন। যেমন সিফিলিসের স্পাইরোকিটা প্যালিডা (Spirochitae Palida) এই জীবাণু একবার শরীরে ঢুকলে মায়াজমের সব শর্তই পূরণ করে বলে আমরা জানি। কাজেই রোগ জীবাণু মায়াজম্ বহন করতে পারে। আবার সোরার ইচ-ভেসিকেল (Poric Itch vesicle) এর রসের মধ্যে মায়াজম্ আছে। অর্থাৎ ঐ রসের মধ্যে এমন কিছু আছে যা মায়াজমের সব শর্তই পূরণ করে। আবার সাইকোটিক গণোরিয়ার কারণ

দূষিত যৌন- সংযোগ। অথচ জীবাণু অজানা। কাজেই যোনিস্রাবের মধ্যে এমন কিছু আছে যা সাইকোটিক মায়াজমের শর্ত পূরণ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মায়াজম এমন কিছু যা দেখা না গেলেও তা কোনো বস্তুর মধ্যে থাকে বা কোনো বস্তুর মাধ্যমে বাহিত হয়। এমন কোন জিনিষ আছে জগতে যা দেখা যায় না অথচ যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই এবং যা অবশ্যই কোনো আধারের মধ্যে বিদ্যমান? হোমিওপ্যাথিক মতে আমরা এমন একটি জিনিসের কথা জানি ও মানি তা হল জীবনীশক্তি। একে দেখা যায় না। প্রমাণ করা যায় না, অথচ অস্বীকার করারও উপায় নেই। জীবনী শক্তিহীন হওয়া মানেই মৃত। ডাঃ কেন্ট এই ধরণের জিনিষের নাম দিয়েছেন- সিম্পল সাবসটেন্স (Simple Substance)। জীবনী- শক্তি যেমন একটি সিম্পল সাবসটেন্স, ঔষধের সুক্ষ্মশক্তি এবং রোগের অদৃশ্য সুক্ষ্মশক্তিও তেমনি সিম্পল সাবসটেন্স মাত্র। কাজেই, যে সিম্পল সাবসটেন্স, মায়াজমের সংজ্ঞার সব শর্তি পূরণ করে তাই হলো মায়াজম্। এই মায়াজম্ জীবাণুর মধ্যে থাকতে পারে, হাওয়ার জলকনার মধ্যে থাকতে পারে, কোনো শরীর-রস বা স্রাবের মধ্যে থাকতে পারে, কোন ক্ষতে থাকতে পারে। ঔষধে থাকতে পারে এবং অন্য কোনো কিছুর মধ্যেও থাকতে পারে। কিন্তু জীবাণু মানেই মায়াজম্ নয়। স্রাব মানেই মায়াজম্ নয়, হাওয়ার জলকণা মানেই মায়াজম্ নয়, বা ঔষধ অর্থেই মায়াজম নয়।

হ্যানিম্যান অর্গ্যাননের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলেছেন, রোগের কারণ হলো এক অদৃশ্য শক্তি। এই শক্তি দেহের কোনো অংশ দিয়ে প্রবেশ করে জীবনীশক্তিকে আক্রমণ করে এবং ভিতর থেকে বাইরে তার লক্ষণসমূহ প্রকাশ করে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন রোগের কারণ কোন বস্তু বা পদার্থ বিশেষ নয়। অদৃশ্য শক্তি। অথচ তার প্রবেশ পথ দেহ। একমাত্র সিম্পল সাবসটেন্স ছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে কি এর ব্যাখ্যা করা সম্ভব? তাছাড়া জীবনীশক্তি, রোগশক্তি এবং ঔষধশক্তি সবই হলো ডাইনামিস্ এবং তাদের কাজই হলো ডাইনামিক ক্রিয়া। সিম্পল সাবসটেন্স হলো সেই ডাইনামিস্। তাই নয় কি?

চির-রোগঃ (সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস্)

অনেকেরই ধারণা সোরা একটা মায়াজম্ যার দ্বারা চির রোগের আট ভাগের সাত ভাগ সংঘটিত হয়। কিন্তু এখানেই আমাদের মারাত্মক ভুল। সোরা মায়াজম নয়- একটি মায়াজমেটিক অবস্থা- যা সোরিক মায়াজমের দ্বারা সৃষ্ট হয়। সিফিলিস ও সাইকোসিস মায়াজম্ নয়- মায়াজমেটিক অবস্থা যা সিফিলিটিক ও সাইকোটিক মায়াজম্ দ্বারা সৃষ্ট হয়। একটা রোগাবস্থা এবং তার কারণ এক নয়। টিউবারকিউলোসিস ও টিউবারকুল ব্যাসিলাই কখনই এক হ'তে পারে না। দ্বিতীয়টি হলো কারণ এবং প্রথমটি হ'লো একটা রোগ।

অবশ্য, সোরা, এই রোগাবস্থা আবার বহু পুরাতন রোগের কারণ হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, সিফিলিস ও সাইকোসিস ছাড়া আর সব পুরাতন রোগই হলো সোরা। একই সোরার সহস্র রূপ। রোগ বিভাগ ঘটিত নিরূপণ অনুসারে এক একটা রূপের এক একটা নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন টিউবারকিউলোসিস, কুষ্ঠ, ক্যানসার, মৃগী ইত্যাদি। যদি টিউবারকিউলোসিসকে রোগ হিসাবে নির্ধারণ করতে হয়, তাহলে সোরা তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু যদি টিউবারকিউলোসিসকে সোরার একটা রূপ বলে ধরা হয়, তাহলে সেটা রোগ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই, আধুনিক প্যাথলজি অনুসারে বিচার করলে সোরা কারণ, আর হোমিওপ্যাথিক প্যাথলজি (Dynamic Pathology) অনুসারে বিচার করলে সোরা একটা রোগ। হ্যানিম্যান তাঁর "ক্রনিক ডিসিজ" গ্রন্থে সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিসের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে হোমিওপ্যাথিক মতে সিউডো ক্রণিক রোগ (Pseudo thronic disease) এবং কৃত্রিম-চির- রোগ (Artificial chronic disease) ছাড়া আর সব পুরাতন রোগই সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস এর অন্তর্ভুক্ত। যে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন আমরা পড়ি ও পড়াই তাতে সোরা, সিফিলিস, সাইকোসিস নেই। অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি নেই। কাজেই নতুন প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন লেখা দরকার যার প্রত্যেকটি রোগের বর্ণনায় মূল কারণ সোরা, সিফিলিস,

সাইকোসিসের উল্লেখ থাকবে-যার মধ্যে অর্গানিক প্যাথলজি বর্ণনার আগে প্রত্যেক রোগের ডাইনামিক প্যাথলজির বর্ণনা থাকবে- এবং- রোগ চিকিৎসায় তথাকথিত রোগের নাম ভুলে রোগীর চিকিৎসার বিষয় উল্লেখ করা থাকবে, যার প্রোগনোসিস বা নিদানে কেন্ট এর অবজারভেশনের উল্লেখ থাকবে, দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের উল্লেখ থাকবে, ঔষধের শক্তি ও পুনঃপ্রয়োগের উল্লেখ থাকবে ইত্যাদি। যেদিন এটা সম্ভব হবে, সেদিনই প্রকৃত হোমিওপ্যাথি শেখা ও শেখানো সম্ভব হবে, সার্থক হবে- তার পূর্বে নয়। শিক্ষাক্রমের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রোগ, রোগ আর রোগ শিখিয়ে, চিনিয়ে, পড়িয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর রোগী চিকিৎসা করতে বলা হাস্যকর ও অবাস্তব। এই অবাস্তব পথে প্রকৃত হোমিওপ্যাথ সৃষ্টির আশা সুদূর পরাহত।

সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস এই তিনটি রোগাবস্থার উপরই রোগ জীবাণু কাজ করে এবং তথাকথিত রোগ সৃষ্টি করে। এই রোগাবস্থার মধ্যে সোরাই হলো রোগ- প্রবণতা বৃদ্ধির মূল কারণ। সোরা না থাকলে তরুণ রোগও হবে না। রোগজীবাণু রোগের কারণ অবশ্যই। কিন্তু সোরার দ্বারা প্রভাবিত অত্যাধিক প্রবণতার ফলে জীবনীশক্তি অপেক্ষাকৃত দূর্বল হলে তবেই রোগজীবাণু তার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং রোগসৃষ্টি করে। পরের প্রবন্ধে সোরা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

সোরা (Psora)

হ্যানিম্যান তাঁর "ক্রনিক ডিসিজ" গ্রন্থে সোরার আক্রমণধারা, তার লক্ষণাবলী ও চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশদভাবে লিখেছেন। কাজেই সে বিষয়ে কোনো কাল্পনিক বা মনগড়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তিনি এত পরিস্কারভাবে সব লিখেছেন যে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তিনি লিখিছেন সোরার মায়াজম সোরা ভেসিকেল (Psora vesicle) এর রসের মধ্যেই থাকে। কোন প্রকারে ঐ রস কোন সুস্থ লোকের চামড়ায় লাগলে সোরা শরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। যেদিন এই রস লাগবে তার ছয়, আট, দশ বা চৌদ্দ দিন পরে লোকটির প্রথমে শীত শীত ভাব লাগবে। সন্ধ্যার দিকে শরীর খুব গরম এবং জ্বরজ্বর লাগবে, সারারাত্রি এইভাবটা থাকবে, ভোরবেলার দিকে ঘাম দেবে এবং পরদিন সকালে উদ্ভেদ (Itch vesicle) দেখা দেবে। কাজেই দেখা গেল সোরা রোগ সংক্রমিত হতে কিছু সময় লাগে- স্পর্শমাত্রই সংক্রমিত হয় না। তা ছাড়া মন আক্রান্ত হয়ে বা শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে হাওয়া থেকে এই রোগ দেহে প্রবেশ করে না।

উদ্ভেদ দেখা দেওয়াকে সোরার প্রাথমিক পর্যায় বলা যায়। এই উদ্ভেদগুলিতে প্রচন্ড চুলকানি দেখা দেয়। চুলকাবার পর আক্রান্ত স্থানে খুব জ্বালা অনুভূত হয়। যদি এই উদ্ভেদ উপযুক্ত এন্টি-সোরিক ঔষধ দিয়ে আরোগ্য করা না হয়- এবং অসদৃশ চিকিৎসায় দূর করা হয় তবে স্থানীয় লক্ষণ চাপা পড়ে ভেতরে সুপ্ত অবস্থায় থাকবে, একে সোরার সুপ্ত-দশা বলে। সাধারণতঃ আক্রান্ত স্থানে কোন মলম বা প্রলেপ লাগাবার ফলেই এই ধরণের চাপা পড়া অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোন ঔষধ প্রয়োগ ছাড়াও আপনা আপনি এই উদ্ভেদ মিলিয়ে যেতে পারে। সিফিলিস বা সাইকোসিসের প্রাথমিক লক্ষণ সোরার মত কখনও আপনা আপনি চাপা পড়ে না। যাই হোক ভবিষ্যতে মানসিক শোক, দুঃখ, আঘাত বা কোন তরুণ রোগের আক্রমণ বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এই সুপ্ত সোরাকে প্রকাশ্য করে তোলে। এই প্রকাশ্য রূপ বহু রকমের হতে পারে। কোন রোগীতে কি ধরণের রূপ নেবে তা নির্ভর করে রোগীর জন্মগত রোগপ্রবণতা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, জন্মের পর থেকে যে সব রোগ হয়েছে এবং তার

যা চিকিৎসা হয়েছে তার উপর, সাময়িক উপশম প্রদানকারী ঔষধ এবং চাপা দেওয়া চিকিৎসার ফল ইত্যাদির উপর। তাই আমরা নাম জানা না জানা শত শত পুরাতন রোগ দেখতে পাই। সিফিলিস এবং সাইকোসিস জনিত রোগ ছাড়া আর সব পুরাতন (চির-রোগ) রোগই সোরা থেকে সৃষ্ট। প্যাথলজি অনুসারে যে নামকরণই আমরা করি না কেন এন্টি-সোরিক ঔষধ প্রয়োগ না করলে এই রোগাবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। জন্মগত যে সোরিক ডিসক্রেসিয়া (Psoric dyscroasia) নিয়ে আমরা জন্মাই তাও এই সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরে উপযুক্ত পরিবেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। তাই শৈশবে সুপ্ত সোরার লক্ষণ নিয়ে কোনো শিশুর ধাতগত চিকিৎসা করলে ভবিষ্যতে তার টিউবারকিউলোসিস, ক্যানসার, ডায়াবেটিস ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ,এইসব রোগের, মুল কারণ যে সোরা সেই সোরাজনিত প্রবণতা থেকে সে মুক্ত হয়। অবশ্য পুনরায় সোরায় আক্রান্ত হওয়া এবং সোরার প্রকাশ ঘটার উপযুক্ত পরিবেশ পুনরায় সৃষ্টি হওয়া খুবই সম্ভব। তবুও জন্মগত অস্বাভাবিক প্রবণতা কমিয়ে দিতে পারলে বা আরোগ্য করতে পারলে অনেক দুরারোগ্য রোগের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

সামান্য উদ্ভেদের স্পর্শ থেকে যে রোগের সৃষ্টি, বর্তমান যুগে সেই রোগ থেকে মুক্ত থাকা প্রায় অসম্ভব। কারণ, ঘরের বাইরে গেলেই, এমনকি ঘরের মধ্যেই একজন আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে এই রোগ যে কোন সময়ে অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই হ্যানিম্যান বলেছেন, সোরামুক্ত লোক পৃথিবীতে বিরল বা নেই বললেই চলে। তা হলে মনে হতে পারে চিকিৎসা করে কি লাভ? আবার তো যে কোন সময় হতে পারে। তা ঠিক। কিন্তু যত দীর্ঘদিন সোরা শরীর-অভ্যন্তরে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে ততই আক্রমণের ধারা তীব্র হবে এবং নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হবে। যত তাকে শরীর অভ্যন্তর থেকে বাইরে আনা যাবে ততই তার ধ্বংস করার ক্ষমতা হ্রাস পাবে। তাই আমরা দেখতে পাই দ্বিতীয় দশায় সোরার জন্য কোন রোগী যখন চিকিৎসা করাতে আসে, তখন সঠিক ঔষধ নির্বাচন হলে তার পূর্বের চাপা পড়া উদ্ভেদ দেখা দেবেই- তা সে যতদিনের পুরাতন হোক না কেন। সেই উদ্ভেদ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত বর্তমান রোগের হাত থেকে তার মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। অবশ্য উপশমের কথা আলাদা। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকেও যে কোন উপায়ে কিছু উপশম দেওয়া যেতে পারে। ব্রঙ্কিয়াল হাঁপানির

(Bronchial Asthma) রোগী, যার উদ্ভেদ চাপা পড়ার ইতিহাস আছে, তাকে কি উদ্ভেদ পুনরায় প্রকাশ না পেলে আরোগ্য করা সম্ভব? অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় একটা রোগীতেও তা ঘটতে দেখি নি।

এবারে সোরার বিভিন্ন অবস্থার লক্ষণ-সমূহ আলোচনা করা যাক, যাতে সোরাকে চিনতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয়।

সুপ্ত সোরার কয়েকটি লক্ষণঃ

(Symptoms of Latent Psora)

(১) মানসিক দিক-থেকে খুবই সচেতন, ভয়, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাগ্রস্ত এবং অল্পেতেই রেগে যায়।

(২) অল্পেতে এবং সহজে দৈহিক ও মানসিক অবসাদ।

(৩) হাত ও পায়ের তলায় জ্বালা ও ঘাম।

(৪) ঘুমের মধ্যে পেশীসমূহ লাফান।

(৫) শীতকাতরতা ও অল্পেতেই ঠান্ডা লাগা।

(৬) ঠান্ডা অপছন্দ এবং ভিতরে ও বাইরে গরম পছন্দ করা।

(৭) মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্ত পড়া।

(৮) ঘুমের মাঝে দাঁত কাটা এবং মলের সঙ্গে বড় কৃমি (Round worms) বের হওয়া।

(৯) ঠোঁট, নাসারন্ধ্র এবং শরীরের বহির্গমনের ছিদ্রপথগুলির লালবর্ণ ধারণ করা।

(১০) মিষ্টি, টক, ভাজা এবং চর্বি-জাতীয় খাদ্য পছন্দ।

(১১) ঘুমের মাঝে অস্থিরতা।

(১২) স্নানে অনিচ্ছা এবং অপরিস্কার ও নোংরা থাকার ইচ্ছা।

(১৩) সারাদিন ও রাত্রি শুয়ে থাকার ইচ্ছা এবং তাতে ভাল অনুভব করা।

(১৪) প্রচন্ড ক্ষুধা, বিশেষ করে সকালে।

(১৫) স্বাভাবিক স্রাব নির্গত হলে আরাম পাওয়া-যথা ঘাম, প্রস্রাব, মাসিকের রক্তস্রাব ইত্যাদি।

(১৬) ঘুমাবার সময় মাথায় ঘাম হওয়া।

(১৭) মাঝে মাঝে চোখ, মুখ, নাক গরম হওয়া।

(১৮) হামেশায় গলায় কফ জমা হওয়া।

এছাড়া আরও কিছু লক্ষণ আছে, তবে এই লক্ষণগুলি জানা থাকলে সুপ্ত সোরা চিনতে কোন অসুবিধা হবে না।

সোরার প্রকাশ্য (দ্বিতীয় দশার) বিশেষ লক্ষণাবলী ঃ (Secondary symptoms of Psora)

(১) মাথাঘোরা- চলাফেরায় বৃদ্ধি।

(২) দীর্ঘদিনের পুরাতন মাথার যন্ত্রণা- যথা মাইগ্রেন

(৩) মাথার খুসকি ও মরামাস।

(৪) কান দিয়ে পুঁজ পড়া (Otorrhoea)

(৫) কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করা।

(৬) নাক দিয়ে রক্ত পড়া এবং নাকের পলিপাস হওয়া।

(৭) সর্বপ্রকার চর্মরোগ।

(৮) গলায় গ্রন্থি বৃদ্ধি হওয়া এবং গলা ব্যথা।

(৯) অসহ্য দাঁতের যন্ত্রণা।

(১০) অম্ল ও ডিসপেপসিয়ার যাবতীয় লক্ষণ।

(১১) বমনেচ্ছা, বমি এবং হিক্কা।

(১২) পাকস্থলী এবং যকৃতে যন্ত্রণা।

(১৩) অর্শ, মলদ্বারে ফিসচুলা এবং রেকটাল পলিপ।

(১৪) মধুমেহ (ডায়াবেটিস মেলিটাস)।

(১৫) বিছানায় প্রস্রাব করা।

(১৬) স্বপ্নদোষ, সহজে বীর্যস্খলন ও ধ্বজভঙ্গ, পায়খানা বা প্রস্রাব করার সময় প্রস্টেটিক তরল (Fluid) নির্গত হওয়া ইত্যাদি।

(১৭) সব রকমের ঋতুস্রাব সংক্রান্ত- অস্বাভাবিকতা এবং বন্ধ্যাত্ব।

(১৮) যোনিদ্বার বা জরায়ুর মধ্যে পলিপ।

(১৯) শ্বেতপ্রদর।

(২০) যে কোনো রকম স্বপ্নভঙ্গ।

(২১) ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা।

(২২) বিভিন্ন ধরণের বাতরোগ, অস্থিস্ফিতি, হাড় বাঁকিয়া যাওয়া।

(২৩) নিম্নাঙ্গে ভেরিকোজ ভেন (Varicose vein)।

(২৪) উরু, গোড়ালি এবং পায়ে ক্ষত।

(২৫) হিউমেরাস,ফিমার, প্যাটেলা, আঙ্গুলের হাড় ইত্যাদি পচনক্রিয়া (Suppuration and necrosis)

(২৬) মুখে, বাহুতে এবং হাতে আঁচিল (warts)।

(২৭) বিভিন্ন প্রকার টিউমার (Encysted)

(২৮) যাবতীয় মনোরোগ।

(২৯) ক্যানসার, সারকোমা ইত্যাদি।

(৩০) টিউবারকিউলোসিস ও কুষ্ঠ।

(৩১) মৃগী।

(৩২) এরিসিপেলাস,আঙ্গুল হাড়া ইত্যাদি।

এই ধরণের অসংখ্য রোগলক্ষণ বা রোগাবস্থা সোরার প্রকাশ্য বা দ্বিতীয় দশার লক্ষণের মধ্যে পড়ে। সিফিলিস ও সাইকোসিস জনিত অবস্থা ছাড়া আর সব পুরাতন রোগই সোরার বিভিন্ন রূপের প্রকাশ মাত্র। কাজেই তাদের সবগুলির উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। সোরা যে সব রকম পুরাতন ব্যাধি ঘটাতে পারে এটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে। শুধু সোরাকে চিনতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে- মনগড়া কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে কিছুই লাভ হবে না।

সোরার চিকিৎসা

প্রাথমিক, সুপ্ত অথবা প্রকাশ্য যে অবস্থারই হোক, রোগীর অতীত,বংশগত এবং ব্যক্তিগত ইতিহাস-সহলক্ষণ- সমষ্টির সামগ্রিক চিত্র

নিয়ে এমন ঔষধ নির্বাচন করতে হবে, যা এন্টিসোরিক এবং রোগীর ধাতুগত পরিবর্তন আনতে পারে। স্থানীয় লক্ষণ মিলল অথচ ধাতুগত লক্ষণ নেওয়া হ'লো না- এমন যদি হয়, তবে শুধু রোগীর কষ্ট সমূহের সাময়িক উপশম ঘটবে- কিন্তু আরোগ্য হবে না। ফলে বার বার ঘুরে ঘুরে কষ্ট ফিরে আসবে- অথবা একরোগ থেকে অন্য রোগ দেখা দেবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শুধু লক্ষণ মেলালেই হবে না- সোরার চরিত্রগত লক্ষণও সেই ঔষধে মেলা চাই। অন্যথায় আরোগ্য হবে না। হ্যানিম্যান নিজে বারো বৎসর চিকিৎসার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন- শুধু লক্ষণ মিলিয়ে ঔষধ দিলে রোগীর সব কষ্ট চলে যাচ্ছে বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার তা দেখা দিচ্ছে। এই কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিনি সব রোগীর অতীত ইতিহাস পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করতে থাকলেন এবং দীর্ঘ বারো বৎসর পর এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, সব পুরাতন রোগের মূল কারণ হলো তিনটি- সোরা, সিফিলিস এবং সাইকোসিস। এই তিনটি অবস্থা হলো সোরিক, সিফিলিটিক ও সাইকোটিক মায়াজমের স্থায়ী চিহ্নজণিত অবস্থা। ঔষধ যদি এই অবস্থাগুলি থেকে সৃষ্ট অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি দূর করতে না পারে তবে সম্পূর্ণ আরোগ্য অসম্ভব। তাই তিনি যে সব এন্টি-সোরিক ঔষধ সোরাজণিত অবস্থার লক্ষণ তৈরী করতে পারে তাদের একটা তালিকা দিয়ে গেছেন। সেই তালিকা থেকে এন্টি-সোরিক ঔষধ লক্ষণ অনুসারে কয়েকটি প্রয়োগ করলে তবেই আরোগ্য সম্ভব।

এই ধরণের এন্টি-সোরিক ঔষধ প্রকাশ্য বা দ্বিতীয় দশার সোরাতে প্রয়োগ করার পর রোগীর পূর্বে চাপা পড়া কোন লক্ষণ থাকলে তা ফিরে আসবে যার জন্য রোগী খুব কষ্ট পেতে পারে। যেমন হাঁপানী আরোগ্য করতে যেয়ে চর্মরোগের পুনরাবির্ভাব এবং তজ্জনিত অশেষ কষ্ট। এ অবস্থায় সাধারণতঃ নতুন কোন ঔষধের দরকার হবে না। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলে কিছুদিন পর পূর্বের চাপা পড়া লক্ষণ আপনা আপনিই চলে যাবে। কারণ যে ঔষধ দীর্ঘদিন পরে তাকে ভেতর থেকে বাইরে আসতে সাহায্য করেছে, সেই ঔষধ নিশ্চয়ই তাকে আরোগ্য করতে পারবে। কিন্তু পূর্বের চাপা পড়া লক্ষণ দেখা দিয়ে যদি দীর্ঘদিন থাকে এবং রোগীর আভ্যন্তরীণ লক্ষণগুলি ক্রমশঃ দূরীভূত হয়, তবে পূর্বের প্রয়োগ করা ঔষধ পুনরায় অপেক্ষাকৃত উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

অবশ্য চাপা দেওয়া লক্ষণ বাইরে প্রকাশ পাবার পরও যদি রোগী সামগ্রিকভাবে ভাল অনুভব না করে তবে পুনরায় ঔষধ প্রয়োগের পর প্রকাশ পাওয়া সব লক্ষণ সহ (accessory symptoms) নতুন করে রোগীলিপি তৈরী করে নতুন ঔষধ নির্বাচন করতে হবে। প্রয়োজন হলে এরকম বেশ কয়েকবার করতে হতে পারে। তবেই আরোগ্য হবে।

এই ধরণের চিকিৎসা চলাকালীন যদি রোগীর কোন তরুণ রোগ দেখা দেয় তবে এন্টি-সোরিক চিকিৎসা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে তরুণ রোগের জন্য সাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন (মায়াজমেটিক নয় এমন) ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। তরুণ রোগ আরোগ্য হলে পুনরায় লক্ষণ সংগ্রহ করে পূর্বের ঔষধ বা নতুন কোন এন্টি মায়াজমেটিক ঔষধ দিতে হবে।

সোরার সঙ্গে যদি সিফিলিস বা সাইকোসিসের সংমিশ্রণ থাকে তবে, চিকিৎসা পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত জটিল হবে। প্রথমে যে অবস্থার লক্ষণ প্রকট থাকবে তার উপর ভিত্তি ক'রে সেই মায়াজমেটিক অবস্থার ঔষধ দিতে হবে। সেটা প্রশমিত হ'লে এন্টি-সোরিক ঔষধ দিতে হবে। পূর্বের মায়াজমেটিক অবস্থার লক্ষণ যদি তখনও বর্তমান থাকে তবে পুনরায় তারজন্য ঔষধ দিতে হবে। এইভাবে কয়েকবার পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন মায়াজমেটিক অবস্থার ঔষধ প্রয়োগ করলে তবেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হবে। তবে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করার আগে এন্টি-সোরিক ঔষধ দিয়েই শেষ করতে হবে। কারণ শেষ পর্যন্ত থাকে সোরা। যেমন কেউ সিফিলিস এর জন্য চিকিৎসা করতে এলো। এখন তার সিফিলিটিক মায়াজম-এর লক্ষণ প্রকট যথা জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত, অত্যাধিক ঘাম এবং তার ফলে কষ্টের বৃদ্ধি, রাত্রে সব কষ্টের বৃদ্ধি ইত্যাদি। নিৎসন্দেহে তাকে বর্তমানে এন্টি-সিফিলিটিক ঔষধ দিতে হবে। ধরা যাক, তাকে মার্কসল দেওয়া হলো। তার ক্ষত অনেকটা কমে গেল, অন্যান্য কষ্টের উপশম হলো। কিন্তু হঠাৎ তার সুপ্ত সোরা প্রকট হলো। হাত পায়ে খুব জ্বালা দেখা দিল, সর্বশরীরে খুব চুলকানী দেখা দিল, সকাল-বেলায় পেট খালিবোধ ও তৎসহ প্রচন্ড ক্ষুধা দেখা দিল। মানসিক ও দৈহিক অস্থিরতা দেখা দিল ইত্যাদি।এ অবস্থায় নিশ্চয়ই তাকে এন্টি-সোরিক ঔষধ যথা সালফার দিতে হবে। সালফার প্রয়োগে এই সব লক্ষণ কমে যাবে এবং পুনরায় রোগীর

সিফিলিটিক লক্ষণ প্রকট হবে। তখন পুনরায় মার্কসল বা অন্য কোন এন্টি-সিফিলিটিক লক্ষণ প্রকট হবে। তখন পুনরায় মার্কসল বা অন্য কোন এন্টি-সিফিলিটিক ঔষধ দিতে হবে। এইভাবে এন্টি-সিফিলিটিক ও এন্টি-সোরিক অথবা এন্টি- সাইকোটিক এবং এন্টি-সোরিক ঔষধ দিতে দিতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবে। এইরূপ চিকিৎসাক্রম চলার শেষের দিকে সোরা পুনরায় সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফলে রোগী মনে করে সে আরোগ্য লাভ ক'রেছে এবং চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দেয়। ফলে পুনরায় সোরার লক্ষণগুলি উপযুক্ত পরিবেশে যথাসময়ে প্রকাশ পায়। ফলে অনেক চিকিৎসক বন্ধুও মনে করতে পারেন, স্থায়ী আরোগ্য একটা কথার কথা মাত্র, বাস্তবক্ষেত্রে কখনই তা সম্ভব নয়। তাছাড়া একবার একটি রোগ থেকে মুক্ত হলে পুনরায় সেই রোগ নতুন করে হতে বাধা কোথায়? সিফিলিস একবার আরোগ্য হওয়ার পরও রোগী যদি পুনরায় খারাপ পথে যায় এবং দুষিত যৌন সংসর্গ ঘটে তবে কি তার আর সিফিলিস হতে পারে না? নিশ্চই পারে এবং তাইই হয়ে থাকে। রোগের উত্তেজক এবং বাহক কারণগুলি বর্তমান থাকলে রোগের পুনরাক্রমনের সম্ভাবনা অবশ্যই থাকবে। রাত্রি জাগরণের ফলে নিদ্রাহীনতা দেখা দিলে নাক্সভমিকা খেলে সুনিদ্রা হবে ঠিকই। কিন্তু রাত্রি জাগরণ অব্যাহত থাকলে বার বার অনিদ্রা দেখা দিতে বাধ্য।

এবারে দেখা যাক সোরা সিফিলিস ও সাইকোসিস সবগুলি যদি একই রোগীতে বর্তমান থাকে তবে কিভাবে তার চিকিৎসা ক'রতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে এন্টি-সোরিক ঔষধ দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে সিফিলিস ও সাইকোসিসের মধ্যে যেটা প্রকট থাকবে তার ঔষধ দিতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ে পুনরায় এন্টি-সোরিক এবং চতুর্থ পর্যায়ে সিফিলিস ও সাইকোসিসের মধ্যে যেটা অবশিষ্ট থাকবে তার ঔষধ দিতে হবে। পঞ্চম পর্যায়ে পুনরায় এন্টি-সোরিক দিতে হবে। এইভাবে কয়েকবার পর্যায়ক্রমে এন্টি- মায়াজমেটিক চিকিৎসা চালালে তবেই সম্পূর্ণ আরোগ্য সম্ভব।

সিফিলিস
(Syphilis)

দূষিত যৌন সংসর্গ (Contaminated Sexual intercourse) থেকেই এই রোগের সংক্রমণ ঘটে। যৌন সংসর্গের কয়েকদিন পরে (২১ দিন পর্যন্ত) প্রথমে জননেন্দ্রিয়ে এক প্রকার ক্ষত দেখা দেয়। সেই ক্ষতে কোন জ্বালা বা যন্ত্রণা থাকে না। বোতামের আকারের ছোট গোলাকার ক্ষতের উপরে সাদা বা ধূসর বর্ণের প্রলেপ দেখা যায়। কোন জ্বালা বা যন্ত্রণা না থাকায় প্রায়ই রোগী এর জন্য কোন চিকিৎসার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। তাছাড়া এইসব অসুখে আমাদের দেশের রোগীরা অর্থহীন লজ্জাবশতঃ চিকিৎসক বা অন্য কারও কাছে কিছু প্রকাশ করেন না। নিজেই কোন চর্মরোগের মলম ইত্যাদি ব্যবহার করে ওই ক্ষতকে ভাল করার চেষ্টা করেন। কয়েকদিনের মধ্যে ক্ষত মিলিয়ে যায় এবং রোগীও মনে করেন ওটা কিছুই নয়- হয়ত বা কোন চর্মরোগ হয়েছিল। তবে মলম, প্রলেপ ইত্যাদি যা হোক একটা কিছু বাহ্যিক প্রয়োগ না করলে এই ক্ষত কখনও আপনা আপনি মিলিয়ে যায় না। এটি হ'ল প্রাথমিক ক্ষত (Primary Chancre) যাকে সিফিলিস- এর প্রাথমিক স্ত র বা অবস্থা (Primary Stage) বলে। এই পর্যায়ে রোগীকে উপযুক্ত অ্যান্টি-সিফিলিটিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য করা খুবই সহজ। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য সম্ভব হয়। কিন্তু রোগ আরোগ্য না হয়ে যদি অন্য কোন উপায়ে ক্ষতকে অবদমিত (Suppressed) করা হয় তবে সিফিলিসের সুপ্ত অবস্থার (Latent Stage) সৃষ্টি হবে। এই সুপ্ত অবস্থা সোরার মত উপযুক্ত পরিবেশের প্রভাবে দ্বিতীয় দশার (Secondary stage) লক্ষণ হিসাবে প্রকাশ পাবে। সার্জারী বইতে সিফিলিসের তিনটি দশার উল্লেখ আছে- প্রাথমিক দশা, তৎপরবর্তী দ্বিতীয় দশা (Secondary Stage) এবং সর্বশেষ তৃতীয় দশা (Tertiary stage)। কিন্তু হোমিওদর্শন মতে তৃতীয় বা শেষ দশার লক্ষণগুলিও দ্বিতীয় দশার অন্তর্গত। সিফিলিস যে স্তরে স্নায়ুও

বা অস্থিকে আক্রমণ করে তাকেই তৃতীয় দশা (Tertiary Stage) বলে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতাদর্শে প্রাথমিক ক্ষত চাপা পড়ার পরেই দেহের যাবতীয় কোষ (স্নায়ু ও অস্থি সহ) সিফিলিটিক হয়ে পড়ে ঠিক যেমন হয়'সোরার ক্ষেত্রেও। কাজেই পৃথক কোন তৃতীয় দশার কথা চিন্তা করার কোনই প্রয়োজন নেই।

অবশ্য সোরাজনিত অতিপ্রবণতা না থাকলে দুষিত যৌন সংসর্গ ঘটলেও সিফিলিস হবে না। কাজেই সিফিলিস হতে গেলে সোরাজনিত প্রবণতা এবং সিফিলিটিক মায়াজম দুইই থাকা দরকার। সিফিলিটিক মায়জম এখানে মূল তথ্য উত্তেজক কারণ এবং সোরাজনিত প্রবণতা হলো তার ভিত্তিস্বরূপ।

জন্মগত সিফিলিসে প্রাথমিক ক্ষতের দশা দেখা দেবে না। কারণ পিতামার দেহ থেকে যে দশায় সিফিলিস (সাইকোসিসও) পুত্রকন্যার মধ্যে সংক্রমিত হয়, পুত্রকন্যারা সেই দশার লক্ষণই প্রকাশ করে। তবে জন্মগত সিফিলিসের কতকগুলি সাধারণ চিহ্ন বা লক্ষণ দেখা যায়। হোমিওপ্যাথিতে জন্মগত সিফিলিসের লক্ষণ এবং সুপ্ত (Latent) সিফিলিসের লক্ষণ একত্রীভুত করা হয়েছে- সুপ্ত সিফিলিসের লক্ষণাবলীর মধ্যে। কাজেই সিফিলিসের লক্ষণগুলিই এবার আলোচনা করা যাক যাতে করে একে চিনতে কোনই অসুবিধা না হয়।

সিফিলিসের প্রাথমিক দশা (Primary Stage of Syphillis)ঃ

আগেই বলা হয়েছে সিফিলিসের প্রাথমিক লক্ষণ হলো জননেন্দ্রিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি। এটাই সিফিলিসের বৈশিষ্ট্য। আমরা জানি যে সাধারণতঃ প্রদাহজনিত অবস্থা বেশ কিছু দিন চলার পরই ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সিফিলিসে প্রদাহ জনিত কোন লক্ষণ দেখা না দিয়ে হঠাৎই ক্ষত সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর থেকে বোঝা যায় এই রোগে প্রথম থেকেই দেহ-কোষ ধ্বংস করার একটা প্রবণতা বর্তমান থাকে। শুরুতে প্রদাহ অবশ্যই সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমরা বাইরে প্রথমেই একটা ক্ষত অর্থাৎ দেহকলার বিনাশ। Tissue destruction) লক্ষ্য করি। জন্মগত সিফিলিটিক অবস্থার লক্ষণেও তাই আমরা চিড়খাওয়া তালু (Cleft palate) অস্থির ভেদন

(Perforation of bones), বিকলাঙ্গতা, অন্ধত্ব, বধিরত্ব, মূকত্ব, পক্ষাঘাত ইত্যাদি অবস্থা প্রথম থেকেই দেখতে পাই। সোরার মত দীর্ঘদিন সুপ্ত অবস্থায় থেকে তারপর দ্বিতীয় দশার লক্ষণ সিফিলিসে তৈরী নাও হ'তে পারে। কারণ আগেই বলা হ'য়েছে সিফিলিস ও সাইকোসিস যে অবস্থায় রোগীর মধ্যে থাকে ঠিক সেই অবস্থায় অন্যের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। অনেক পুরাতন রোগেও তেমনি পূর্বের কোন লক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ ক্ষতের সৃষ্টি ও দেহকলার বিনাশ লক্ষ্য করা যায়। এসব রোগের পেছনে সিফিলিটিক মায়াজম-জনিত অবস্থা বিদ্যমান আছে বুঝতে হবে। যেমন সুপ্ত (Latent) ডিওডিন্যাল আলসার। সাধারণতঃ ডিওডিন্যাল আলসারে পেটের যন্ত্রণা, অম্লাধিক্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। দীর্ঘদিন এমনি চলতে থাকলে কালো আলকাতরার মত রক্তসহ মল(মোলনা) অথবা রক্তবমন (হিমাটেমেসিস) দেখা দেয়। কিন্তু সুপ্ত আলসারে প্রথম লক্ষণই হ'ল হিমাটেমেসিস, মেলিনা অথবা পারফোরেশন। এই ধরণের সুপ্ত ডিওডিন্যাল আলসার সিফিলিটিক মায়াজমজনিত বলে বুঝতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখলে সিফিলিস চিনতে কোন অসুবিধা হবে না। সব সময় মনে রাখতে হবে ক্ষত বা দেহকলার বিন্যাশ মানেই সিফিলিস নয়। যদি কোন রোগের প্রথম থেকেই ক্ষত সৃষ্টি বা দেহকোষ ও কলার বিনাশ হ'তে থাকে তবেই তা সিফিলিটিক ব'লে গণ্য করা যেতে পারে- অবশ্য যদি সিফিলিসের অন্যান্য ধাতুগত লক্ষণগুলি কিছু কিছু বর্তমান থাকে।

প্রাথমিক অবস্থায় আর একটা লক্ষণ দেখা যায়- বিউবো (Bubo) সৃষ্টি প্রাথমিক ক্ষতসহ বা ক্ষতহীন অবস্থায় এই বিউবো থাকতে পারে। কিন্তু ক্ষত বা বিউবো কোনোটাই যদি না থাকে তবে সিফিলিস শরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং কিছুদিন সুপ্ত (Latent) অবস্থায় থাকে। পরে উপযুক্ত পরিবেশে যথাসময়ে তার দ্বিতীয় দশার লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। সুপ্ত অবস্থায় থাকার সময় কোন সোরিক রোগ দেখা দিলে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবনীশক্তি হ্রাস পেলে সুপ্ত সিফিলিস জাগ্রত হয় এবং দ্বিতীয় দশার লক্ষণ প্রকাশ করে। এ সময়ে কেবলমাত্র সিফিলিটিক লক্ষণ পরিস্কারভাবে পাওয়া যায় না- সিফিলিস ও সোরার মিলিত লক্ষণই প্রকাশ

পায় যদিও দুটির মধ্যে একটির প্রাধ্যান্য অবশ্যই বর্তমান থাকে। সুপ্ত অবস্থায় থাকাকালীন রোগী সাইকোসিস রোগেও আক্রান্ত হ'তে পারে অথবা সাইকোসিস পূর্বেই অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকতে পারে এবং উপযুক্ত পরিবেশে যথাসময়ে সিফিলিসের সঙ্গে একযোগে মিলিত লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে। কাজেই সোরা- সিফিলিস, সাইকো-সিফিলিস অথবা সোরা- সাইকো-সিফিলিস অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। যত দীর্ঘদিন তা সুচিকিৎসাহীন অবস্থায় শরীর অভ্যন্তরে থাকবে ততই জটিল (Complicated) থেকে জটিলতর (Complex) রূপ ধারণ করবে।

সিফিলিস যতদিন একা থাকে ততদিন তাকে চিকিৎসা করে আরোগ্য করা অপেক্ষাকৃত সহজ। হ্যানিম্যান বলেছেন চির-রোগের মধ্যে সিফিলিসই সবচেয়ে সহজে আরোগ্য করা যায়। কিন্তু সোরা বা সাইকোসিসের সঙ্গে মিলে জটিল হয়ে উঠলে আরোগ্য করা খুবই কষ্টকর এমনকি অসম্ভবও হয়ে উঠতে পারে।

এবারে বিভিন্ন পর্যায়ের সিফিলিস চেনবার লক্ষণগুলি আলোচনা করা যাক।

সুপ্ত সিফিলিসের (Latent Syphilis) কয়েকটি লক্ষণঃ

১। সব সময় বিষন্ন ও মনমরা ভাব।

২। দুর্বল বোধশক্তি ও সন্দিগ্ধ মনোভাব।

৩। চাপা স্বভাবের; সবকিছু লুকোবার চেষ্টা ও ইচ্ছা। এমনকি নিজের কষ্টও প্রকাশ করতে চায় না।

৪। কোন বিশেষ বিষয়ে বদ্ধমূল ধারণার অধীন।

৫। সঙ্গী পছন্দ করে না- একাকী থাকতে চায়।

৬। আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছা। সব সময় সুযোগ খোঁজে কিভাবে আত্মহত্যা করবে। জীবনে চরম বিতৃষ্ণা।

৭। স্মরণশক্তি ও ধারণশক্তি মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। বিশেষ ক'রে অঙ্ক বা হিসাব করতে খুবই অসুবিধা বোধ করে।

৮। রাত্রে সব কিছুর বৃদ্ধি। তাই রোগী সুর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করে অধীর আগ্রহে।

৯। শ্বেত প্রদর বা অন্য কোন অস্বাভাবিক স্রাব নির্গত হলে আরাম বোধ করা কিন্তু স্বাভাবিক নির্গমনে (Discharge) যেমন ঘামে বৃদ্ধি।

১০। সব কষ্টের গরমে বৃদ্ধি ও ঠান্ডায় উপশম।

১১। গোছা গোছা চুল উঠে যাওয়া।

১২। হলুদমামড়ি-যুক্ত খুসকি।

১৩। শরীরের তুলনায় কান ও মাথার বৃহৎ আকৃতি।

১৪। টক, মিষ্টি, খড়ি, চুন, পেনসিল ওমদ খাওয়ার অদমনীয় ইচ্ছা।

১৫। মাংসে প্রবল অনিচ্ছা।

১৬। অর্ধ চন্দ্রাকার দাঁত (Incisor) ও চ্যাপ্টা নাক।

১৭। কাগজের মত পাতলা নখ-দেখতে অনেকটা চামচের মত।

১৮। মুখে খুব শক্ত ব্রণ হওয়া।

১৯। ঘ্রাণশক্তির স্বল্পতা বা হীনতা।

২০। ঘুমের মাঝে মাথা এধার থেকে ওধারে আন্দোলিত করা।

সিফিলিসের দ্বিতীয়দশার বিশেষ লক্ষণাবলীঃ

১। সিফিলিটিক ক্ষত।

২। সিফিলিটিক উদ্ভেদ।

৩। যকৃতের অবক্ষয় (Degeneration of liver)।

৪। শুক্রকীট-হীনতা।

৫। বিভিন্নরকম বিকলাঙ্গতা এবং অনেক দেহ-যন্ত্র (Organ) শুকিয়ে যাওয়া।

৬। মারাত্মক অপরাধপ্রবণ পাগলামি ও মানিসক ভারসাম্য-হীনতা।

৭। মাথার পশ্চাদভাগে (Occiput) যন্ত্রণা।

৮। সব কষ্টের রাত্রে বৃদ্ধি।

৯। পায়ের বা শরীরের অন্যান্য হাড়ের যন্ত্রণা; রাত্রে এবং গরমে বৃদ্ধি, ঠান্ডায় উপশম।

১০। খুসকি ও চুল পড়ে যাওয়া।

১১। চোখে ছানি পড়া বা অচ্ছোদপটল-এ ক্ষত হওয়া।

১২। নাকের বা অন্যান্য স্থানের হাড়ের পচন।

১৩। পচা ঘা (Gangrene) ।

১৪। টেবিস ডরসালিস ও জি.পি.আই. রোগ।

১৫। পুনঃ পুনঃ গর্ভপাত, মৃত সন্তানের জন্মদান।

১৬। রক্তের উচ্চ-চাপ।

১৭। টিউবারকিউলোসিস।

১৮। ক্যানসার।

১৯। পারনিসাস অ্যানিমিয়া।

২০। দেহে নালীবিশেষের কুঞ্চন (Stricture), সাইনাস, ফিস্চুলা বা কোন প্রকার ক্ষত এবং দেহকলা ও দেহযন্ত্রের ধ্বংস বা ক্ষয়প্রাপ্তি।

সিফিলিসের চিকিৎসা

সিফিলিস যতক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সোরা বা সাইকোসিসের সাথে (Developed Psora and Sycosis) না মিশছে, ততক্ষণ তাকে একা মনে করতে হবে এবং সেইভাবে তার চিকিৎসা চালাতে হবে। বিভিন্ন দশায় সিফিলিসের চিকিৎসা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করতে হবে।

১। সিফিলিস একাই আছে এবং তার স্থানীয় লক্ষণ যথা প্রাথমিক-ক্ষত বা বিউবো বা উভয়ই বর্তমান আছে। এ অবস্থায় অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ যথা মার্কসল ইত্যাদি প্রয়োগ করলে রোগী আরোগ্য লাভ করবে। অবশ্য যতক্ষণ না ক্ষত বা বিউবো সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায় এবং ক্ষতস্থানের রং স্বাভাবিক হয় ততক্ষণ সুনির্বাচিত অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে।

রোগীর সিফিলিসজনিত লক্ষণ সব দূরীভুত হ'লে রোগীর ধাতুগত লক্ষণ সংগ্রহ ক'রে সুপ্ত সোরার জন্য অ্যান্টিসোরিক ঔষধ দিতে হবে। এই সময়ে অ্যান্টিসোরিক ঔষধ না দিলে শীঘ্রই সুপ্ত সোরা জাগ্রত হওয়ার এবং দ্বিতীয় দশার লক্ষণ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২। ক্ষত বা বিউবো ইত্যাদি স্থানীয় লক্ষণ নেই কিন্তু এখনও সিফিলিস একাই আছে অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সোরা বা সাইকোসিসের সাথে মিশে যায়নি- এই হ'লো দ্বিতীয় অবস্থা। সাধারণতঃ- অসদৃশ চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার দ্বারা স্থানীয় লক্ষণের বিলুপ্তি ঘটলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রেও কেবলমাত্র অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধে রোগী সিফিলিস-মুক্ত হবে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় হল এই যে ক্ষতস্থানের সাদাটে রং এবং খসখসে ভাব যতদিন না স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ স্থান আশেপাশের রঙের ন্যায় স্বাভাবিক রঙ ধারণ করে ততদিন অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে। পরিশেষে অ্যান্টিসোরিক ঔষধ তো অবশ্যই দিতে হবে।

৩। স্থানীয় লক্ষণ থাক আর নাই থাক যদি সিফিলিস ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সোরা একই সময়ে বর্তমান থাকে তবে প্রথমে অ্যান্টিসোরিক ঔষধ দিয়ে সোরার প্রাধান্য কমিয়ে নিয়ে তারপর অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ দিতে হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে অ্যান্টিসোরিক এবং অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ দিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না স্থানীয় লক্ষণ সম্পূর্ণ দূরীভুত হয় অথবা ক্ষতস্থানের বিবর্ণ ভাব চলে যেয়ে স্বাভাবিক রং ফিরে আসে। এ অবস্থায় চিকিৎসা অসমাপ্ত থাকলে সিফিলিস সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে দ্বিতীয় দশার লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

৪। সিফিলিস যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সাইকোসিসের সাথে একযোগে বর্তমান থাকে তবে প্রথমে অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ দিয়ে সাইকোসিসের প্রাধান্য কমিয়ে নিয়ে অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ দিতে হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে অ্যান্টিসাইকোটিক এবং অ্যান্টিসিফিলিটিক চিকিৎসা চালাতে হবে যতক্ষণ না ক্ষতস্থানে স্বাভাবিক রং ফিরে আসে।

৫। সিলিফিস যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সোরা ও সাইকোসিস উভয়ের সঙ্গে একযোগে বর্তমান থাকে তবে প্রথমে অ্যান্টিসোরিক ঔষধ দিতে হবে। তারপর সিফিলিস ও সাইকোসিসের মধ্যে যার প্রাধান্য থাকবে তার ঔষধ দিতে হবে। তারপর তৃতীয়টির ঔষধ দিতে হবে। সবশেষে আবার অ্যান্টিসোরিক ঔষধ দিতে হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে কয়েকবার মায়াজমেটিক ঔষধ পরিবর্তন করলে তবেই আরোগ্য হবে।

স্থানীয় লক্ষণ অবলুপ্তির পর অ্যান্টিসিফিলিটিক চিকিৎসা আরম্ভ করা হলে পূর্বের ক্ষত অবশ্যই ফিরে আসে- পূর্বের অবস্থাতেই হোক বা পরিবর্তিত অবস্থাতেই হোক। এই স্থানীয় লক্ষণ আমাদের চিকিৎসার প্রধান সহায়ক। যতদিন স্থানীয় লক্ষণ বর্তমান থাকবে ততদিন অ্যান্টিসিফিলিটিক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এইভাবে আভ্যন্তরীণ ঔষধ প্রয়োগে বাহ্যিক লক্ষণ দূরীভূত হলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি যে লোকটি সিফিলিস-মুক্ত হলো, কিন্তু সোরা ও সাইকোসিসের সঙ্গে দীর্ঘদিন মিশে থাকলে এই স্থানীয় লক্ষণকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা অনেক সময় খুবই দুরূহ এমনকি অসম্ভব হতে পারে। সেক্ষেত্রে আরোগ্যের আশা করা বৃথা। রোগীর কষ্ট কমবে কিন্তু আরোগ্য বলতে আমরা যা বুঝি তা সম্ভব নাও হতে পারে।

দ্রষ্টব্যঃ- যতদিন অ্যান্টিসিফিলিটিক চিকিৎসা চলবে ততদিন রোগী হালকা, পুষ্টিকর খাদ্য খাবে। কোনো উত্তেজক দ্রব্য খাবে না।

সাইকোসিস্
(Sycosis)

সিফিলিসের মত সাইকোসিসও দূষিত যৌন সংসর্গ থেকে ঘটে অথবা যে কোন পর্যায়ে স্বামী থেকে স্ত্রীর মধ্যে অথবা স্ত্রী থেকে স্বামীর মধ্যে এই রোগ সংক্রমিত হতে পারে। আবার পিতা মাতার থেকে পুত্র কন্যারা জন্মসুত্রেও এই রোগ পেতে পারে।

এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হলো ডুমুরের মত আঁচিল জাতীয় উদ্ভেদ। এই উদ্ভেদ কখনও আপনা থেকে মিলিয়ে যায় না- অস্ত্রোপচার, মলম প্রয়োগ, কষ্টিক বা উত্তাপ দ্বারা দহন (Cauterisation) ইত্যাদি দ্বারা এই উদ্ভেদ বিলুপ্ত করলে এই রোগ দেহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সাধারণতঃ বেশ কিছুকাল সুপ্ত অবস্থায় থাকে, পরে উপযুক্ত পরিবেশে যথাসময়ে এর দ্বিতীয় দশা (Secondary Stage)-এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। সিফিলিসের ন্যায় এই রোগের রোগীও রোগের যে দশায় যখন ভোগে, যৌন সঙ্গীর মধ্যে সেই দশায় রোগ সংক্রমিত করতে পারে। ফলে প্রাথমিক লক্ষণ ছাড়াই কারও মধ্যে এই রোগের দ্বিতীয় দশার অথবা সুপ্ত অবস্থার লক্ষণ দেখা যায়।

ডুমুরাকৃতি আঁচিল ছাড়া এই রোগের আর একটা প্রধান লক্ষণ হলো মুত্রনালী দিয়ে পূঁজ পড়া, যাকে বলা হয় সাইকোটিক গণোরিয়া। সাইকোসিস ছাড়াও মুত্রনালী দিয়ে পুঁজ পড়তে পারে। তাকে বলে অ্যাকিউট গণোরিয়া। সাইকোটিক গণোরিয়ার সঙ্গে এর মূল প্রভেদ হলো- সাইকোটিক গণোরিয়াতে প্রস্রাবের কোন কষ্ট বা জ্বালা, যন্ত্রণা থাকে না। অ্যাকিউট গণোরিয়া কয়েকদিন পরে আপনা থেকেই ভাল হয়ে যেতে পারে এবং এর ফলে কোন ধাতুগত (Constitutional) জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়না। কিন্তু অসদৃশ চিকিৎসার ফলে সুপ্ত সোরা জাগ্রত হলে কিছু কিছু দ্বিতীয় দশার লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যা অ্যান্টি-সোরিক চিকিৎসার ফলে সেরে যাবে। কিন্তু সাইকোটিক গণোরিয়া উপযুক্ত অ্যান্টি-

সাইকোটিক ঔষধ ছাড়া আরোগ্য হয় না। সাইকোটিক মায়াজম দ্বারা প্রথমে সাইকোসিস অবস্থার সৃষ্টি হবে। পরে এই সাকোসিসের জন্য যে গণোরিয়া দেখা দেবে তাকেই সাইকোটিক গণোরিয়া বলে। কাজেই সাইকোটিক মায়াজম বলতে যারা গণোকক্কাস বলেন বা মনে করেন তাঁদের সাথে আমি একমত হতে পারছি না।

সিফিলিসের ন্যায় সাইকোসিসও একা থাকতে পারে অথবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সোরা, সিফিলিস বা উভয়ের সাথে একযোগে বর্তমান থাকতে পারে।

ডাঃ বার্নেট দীর্ঘদিন যাবৎ পর্যবেক্ষণ করে লক্ষ্য করেছেন পুনঃ পুনঃ বসন্তের টিকা নিতে থাকলে শরীরের মধ্যে একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যার সাথে হ্যানিম্যানের সাকোসিসের খুব মিল আছে, তাই বর্তমান যুগে, সাইকোটিক রোগীর সংখ্যা এত বেশী। প্রকৃতপক্ষে, সব পুরাতন রোগের রোগীতে কখনও না কখনও টিকার কুফল অর্থাৎ ভ্যাকসিনোসিস দূরকারী থুজার মত ঔষধ প্রয়োগ না করলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না-এটা আমার মত অনেকেরই বাস্তব অভিজ্ঞতা। সাইকোসিস-এর fig wart (ডুমরাকৃতি আঁচিল) শুষ্ক অথবা নরম স্পঞ্জের মত হতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা থেকে দুর্গন্ধযুক্ত রস নির্গত হতে, এমন কি খুব সহজেই তা থেকে রক্তপাতও হতে পারে।

অর্জিত সাইকোসিসে পুরুষদেহের জননাঙ্গের শঙ্কু-আকৃতি অগ্রভাগ (Glans Penis) অথবা লিঙ্গাবরণী (Prepuce)-র নীচে এবং নারীদেহে যোনিদ্বারের ফালির মত অগ্রভাগ (Vulva) এর উপরে প্রথমে এগুলি দেখা দেয়। এগুলি জোর করে এখান থেকে বিলুপ্ত করলে এরা পূর্বের আক্রান্ত স্থানে পুনরায় দেখা দিতে পারে বা শরীরের যে কোন স্থানে হতে পারে। পুনরায় এই সব স্থান থেকে জোর করে দূর করলে এরা শরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে এবং তারপর দ্বিতীয় দশার লক্ষণ প্রকাশ করে।

এবারে, সাইকোসিসের বিভিন্ন অবস্থার লক্ষণ আলোচনা করা যাক।

সুপ্ত সাইকোসিস্ এর লক্ষণাবলী
(Symptoms of Latent Sycosis)

১। রক্তহীনতা

২। বাত-বেদনার ধাত।

৩। অস্বাভাবিক স্রাব নির্গত হওয়ার ধাত এবং তাতে উপশম। স্রাবের রং সবুজ অথবা সবজে-হলুদ।

৪। যে কোন তরুণ রোগ থেকে খুব ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ।

৫। সন্দিগ্ধ, অস্থিরচিত্র, হিংসুটে এবং নিষ্ঠুর স্বভাবের।

৬। স্মরণশক্তির হ্রাস-ইদানীংকালের ঘটনা ভুলে যায় কিন্তু দীর্ঘদিন আগের ঘটনা ভালই মনে থাকে।

৭। কোন বিশেষ ব্যাপারে বদ্ধমুল ধারণা (Fixed idea) বা বিশ্বাস।

৮। গোলাকার স্থান নিয়ে চুল উঠে যাওয়া এবং গোলাকার টাক পড়া।

৯। আঁচিল ও আঁচিল জাতীয় উদ্ভেদ এবং তিল।

১০। বর্ষাকালে সহজেই রোগাক্রান্ত হওয়া।

১১। নাকটা খুব লাল দেখায়।

১২। মশলা, মদ ও মাংস সহ্য হয় না, বরং কষ্টের বৃদ্ধি ঘটে।

১৩। নখ পুরু ও খাঁজকাটা।

১৪। শ্বেত প্রদরে আঁশটে গন্ধ।

১৫। হেঁটে বেড়ালে বা সামান্য পরিশ্রমে ভালো অনুভব করা ইত্যাদি।

সাইকোসিসের দ্বিতীয় দশার লক্ষণাবলী
(Symptoms of Sycosis in the Second Stage)

১। দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ।

২। ডিম্বাশয় (ovary)-এ পিন্ডাকৃতি গঠন (Cyst)-এর আবির্ভাব।

৩। ডিম্ববাহী নালী (Fallopian Tube) এর প্রদাহ বা একেবারে বন্ধ হ'য়ে যাওয়া যার অবশ্যম্ভাবী ফল বন্ধ্যাত্ত।

৪। রক্তহীনতা।

৫। অপরাধ প্রবণতামূলক পাগলামি এবং আত্মহত্যার ইচ্ছা।

৬। মাথার শীর্ষস্থান (vertex)এ যন্ত্রণা।

৭। শুকনো খুসকি।

৮। মাথার উপর ত্বক ও দাড়িতে গোলাকার স্থান জুড়ে টাক দেখা দেওয়া এবং চুল পড়ে যাওয়া।

৯। যে কোন কলার (Tissue) অত্যাধিক স্ফীতি বা বৃদ্ধি, যথা- টিউমার, আঁচিল, মন্ড (Cyst) ইত্যাদি।

১০। বাত জনিত শক্ত স্ফীতি (Concretions)।

১১। ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হওয়া।

১২। হৃৎপিন্ডের কপাটিকা (valve) গুলির ক্ষয় বা অস্বাভাবিকতা।

১৩। হঠাৎ মৃত্যু সম্ভাবনাপূর্ণ যে কোন রোগ।

১৪। স্থানীয়ভাবে বা সামগ্রিকভাবে শরীরে জলজমাজনিত স্ফীতি (cedema or anasarca)।

১৫। প্রস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত পীড়া।

১৬। অ্যাপেন্ডিসাইটিস।

১৭। দাড়িতে উদ্ভেদ ও তৎসহ চুলকানি (Barber's Itch)।

১৮। অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থানে বা সেলাই স্থলে পুঁজ সৃষ্টি হওয়া বা ফোঁড়া হওয়া।

১৯। গঠনমূলক অস্বাভাবিকতা-যথা ছ'টি আঙুল, টেলিপাস ইত্যাদি।

২০। জননেন্দ্রিয় এবং জনন-যন্ত্র সমুহের যে কোন রোগ।

২১। সমতার অভাব। এই অসাম্য অঙ্গ সমূহের গঠনের ব্যাপারে হতে পারে বা তাদের পরস্পরের কাজের মধ্যে হতে পারে।

আরও অনেক লক্ষণ সাইকোসিস-জনিত অবস্থার দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু গঠনগত অস্বাভাবিকতা, সমতার অভাব এবং অতিবৃদ্ধি-এই তিনটিই হলো সাইকোসিসের মূল কথা। যে কোন রোগে যদি প্রথম থেকে এই তিনটির যে কোন একটা বর্তমান থাকে তবেই তাকে আমরা সাইকোসিস জনিত বলে মনে করতে পারি। একটা রোগ দীর্ঘদিন চলতে চলতে যে অসাম্য বা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তা সাইকোসিস দ্বারা সৃষ্ট নাও হতে পারে। কিন্তু রোগের প্রথম থেকেই যদি ঐ অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তবে তা নিঃসন্দেহে সাইকোসিস-জনিত। আজকাল বেশীর ভাগ পুরাতন রোগীতে থুজার মত কোন অ্যান্টি-সাইকোটিক ঔষধ লাগে বলে সব রোগই সাইকোটিক মনে করার কোন কারণ নেই। অ্যান্টি-সাইকোটিক বা অ্যান্টি-সিফিলিটিক ঔষধ দিয়েও সোরার রোগী আরোগ্য হতে পারে একথা মনে রাখা অবশ্যই দরকার। ঔষধের নাম বা রোগের নাম থেকে সাইকোসিস নির্ধারণ করলে চলবে না। রোগীর লক্ষণ থেকেই বুঝতে হবে এটা সাইকোসিস। সোরা রোগীও দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর যে কোন গঠনগত অস্বাভাবিকতায় ভুগতে পারে। এমনকি টিউমার, আঁচিল (wart) ক্ষত (ulcer) ইত্যাদিও সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু রোগের প্রথম থেকেই বেশী বৃদ্ধি সোরার লক্ষণ নয়- সিফিলিস এর লক্ষণ। তেমনি রোগের প্রথম থেকেই ক্ষত সোরার লক্ষণ নয়- সিফিলিস এর লক্ষণ। এই মূল পার্থক্যটা যদি আমরা মনে রাখি তবে মায়াজমজনিত অবস্থা চিনতে এবং তার প্রতিকারে প্রয়োজনীয় অ্যান্টি মায়াজমেটিক ঔষধ নির্বাচনে কোনই অসুবিধা হবে না।

সাইকোসিসের চিকিৎসা

১) সাইকোসিস যখন একা থাকে অর্থাৎ প্রাথমিক আঁচিল অবস্থায়, তখন সোরা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এ অবস্থায় অ্যান্টি-সাইকোটিক ঔষধ দীর্ঘদিন চালাতে হবে যতদিন না স্থানীয় লক্ষণ সম্পূর্ণ দূরীভুত হয়।

যদি আঁচিল অত্যন্ত বড় আকরের হয় তবে সুনির্বাচিত ঔষধ একযোগে ভেতরে ও বাইরে প্রয়োগ করা যাবে। এটাই হ'লো একমাত্র অবস্থা যেখানে হ্যানিম্যান ঔষধের বাহ্যিক প্রয়োগ অনুমোদন করেছেন। এ ছাড়া আর কোথাও বাহ্যিক ঔষধ দেওয়া নিষিদ্ধ। কারণ বাহ্যিক প্রয়োগের ফলে স্থানীয় লক্ষণ দ্রত্তু চলে যাবে। ফলে রোগ আরোগ্য হলো কি না বোঝা যাবে না। পক্ষান্তরে বাহ্যিক লক্ষণ বর্তমান থাকলে রোগটির কতটুকু অবশিষ্ট আছে এবং কতদিন চিকিৎসা চালাতে হবে সেটা সঠিক বোঝা যাবে। এক্ষেত্রে বাহ্যিক ঔষধ দিলেও কোন অসুবিধা হবে না- কারণ এত বড় আকারের আঁচিল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার অনেক আগেই সাইকোসিস রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হবে। এমনকি আভ্যন্তরীণ সাইকোসিস আরোগ্য হলো অথচ এই ধরণের বিরাট আঁচিলের কিছু কিছু থেকে গেল এটাও সম্ভব। কারণ দীর্ঘদিন থাকার ফলে এবং বিরাট আকারের হওয়ায় এদের পক্ষে সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। এগুলি শরীরের অ-বিপরীতমুখী irreversible) পরিবর্তন। এইভাবে দীর্ঘদিন অ্যান্টি-সাইকোটিক ঔষধ দিয়ে শেষে অ্যান্টি-সোরিক ঔষধ দিতে হবে। নইলে সুপ্ত সোরা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করবে।

২। আঁচিলগুলি অস্ত্রোপচার বা দহনক্রিয়া দ্বারা বিলুপ্ত করলেও সাইকোসিস একাই থাকতে পারে। এ অবস্থাতেও অ্যান্টি-সাইকোটিক ঔষধ দিতে হবে যতদিন না আঁচিলের বা উদ্ভেদ-এর অবস্থানগুলির বিবর্ণ রং স্বাভাবিক আকার ধারণ করে। সবশেষে অবশ্যই অ্যান্টি-সোরিক ঔষধ দিতে হবে।

৩। সাইকোসিস যখন একযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সোরার সঙ্গে অবস্থান করে তখন প্রথমে অ্যান্টি-সোরিক ঔষধ দিতে হবে। পরপর কয়েকটা অ্যান্টি-সোরিক ঔষধ দিলে তবেই জাগ্রত সোরা সুপ্তরূপ ধারণ করবে এবং সাইকোসিস প্রকট হবে। এখন অ্যান্টি-সাইকোটিক ঔষধ দীর্ঘদিন চালিয়ে তাকে সাইকোসিস মুক্ত করতে হবে। তারপর আবার অ্যান্টি-সোরিক ঔষধ দিতে হবে। এভাবে বেশ কয়েকবা্র অ্যান্টি-সোরিক ঔষধের পরে অ্যান্টি-সাইকোটিক ঔষধ, আবার অ্যান্টিসোরিক ঔষধের পরে অ্যান্টি-সাইকোটিক ঔষধ দিতে দিতে তবেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবে।

৪। যদি সাইকোসিস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সোরা ও সুপ্ত সিফিলিস-এর সাথে একযোগে প্রকাশ পায় তবে প্রথমে অ্যান্টি-সোরিক ঔষধ দিয়ে সোরা প্রশমিত হলে অ্যান্টি-সাইকোটিক ঔষধ দিতে হবে। তারপর অ্যান্টি-সিফিলিটিক ঔষধ দিয়ে পুনরায় অ্যান্টি-সোরিক ঔষধ দিতে হবে। এই ভাবে পর্যায়ক্রমে, অ্যান্টি-সোরিক, অ্যান্টি-সাইকোটিক, অ্যান্টি-সিফিলিটিক আবার অ্যান্টি-সোরিক ঔষধ প্রয়োগ করিলে দীর্ঘদিন পরে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতে পারে।

৫। যদি সাইকোসিস, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সোরা এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সিফিলিসের সাথে একযোগে প্রকাশ পায় তবে প্রথমে অ্যান্টি-সোরিক ঔষধ দিয়ে পরে সাইকোসিস ও সিফিলিসের মধ্যে যেটা প্রকট থাকবে সেটার ঔষধ দিতে হবে, তারপর অবশিষ্টটির ঔষধ দিতে হবে। শেষে আবার অ্যান্টি-সোরিক ঔষধ দিতে হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে অ্যান্টি-মায়াজমেটিক ঔষধ পরিবর্তন করে দীর্ঘদিন পরে এই ধরণের রোগীকে আরোগ্য করা সম্ভব হতে পারে। তাই চির-রোগ আরোগ্য করতে এত দীর্ঘ সময় লাগে। যাঁরা দ্রুত উপশম দেবার সপক্ষে তাঁরা এর যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই স্বভাবতই এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু আরোগ্যের পর একটাই, অন্য উপায় নেই।

৬। যদি সাইকোসিস ও সোরা সুপ্ত অবস্থায় থাকে এব সিফিলিস প্রকট থাকে, তবে প্রথমে অ্যান্টি-সিফিলিটিক ঔষধ দিতে হবে। তারপর, অ্যান্টি-সোরিক ঔষধ এবং সবশেষে অ্যান্টি-সাইকোটিক ঔষধ দিতে হবে। তারপর আবার অ্যান্টি-সোরিক ঔষধ দিয়ে তবে চিকিৎসা সম্পূর্ণ

হবে। সম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য এই ক্রম কয়েকবার অনুসরণ করার-দরকার হতে পারে।

সাইকোসিস-এর চিকিৎসা চলাকালীন যদি পূর্বের বিলুপ্ত হওয়া আঁচিল, অর্বুদ ইত্যাদি পুনরায় দেখা দেয়- তবে খুবই ভাল লক্ষণ বলে বুঝতে হবে এবং ধৈর্য ধরে কোন ঔষধ না দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। দেখা যাবে আপনা থেকেই ধীরে ধীরে ঐ পুরাতন লক্ষণ চলে যাবে। যদি না যায় তবে পূর্বের প্রয়োগ করা ঔষধ অপেক্ষাকৃত উচ্চ-শক্তিতে পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে। প্রাথমিক লক্ষণ ফিরিয়ে এনে যদি হোমিওপ্যাথিক অ্যান্টি-মায়াজমেটিক ঔষধ দিয়ে আরোগ্য করা যায়- তবে আরোগ্য সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না। অন্যথায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হলো কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

প্রবণতা, অ্যালার্জি ও ইডিওসিনক্রেসী

ইংরেজী "Susceptibility" শব্দের বাংলা করলে দাঁড়ায় প্রবণতা। বাহ্যিক কোন উত্তেজক বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাকেই প্রবণতা বলে। কোন আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটলে আমরা আনন্দিত হই, দুঃখদায়ক ঘটনায় দুঃখিত হই, ঠান্ডা লাগলে শীত করে, গরম লাগলে অস্বস্তি হয় ও ঘাম ঝরে, চিমটি কাটলে ব্যাথা লাগে, রোগশক্তি শরীরে প্রবেশ করলে জীবনীশক্তি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে- এ সবই হলো প্রবণতার ফল। আমরা যে বেঁচে আছি সেটাই প্রবণতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। মৃত ব্যক্তিতে এই প্রবণতা থাকে না, তাই কোন প্রকার উদ্দীপনায় সে সাড়া দেয় না। জন্মগতভাবে আমরা রোগজ একটা (Heriditary dyscrasia) ও একটা সাধরণ গ্রহণযোগ্যতা (Adoptability) নিয়ে জন্মাই। এই দুয়ের মিলিত অবস্থাকে বলে প্রবণতা। এই প্রবণতা জন্মের পর অনেক কারণে হ্রাস বা বৃদ্ধিলাভ করে। যেমন পারিপাশ্বিক পরিবেশ, অসুস্থতা, স্বাস্থ্যবিধি, জীবন ধারণ প্রণালী, পেশা, মানসিক আঘাত ইত্যাদি। এই প্রবণতা বোঝার কোন সঠিক মাপকাঠি নেই। তবুও এই প্রবণতার উপরই রোগ ও আরোগ্য নির্ভর করে।

সারাদিন বর্ষায় ভিজলে বা রৌদ্রে ঘুরলে স্বাভাবিক প্রবণতার ফলস্বরূপ আমরা সবাই কমবেশী অসুস্থতা অনুভব করতে পারি। কিন্তু বর্ষায় অতি সামান্য একটু ভেজার ফলে যদি কেউ জ্বরে বা নিউমোনিয়ায় বা টনসিলাইটিসে আক্রান্ত হয় তবে বুঝতে হবে বর্ষায় আক্রান্ত হবার প্রবণতা তার মধ্যে খুব বেশী আছে। যে কোনো রোগোৎপাদক শক্তির দ্বারা যার আক্রান্ত হবার প্রবণতা যত বেশী, সেই রোগে সে তত সহজেই আক্রান্ত হয়। এই কারণেই একই বাড়ীতে একজন কোন তরুণ রোগে আক্রান্ত হলে সে বাড়ীর সকলেই সেই রোগে আক্রান্ত হবে এমন নয়। শুধুমাত্র যাদের প্রবণতা বেশী তারাই আক্রান্ত হবে। তেমনি সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ প্রয়োগ করলে যার সেই ঔষধে বেশী প্রবণতা থাকবে সেই ঐ ঔষধটি দ্বারা বেশী প্রভাবিত হবে এবং বেশী লক্ষণ প্রকাশ করবে। আরোগ্যের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতার উপর আমরা অনেক বেশী নির্ভর করি।

উপযুক্ত প্রবণতা না থাকলে শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়ে আমরা রোগী আরোগ্য করতে পারি না। এই ধরণের রোগীকে দুরারোগ্য বলা হয়।

হোমিওপ্যাথিতে এই প্রবণতার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বোধহয় ঔষধের শক্তি নির্বাচনে। যার প্রবণতা যত বেশী তাকে তত উচ্চ-শক্তিতে ঔষধ দিতে হবে। প্রবণতা কম থাকলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন-শক্তিতে ঔষধ দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো এই প্রবণতা বোঝা যাবে কি করে? আজ পর্যন্ত এর কোন সঠিক উপায় জানা যায় নি এবং কোনদিনও বোধহয় তা সম্ভব হবে না। কারণ কোটি কোটি মানুষের প্রবণতা পৃথক পৃথক স্তরের। এর কোনো সাধারণ মানদন্ড সম্ভব নয়। তবু কতকগুলি বিষয় অনুধাবন ও পর্যবেক্ষণ করলে আমরা কোন রোগীর প্রবণতা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি।

শিশুদের প্রবণতা বয়স্কদের চেয়ে অধিক। কাজেই শিশুদের চিকিৎসায় কোন যান্ত্রিক ক্ষয় না থাকলে উচ্চ অথবা মধ্যম শক্তিতে ঔষধ প্রয়োগে ভাল ফল পাওয় যায়। স্ত্রীলোকের প্রবণতা পুরুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। কারণ জীবিকা নির্বাহের চিন্তা, অফিস-আদালতের দুর্ভাবনা ইত্যাদি তুলনামুলকভাবে স্ত্রীলোকদের কম করতে হয়। কাজেই তাঁদের স্নায়ু অপেক্ষাকৃত সুস্থ, সবল ও শান্ত হয়। তাই একই রোগে পুরুষের ক্ষেত্রে যেখানে খুব উচ্চ-শক্তিতে ঔষধ দেবার দরকার হয় সেখানে স্ত্রীলোকদের অপেক্ষকৃত নিম্নশক্তিতে দিলে ভাল ফল হয়। চাষের কাজ করেন এমন একজন কৃষকের প্রবণতা একজন রাজনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবীর চেয়ে কম। তাই একই অসুখে একজন কৃষককে যেখানে ছয় বা তিরিশ শক্তির ঔষধ দেওয়া হয় সেখানে একজন বুদ্ধিজীবীকে দু'শ বা হাজার শক্তির ঔষধ দেবার প্রয়োজন হয়। চির-রোগের রোগী দীর্ঘদিন রোগ ভোগের ফলে ক্রমশঃ প্রবণতা হারাতে থাকে। তাই এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নিম্নশক্তির ঔষধ দিয়ে শুরু করাই ভাল। তরুণ বা পুরাতন যে কোন রোগে যান্ত্রিক ধ্বংস দেখা দিলে প্রবণতা কমে যায়।

যে সব রোগে হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, যকৃত, মূত্রগ্রন্থি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্র আক্রান্ত হয় সেসব ক্ষেত্রে প্রবণতা কমে যায়। রোগের প্রকৃতির

উপরও প্রবণতা নির্ভর করে। যেমন তরুণ রোগে আশু এবং প্রবল প্রতিরোধের দরকার হয়।কাজেই প্রবণতা বেশী থাকে। প্রবণতা কম বেশীর উপর ঔষধের শক্তি নির্বাচন কিভাবে নির্ভর করে তা বিস্তারিতভাবে পৃথক প্রবন্ধে লেখা হয়েছে।

কোন উদ্দীপক Stimulus) -এর বিরুদ্ধে প্রথমবারেই আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশী না থাকলেও বারবার প্রয়োগ বা আক্রমণের ফলে অধিক প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এক মাত্রা প্রয়োগে কারও শরীরে কোন লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও বারবার সেই ঔষধ প্রয়োগ করলে অবশ্যই লক্ষণ প্রকাশ পাবে। পুনঃপুনঃ রোগশক্তির আক্রমণের ফলে যে প্রবণতা বৃদ্ধি পায় তা আমরা অ্যালার্জির ক্ষেত্রে বুঝতে পারি।

এবার দেখা যাক এই অ্যালার্জি কি?

প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা প্রতিক্রিয়া আছে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে এই প্রতিক্রিয়া ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত হবে। অ্যালার্জিতে এই প্রতিক্রিয়া, ক্রিয়ার শক্তির চেয়ে অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন হয়ে দেখা দেয়। তার কারণ হলো অত্যাধিক প্রবণতা। কোন একটি বিশেষ জিনিসের প্রতি কারও প্রবণতা এত বেশী থাকতে পারে যে, সেই জিনিস সামান্য পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করলেও অনেক বেশী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। ফলে নানাভাবে অ্যালার্জির রূপ নেবে। কেউ বা ডিমের প্রতি অত্যাধিক প্রবণতাবশতঃ আমবাতে ভোগে, কেউ বা ধূলার প্রতি অত্যাধিক প্রবণতাবশতঃ হাঁচি, সর্দি ইত্যাদিতে ভোগে, কেউ বা পিয়াজ খেয়ে উদরাময়ে ভোগে, এই ধরণের নানারকম অ্যালার্জি দেখা যায়। প্রতিক্রিয়ার সমতা অক্ষুন্ন থাকলে এই অ্যালার্জি প্রকাশ পায় না। এই ধরণের অস্বাভাবিক প্রবণতা জন্মগত হতে পারে বা জন্মের পর দেখা দিতে পারে। এর সঠিক কারণ আজও জানা যায় নি। তবে এর মূলে যে অত্যাধিক প্রবণতা বর্তমান সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। অ্যালার্জি প্রস্তুতকারী শক্তিসমূহের (Allergens) যে কোন একটির সামান্য একটু শরীরে প্রবেশ করলেই এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। একই জিনিস দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলেও শেষ পর্যন্ত এই ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে

পারে। যেমন কেউ মাত্র একটা পেনিসিলিন ইনজেকশন (Penicillin Injecion) নিয়ে অ্যালার্জিতে ভোগে, আবার, কেউ দীর্ঘদিন পেনিসিলিন (Penicillin) ব্যবহারের পর পুনরায় পেনিসিলিন (Penicillin) দিলে অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রথমদিকে হয়ত তার অধিকতর প্রবণতা ছিল না-কিন্তু একই উত্তেজক জিনিস দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে কোষগুলি অত্যধিক প্রবণতা লাভ করায় অ্যালার্জি দেখা দিয়েছে। কাজেই অ্যালার্জি অর্থে অত্যধিক প্রবণতা বোঝায়। কিন্তু এটাকে অত্যাধিক প্রবণতা বললে ভুল করা হবে। এক্ষেত্রে অত্যাধিক এবং অদ্ভুত ধরণের প্রতিক্রিয়া হতে দেখা যায়। সাধারণভাবে অত্যাধিক প্রবণতা থাকলে তাকে অতি প্রবণতা (Hypersusceptibility) বলে। কিন্তু এই অতি প্রবণতা যদি অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তবেই তাকে অ্যালার্জি বলে।

এরপর দেখা যাক ইডিওসিনক্রেসি (Idiosyncrasy) বলতে কি বোঝায়?

হ্যানিম্যান অর্গ্যাননে বলেছেন ইডিওসিনক্রেসি হলো এক ধরণের অদ্ভুত ধাতুগত অবস্থা (Peculiar Corporeal Constitution) , যে অবস্থায় এই ধরণের বিশেষ প্রবণতাসম্পন্ন কোন ব্রক্তি কোন বিশেষ এবং আপাতঃ নির্দোষ বস্তুর দ্বারা এমন বিশেষভাবে আক্রান্ত হয় যে তার জীবন-সংশয় দেখা দিতে পারে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, যে জিনিষটার দ্বারা লোকটি আক্রান্ত হয় আপাতদৃষ্টিতে তার কোন ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা যয় না। যদিও উক্ত জিনিসটির মধ্যে ক্ষতিকর প্রভাব অবশ্যই বর্তমান। অন্যথায় তাতে এ ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে না। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তার কোনো ক্ষতিকর প্রভাব অনুভব করা যাচ্ছে না। যেমন গোলাপ ফুলের গন্ধ সবাই পছন্দ করেন। গোলাপ ফুলের গন্ধে খারাপ কিছু হতে পারে ব'লে আমরা মনে করি না বা জানি না। কিন্তু এমন লোকও থাকতে পারেন যিনি হয়ত গোলাপ ফুলের গন্ধ শোঁকামাত্রই মূর্ছা গেলেন। এই ধরণের লোকদের ইডিওসিনক্রেটিক (Idiosyncratic) বলা হয়। আপাতঃ আনন্দদায়ক ফুলের গন্ধে মূর্ছা যাওয়ার কোনই কারণ নেই। অথচ কোন বিশেষ ব্যক্তির গোলাপের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রবণতার জন্য এই ঘটনা ঘটে। গোলাপের মধ্যে এই ধরনের মূর্ছা ঘটাবার ক্ষমতা

অবশ্যই লুক্কায়িত আছে। অন্যথায় এই অতিপ্রবণতার ক্রিয়া হচ্ছে কার বিরুদ্ধে? তাছাড়া এও দেখা গেছে মূর্ছা যাওয়া ব্যক্তির শরীরে গোলাপজল ছিটিয়ে দিলে অনেক সময় তাঁর মূর্ছা ভাল হয়ে যায়। গোলাপের মূর্ছা ঘটাবার ক্ষমতা আছে বলেই এটা সম্ভব।

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তাতে বোঝা গেল- এলার্জি ও ইডিওসিনক্রেসি দুটোই এক অদ্ভুত ধরণের অতিপ্রবণতা। তাহলে এই দু'টিই কি এক না কোন পার্থক্য আছে? আমার মনে হয় এক নয়। অবশ্য আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যা বুঝেছি তার উপর ভিত্তি করেই একথা বলছি। ইডিওসিনক্রেসি হলো একটা ধাতুগত অবস্থা (Constitutional defect)। এই ধাতু বলতে আমরা বুঝি দেহ-মনের মিলিত গঠন-ভঙ্গিমা। ইডিওসিনক্রেসিতে দেহ ও মন যুগ্মভাবে আক্রান্ত হয়। তাই ইডিওসিনক্রেসির দরুণ একটা কালো বেড়াল দেখে কেউ অজ্ঞান হতে পারে। কিন্তু অ্যালার্জিতে দেহের কোষ, কলা বা কোন দেহযন্ত্র এমন কি সমগ্র দেহ আক্রান্ত হতে পারে অথচ মনের উপর তার কোন প্রভাব পড়ে না। যতক্ষণ না প্রোটিন জাতীয় কোন অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহ (Allergen) শরীরে ঢুকছে, ততক্ষণ অ্যালার্জি হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া অ্যালার্জিতে আক্রান্ত স্থানের কোষে বা কলায় আক্রমণজনিত প্রদাহের লক্ষণ বর্তমান থাকে। কিন্তু ইডিওসিনক্রেসিতে শরীরের কোন কোষে বা কলায় কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। কাজেই স্নায়ুর প্রতিবর্ত ক্রিয়াই এর জন্য দায়ী বলে মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ মানুষটা সামগ্রিকভাবে (As a whole) আক্রান্ত হয়। কোন কলায় বা দেহযন্ত্রে এই আক্রমণ সীমাবদ্ধ থাকে না। সাধারণতঃ জন্মগত অস্বাভাবিকতা ইডিওসিনক্রেসীর বৈশিষ্ট্য। কোন জন্মগত ক্রটি (Genetic defect) এর জন্য দায়ী কিনা তা গবেষণার বিষয়।

একথা মনে করার কারণ এই যে অ্যালার্জি আমরা হামেশাই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য করে থাকি-কিন্তু ইডিওসিনক্রেসি আরোগ্য করা অতীব দুরূহ, এমনকি কেন্ট প্রমুখ স্বনামধন্য চিকিৎসকরাও এই অবস্থাকে আরোগ্যের অসাধ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। কোন কলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নি। অথচ রোগী আরোগ্য সম্ভাবনাহীন-এ অবস্থা, কি জীনগত (Genetic) ক্রটি ছাড়া সম্ভব? অবশ্য হ্যানিম্যান এ ধরণের

রোগীকে কিভাবে চিকিৎসা করতে হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ "অর্গ্যানন ও ক্রনিক ডিজিজ" গ্রন্থে দিয়েছেন। সেইভাবে চিকিৎসা করে ফলও পেয়েছি। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এই সব রোগীকে আরোগ্য করা সব সময় অসম্ভব না হলেও অতীব দুরূহ। সৌভাগ্যবশতঃ ইডিওসিনক্রেটিক রোগীর সংখ্যা অতি নগণ্য। সে তুলনায় অ্যালার্জির রোগী আমরা প্রায় প্রতিদিনই দেখতে পাই বা চিকিৎসা করে থাকি। আমার অভিজ্ঞতা ও ধারণা অ্যালার্জি খুব সহজে এবং দ্রুত আরোগ্য করা সম্ভব-অবশ্য দু'চারটি জটিল এবং বহুদিনের অবদমনের কুফলে আক্রান্ত রোগী ছাড়া।

হোমিওপ্যাথিক মতে ড্রাগ প্রুভিং (Drug Proving) এর সময় এই ধরণের ইডিওসিনক্রেটিক প্রুভার (Idiosyncratic Prover) -রাই আমাদের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু হয়ে দেখা দেয়। কারণ, এদের দেহমনের এই অতি প্রবণতার ফলে শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ন্যূনতম মাত্রাও এদের মধ্যে প্রবলভাবে কাজ করে, এবং তাতে ঔষধের যাবতীয় লক্ষণই প্রকাশ পেতে পারে। কাজেই ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ ছাড়াই যদি তার ক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় জানতে হয় -তবে তা একমাত্র ইডিওসিনক্রেটিক লোকদের মধ্যেই সম্ভব। অ্যালার্জির রোগীতে তা সম্ভব কি? বোধ হয় না। অ্যালার্জি রোগীর উপর ড্রাগ-প্রুভিং করে দেখলেই এই সত্য পরিস্কার হয়ে যাবে। তার জন্য তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিসম্বাদের প্রয়োজন নেই।

ইডিওসিনক্রেটিক রোগী দুরারোগ্য বলেই হ্যানিম্যান এদের চিকিৎসার জন্য একটা বিশেষ পন্থা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই ধরণের অনুভূতি প্রবণ রোগীদেরকে সরাসরি ঔষধ না খাইয়ে শোঁকানো দরকার। এক ড্রাম শিশিতে নির্দিষ্ট ঔষধ দ্বারা ঔষধীকৃত গুলি (Medicated Globule) আধ-শিশি নিয়ে রোগীর নাকের কাছে ধরে তাকে মাত্র কয়েক সেকেন্ড শোঁকাতে হবে। ঔষধের শক্তি তিরিশের বেশী হবে না। এইভাবে একদিন একবার মাত্র প্রয়োগের পর দু-তিন মাস পরে আবার ঐ একই প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করা চলতে পারে। এইভাবে দীর্ঘদিন চিকিৎসা চালালে তাঁদের অতিপ্রবণতা কমে যাবে এবং তাঁরা আরোগ্য লাভের উপযোগী হয়ে উঠবেন।

প্রাথমিক বা মুখ্য ক্রিয়া এবং গৌণ ক্রিয়া

যে কোন ঔষধ মানবশরীরে প্রয়োগ করলে সঙ্গে সঙ্গে তার যে ক্রিয়া হয় তাকে প্রাথমিক ক্রিয়া (Primary action) বলে। এই ক্রিয়া ঔষধের দু'রকম শক্তির উপর নির্ভর করে। একটা হলো ঔষধের বস্তুগত শক্তির ক্রিয়া (crude action) এবং আর একটা হলো ঔষধের গুণগত অদৃশ্য সূক্ষ্ম শক্তির ক্রিয়া (Dynamic action)। এই উভয় শক্তির ক্রিয়ায় অনেকগুলি পরিবর্তন ও লক্ষণ দেখা দেয়। সেইসব লক্ষণগুলিই আমাদের মেটিরিয়া মেডিকায় লেখা আছে। এই লক্ষণগুলিই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অমূল্য সম্পদ এইসব লক্ষণগুলির মধ্যে কিছু লক্ষণ দেখা যায় যা পরস্পর বিরোধী, যেমন কোষ্ঠকাঠিন্য এবং উদরাময় একই ঔষধের প্রাথমিক ক্রিয়ায় লেখা আছে। কিছু ঔষধের এই ধরণের বিপরীতধর্মী লক্ষণ প্রাথমিক ক্রিয়ায় দেখা যায়। প্রথমে হয়ত ঔষধটি কোষ্ঠকাঠিন্য তৈরী করলো-আবার কিছুক্ষণ বা দুই এক দিন পরেই উদরাময় তৈরী করলো। এই ধরণের বিপরীতধর্মী লক্ষণগুলি পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। কাজেই এই ঔষধ কোষ্ঠকাঠিন্যে, উদরাময়ে অথবা একই রোগীতে উভয় লক্ষণ পর্যায়ক্রমে বর্তমান থাকলে ব্যবহার করা যায় এবং আরোগ্য করানো যায়।

ঔষধের এই প্রাথমিক ক্রিয়া যখন চলতে থাকে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য জীবনীশক্তি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে এই প্রতিক্রিয়া বিপরীত এবং ক্রিয়ার সমপর্যায়ের হবে। কাজেই প্রাথমিক ক্রিয়ায় যদি উদরাময় দেখা দেয়, তবে জীবনশক্তির প্রতিক্রিয়ায় উদরাময়ের সমশক্তি সম্পন্ন কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেবে। একে গৌণ-ক্রিয়া (Secondary action) বলে। কাজেই ঔষধের প্রাথমিক ক্রিয়া যতটা শক্তিশালী হবে, গৌণ-ক্রিয়াও তদ্রুপ শক্তিশালী হবে। এটা আমাদের বোঝা একান্ত দরকার। কারণ এর উপরেই নির্ভর করে আমরা কি শক্তিতে, পরিমাণে ও মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করবো। বস্তুগত মাত্রায় (Physiological dose) ঔষধ প্রয়োগ করলে তার প্রতিক্রিয়া যত

বেশী হবে, সূক্ষ্মশক্তিতে ও কম মাত্রায় প্রয়োগ করলে তার চেয়ে যথেষ্ট কম হবে। ঔষধের সূক্ষ্মশক্তির (Dynamic action) এই ক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এত কম হয় যে তার লক্ষণ বাইরে সব সময় প্রকাশ পায় না। যখন প্রকাশ পায়, তখন তাকে গৌণ বিপরীত লক্ষণ সৃষ্টিকারী ক্রিয়া বলে। কিন্তু যখন বিপরীত লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায় না তখন তাকে গৌণ আরোগ্যকারী ক্রিয়া বলে। কারণ এতে শুধু প্রাথমিক ক্রিয়াটাই কার্য করে। তারপর জীবনীশক্তি তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করায় প্রাথমিক লক্ষণগুলি দূরীভূত হয় মাত্র, কোন বিপরীত লক্ষণ তৈরী হয় না। ফলে রোগী আরোগ্য লাভ করে এবং ঔষধজনিত লক্ষণের বিরুদ্ধে সৃষ্ট লক্ষণের দ্বারা কষ্ট পায় না।

এই আরোগ্যকারী ক্রিয়াই আমাদের প্রয়োজন। কাজেই আমরা কি শক্তিতে ও মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করবো-সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। যাঁরা মাদার টিনচার বা স্থূলশক্তির ঔষধ প্রয়োগ করেন- তাঁরা কি হোমিওপ্যাথিতে সত্যই আস্থাবান? তা যদি হয় তবে জেনেশুনে রোগীর ক্ষতিকর বিপরীত গৌণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এক কষ্ট থেকে উপশম দেবার জন্য অন্য একটা কষ্টের সৃষ্টি কেন আমরা করি? অবশ্য গৌণ আরোগ্যকারী ক্রিয়াও যে বিপরীত ধর্মী একথা মনে রাখতে হবে। দুই অবস্থায় এই আরোগ্যকারী ক্রিয়া দেখা যায়। প্রথমতঃ স্থূলশক্তিতে ঔষধ প্রয়োগ করলেও যদি প্রকৃতিতে প্রাথমিক ক্রিয়ায় সৃষ্ট লক্ষণের সার্থক বিপরীত লক্ষণ না থাকে- যেমন যন্ত্রণা। প্রাথমিক ক্রিয়ায় যদি শরীরে কোথাও যন্ত্রণা অনুভূত হয়, তবে গৌণ ক্রিয়ায় এর সার্থক বিপরীত কোন লক্ষণ তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। কারণ যন্ত্রণার বিপরীত কোন লক্ষণ হয় না। দ্বিতীয়তঃ ঔষধের শক্তি যদি সুক্ষ্ম হয় এবং মাত্রা একেবারে ন্যূনতম হয় তবে সেক্ষেত্রেও বিপরীত লক্ষণ তৈরী হয় না। জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ায় আরোগ্য লাভই ঘটে থাকে।

কাজেই আরোগ্যই যদি চিকিৎসকের উদ্দেশ্য হয়- যা হ্যানিম্যান অর্গ্যাননের প্রথম সূত্রে বলেছেন, তাহলে ঔষধ এবং রোগ উৎপাদক শক্তির ক্রিয়া এবং জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। ঔষধের প্রাথমিক ক্রিয়াতে পর্যায়ক্রমে বিপরীত লক্ষণ তৈরী হতে পারে। আবার জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়াতেও তা হতে পারে। এখন কিভাবে বোঝা যাবে বিপরীত লক্ষণটি বা লক্ষণগুলি- ঔষধের প্রাথমিক ক্রিয়ার একটা পরিবর্তিত অবস্থা মাত্র অথবা জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়াজনিত?

এটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়। প্রাথমিক ক্রিয়াজনিত বিপরীত লক্ষণ পর্যায়ক্রমে বার বার ঘুরে ঘুরে আসবে ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ ছাড়াই। কিন্তু জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়াজনিত বিপরীত লক্ষণ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকবে- যদি না ঔষধ পুনঃ প্রয়োগ করা হয়। যেমন একদাগ তিরিশ শক্তির পডোফাইলাম খাওয়ার পর উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে যতক্ষণ ঔষধের ক্রিয়া স্থায়ী হবে। কিন্তু জীবনীশক্তির গৌণ ক্রিয়ায় যদি উদরাময়ের পর কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয় তবে কোষ্ঠবদ্ধতাই চলতে থাকবে, যতক্ষণ না পুনরায় ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। তবে ঔষধের মাত্রা ও শক্তির সূক্ষ্মতাহেতু হোমিওপ্যাথিতে এইরূপ বিপরীত লক্ষণ খুব কমই প্রকাশ পায়। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিবাদের নামে আমরা ঔষধের ক্রমাগত অহেতুক পুনঃ প্রয়োগ করে এই ধরণের বিপরীত লক্ষণের সৃষ্টি করে চলেছি। এই প্রগতি বেশীদিন চলতে থাকলে হোমিওপ্যাথির ভবিষ্যৎ কি?- পাঠকগণকে একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

"হোমিওপ্যাথিক, ঔষধজ এবং রোগজ বৃদ্ধি"

হোমিওপ্যাথির সঙ্গে সামান্যতমভাবে সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারের ফলে প্রথম দিকে রোগীর কষ্টের বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু এই বৃদ্ধি কি কারণে, তা না জানলে ভালকে খারাপ এবং খারাপকে ভাল বলে ভুল করে মারাত্মকভাবে ঠকতে হবে এবং রোগীর সমূহ ক্ষতি করা হবে।

সঠিক ঔষধ সামান্যতম মাত্রায় প্রয়োগের পরও রোগীর বর্তমান লক্ষণ-গুলির সামান্য বৃদ্ধি ঘটে থাকে। কারণ, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্বাভাবিক রোগশক্তির চেয়ে বেশী শক্তিশালী এবং সদৃশ, কাজেই বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। যে রোগীর উদরাময় হয়েছে, তাকে যদি উদরাময় সৃষ্টিকারী অধিকতর শক্তিশালী ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তবে স্বাভাবিক ভাবেই তার উদরাময় বেড়ে যাওয়ার কথা এবং তা যায়ও কিন্তু তবু পুরাতন রোগের ক্ষেত্রে শুধু এই নীতিতে ঔষধ প্রয়োগ করেই আরোগ্য সম্ভব-এটা কি করে হয়, যে ঔষধ রোগীর বর্তমান লক্ষণ বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেই ঔষধ কিভাবে তাকে আরোগ্য করবে? হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী নন এমন লোকের পক্ষে এটা বোঝা খুবই শক্ত। অনেক রোগীকে এই প্রশ্ন করতে শুনেছি। এমনকি, রোগবৃদ্ধির কথা শুনে চিকিৎসা না করে ফিরে যেতেও দেখেছি। কাজেই হোমিওপ্যাথ মাত্রেরই উচিত এটা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করে রোগীকে এবং সাধারণকে বোঝানো।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সদৃশ এবং বেশী শক্তিশালী কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শক্তিকৃত (Potentised) ঔষধে, ঔষধের পরিমাণ এতই কম যে, তার স্থূলক্রিয়া একদম থাকে না বললেই চলে। যা থাকে তা হ'লো ঔষধের সূক্ষ্মক্রিয়া (Dynamic action)। এই সূক্ষ্মক্রিয়া একটা সীমাবদ্ধ সময় পর্যন্ত থাকে। তরুণ রোগে মাত্র কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টা এবং পুরাতন রোগে কয়েকদিন, কয়েক সপ্তাহ এমনকি কয়েকমাস পর্যন্ত তা থাকতে পারে। উদরাময় প্রভৃতি তরুণ রোগে প্রাথমিক পর্যায়ে

উদরাময় ইত্যাদির সামান্য বৃদ্ধি ঘটতে পারে। কিন্তু শীঘ্রই জীবনী শক্তির গৌণ ক্রিয়ায় এই বৃদ্ধি দূর হয় এবং রোগী আরোগ্যলাভ করে। ঔষধের শক্তি যদি রোগশক্তির চেয়ে খুব বেশী না হয় এবং অহেতুক পুনঃ প্রয়োগ না করা হয়, তবে কোনরকম বৃদ্ধি ছাড়াও রোগী আরোগ্য লাভ করতে পারে। এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, ঔষধ শক্তিশালী না হলে যখন আরোগ্য সম্ভব নয়, তখন বৃদ্ধি ছাড়া আরোগ্য হবে কি করে? কথাটা ঠিকই এবং প্রকৃতপক্ষে রোগীর অভ্যন্তরে সামান্য বৃদ্ধি ছাড়া আরোগ্য অসম্ভব। কিন্তু এই বৃদ্ধি এত নগন্য এবং ক্ষণস্থায়ী যে বাহ্যতঃ তার প্রকাশ হওয়ার আগেই রোগী আরোগ্য লাভ করে। কারণ বৃদ্ধি প্রকাশ পাবার আগেই জীবনীশক্তি তার বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিরোধ ঘটিয়ে থাকে- ফলে আমরা আরোগ্যই দেখতে পাই, বৃদ্ধি দেখতে পাইনা। একমাত্রা শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খেলে, একমাত্র ইডিওসিনক্রেটিক ব্যক্তি ছাড়া, কারও মধ্যে কোন লক্ষণ নাও দেখা দিতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঐ একমাত্রা ঔষধ তার শরীরে কোন ক্রিয়াই করেনি। ক্রিয়া করেছে নিশ্চয়ই-অভ্যন্তরে সামান্য পরিবর্তনও এসেছে কিন্তু বাহ্যতঃ প্রকাশ পাওয়ার আগেই ঔষধের ক্রিয়া শেষ, কাজেই কোন ক্রিয়াই বোঝা গেল না।

কিন্তু কোন বৃদ্ধি ছাড়াই আরোগ্য হওয়ার চেয়ে সামান্য বৃদ্দি ঘটলেই আমরা খুশী হই, কারণ বৃদ্ধি ছাড়া আরোগ্যের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় আরোগ্য না হয়ে রোগীর কষ্টের সাময়িক উপশম হয়েছে মাত্র। এর কারণ লক্ষণ সমষ্টির সামগ্রিক চিত্রের সদৃশ না হয়ে আংশিক সদৃশ কোন ঔষধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকলে কোনরকম বৃদ্ধি না হয়ে কিছু কিছু লক্ষণের সাময়িক উপশম হয় মাত্র। কাজেই বৃদ্ধি ছাড়া উপশম হলে আমরা ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারি না- বরং অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্দিহান থাকতে হয়। যদিও ব্যবস্থাপত্রের যথার্থতা বোঝবার সহজ উপায়ও আছে যা একজন সুনিপুন পর্যবেক্ষকের পক্ষে বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না।

যাই হোক সঠিক ঔষধ নির্বাচনের পর রোগীর বর্তমান লক্ষণের এই যে বৃদ্ধির কথা বলা হ'লো একেই হোমিওপ্যাথিক রোগলক্ষণ বৃদ্ধি (Homoeopathic aggravation) বলে। এই বৃদ্ধির মজা হ'লো রোগীর কষ্টের সাময়িক বৃদ্ধি সত্ত্বেও রোগী মানসিক দিক থেকে ভাল অনুভব করে। তার একজিমার বৃদ্ধি, মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি, হাত পায়ে জ্বালার বৃদ্ধি ইত্যাদি সত্ত্বেও রোগী সামগ্রিকভাবে ভাল অনুভব করে। এখানে আবার প্রশ্ন উঠতে পারে রোগীর কষ্ট বেড়ে যাবে অথচ রোগী সামগ্রিকভাবে ভাল অনুভব করবে এ ধরণের আপাতবিরোধী ঘটনা কি ক'রে সম্ভব? হ্যাঁ খুবই সম্ভব। কারণ, অসুস্থতার সূত্রপাত হয়- জীবনীশক্তির স্তরে (Dynamic Plane) -এ এবং ক্রমশঃ তা ইচ্ছাশক্তি, মন ইত্যাদি হ'য়ে শেষ পর্যন্ত দেহের বিভিন্ন অংশের প্রকাশ পায়। ঔষধও রোগজ শক্তির মত একটা রোগোৎপাদক শক্তি। শক্তিকৃত (Potentised) হোমিওপ্যাথিক ঔষধও সদৃশ বিধান মতে নির্বাচিত হওয়ায় রোগ আক্রমণের ক্রম অনুসরণ করে দেহের বিভিন্ন অংশে তার লক্ষণ প্রকাশ করে। ফলে, মনের স্তর থেকে নেমে এসে যখন তার ক্রিয়া দেহে প্রকাশ পায় তখন রোগী মানসিক দিক দিয়ে অনেকটা ভাল অনুভব করে। তেমনি আবার হৃদযন্ত্রের উপর ক্রিয়া প্রকাশের পর যখন সন্ধিস্থলে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তখন রোগী হৃদযন্ত্রের লক্ষণগুলির উপশম অনুভব করে। তাছাড়া শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করায় তার কোন বিষজ (Toxic) ক্রিয়া বা লক্ষণ প্রকাশ পায় না। লক্ষণের কারণ যদি বিষজ (Toxic) না হয় তবে সেই লক্ষণে রোগী দূর্বল বা খারাপ অনুভব না করে বরং ভাল অনুভব করে। যেমন পাকস্থলীর বদহজম-জনিত যন্ত্রণায় রোগী বমি করতে পেলে আরামই অনুভব করে। বমি-জনিত দূর্বলতা অনুভব করে না।

পরিশেষে একটা কথা মনে রাখা দরকার-পুরাতন রোগে (চির-রোগ) এবং দুরারোগ্য রোগীতে এই বৃদ্ধি দীর্ঘদিন এমনকি কয়েকমাস পর্যন্ত চলতে পারে। এই বৃদ্ধি সময় মতো বুঝে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে রোগীর জীবন সংশয় হয়ে উঠবে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। এবারে দেখা যাক এ ধরণের বৃদ্ধিতে চিকিৎসকের করণীয় কি?

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তাতে এটা নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে, এই ধরণের বৃদ্ধি রোগীর পক্ষে মঙ্গলজনক। কাজেই এ ক্ষেত্রে আমাদের ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। বৃদ্ধিজনিত কষ্টের জন্য কোন নতুন ঔষধ দেবার দরকার নেই। অচিরেই এই বৃদ্ধির উপশম হয়ে রোগী আরোগ্যর পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু এই অপেক্ষা করার একটা সীমা আছে। এই বৃদ্ধি যদি এমন হয় যে রোগীর জীবন-সংশয় দেখা দিয়েছে, তবে সেক্ষেত্রে তখনই যে ঔষধে বৃদ্ধি ঘটেছে তার উপযুক্ত বিষঘ্ন ঔষধ (antidote) দিতে হবে। ঔষধ নির্বাচন পুরোপুরি সঠিক হলেও তা করতে হবে। এর থেকে বুঝতে হবে যে, ঔষধ সুনির্বাচিত হলেও তার শক্তি অথবা মাত্রা অধিক হয়েছে। কাজেই অ্যান্টিডোট দিয়ে বৃদ্ধি কমিয়ে নিয়ে পুনরায় পূর্বনির্বাচিত ঔষধ অপেক্ষাকৃত কম শক্তিতে ও মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। যেমন ধরা যাক কোনো রোগিনীর জরায়ু থেকে রক্তস্রাব হচ্ছে। তাকে সব লক্ষণ মিলিয়ে ফসফরাস দেওয়া হলো। কিন্তু রোগীনীর স্রাব এত বেড়ে গেল যে শরীর ঠান্ডা হয়ে এলো, নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না, ব্লাড প্রেসার ক্রমশঃ কমছে, - এ অবস্থায় বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে রোগিনী মারা যেতে পারে। কাজেই বৃদ্ধির সাময়িক উপশমদায়ক ও বিষঘ্ন হিসাবে (কিন্তু লক্ষণ মিলিয়ে) দু-চার মাত্রা নাক্স-ভমিকা দেওয়া হলো, এতে রোগের বৃদ্ধি চলে গেল এবং রোগী ভাল অনুভব করতে লাগল। সম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য পরে অবশ্য ফসফরাসই আবার অপেক্ষাকৃত নিম্নশক্তিতে দিতে হবে।

এবারে এই বৃদ্ধির ব্যাপারে দু-একটি সমস্যার আলোচনা করা যাক। হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি হয়নি অথচ রোগী বলছে যে সে ভাল অনুভব করছে বা ভাল আছে। এ ধরণের রোগীতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। যথেষ্ট বিচক্ষণতার সাথে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করলে তবেই বোঝা যাবে যে, এটা রোগজ বৃদ্ধি। অন্যথায় হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি মনে করে অপেক্ষা করলে রোগীর জীবন সংশয় দেখা দেবে। যেমন একটা যক্ষ্মা রোগীকে লক্ষণ মিলিয়ে একটা ঔষধ দেওয়া হলো। কয়েকদিন পরে রোগীর বাড়ীর লোক এসে জানালো রোগীর কফের সাথে প্রচুর রক্ত উঠছে

(Haemoptysis)। চিকিৎসক রোগীকে দেখতে গেলেন এবং রোগীকে তার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করায় রোগী জানাল সে ভাল আছে। এ অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি মনে করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। রোগীকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে, রোগী মোটেই ভাল নেই। তার নাড়ীর গতি দ্রুততর হয়েছে, ক্ষুধা একেবারেই কমে গেছে, দূর্বলতা অত্যাধিক বেড়ে গেছে, ওজন আরও হ্রাস পেয়েছে এবং ফুসফুসের অবস্থা আরও অবনতির দিকে। এখানে রোগী যে ভাল আছে বলছে, সেটা হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধিজনিত ভাল থাকা নয়। যক্ষ্মা রোগীর একটা সাধারণ লক্ষণই হলো এই যে, রোগী শেষ পর্যন্ত তার আরোগ্য সম্বন্ধে খুব আশাবাদী হয় এবং এজন্য যখনই কেউ জিজ্ঞাসা করে সে কেমন আছে তখনই জানায় ভাল আছে। কাজেই এটা ঐ রোগের একটা সাধারণ লক্ষণ। এ ক্ষেত্রে রোগটাই বেড়ে গেছে এবং ঔষধ নির্বাচন ভুল হয়েছে, এবং পুনরায় লক্ষণ সমষ্টির চিত্র মিলিয়ে নতুন ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

আর একটা সমস্যা দেখা যায় যেখানে প্রকৃতই হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি অথচ রোগী ভাল অনুভব করছে না। এটা আমরা দেখতে পাই মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে এবং সুনির্বাচিত ঔষধের অহেতুক পুনঃ প্রয়োগে। মানসিক রোগীতে মনটাই রোগের কেন্দ্র। কাজেই হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি হলে-মানসিক লক্ষণগুলিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।কাজেই হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি কিনা বুঝতে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। ফলে যখন অপেক্ষা করা উচিত তখন অহেতুক ঔষধ পরিবর্তন করে রোগীর অপূরণীয় ক্ষতি করা হয়। এ সব ক্ষেত্রে এক মাত্রা ঔষধ প্রয়োগ ক'রে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে এবং রোগীকে সুনিপুন বিচক্ষণতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দেখা যাবে হয়ত বা রোগীর ক্ষুধা বেড়েছে, আগের চেয়ে ভাল ঘুম হচ্ছে, শারীরিক অস্থিরতা কমেছে, অথবা অন্য কোন শারীরিক লক্ষণের উন্নতি হয়েছে ইত্যাদি। এর থেকে বুঝতে হবে রোগী ভাল আছে এবং এটা হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি। এই জন্য মানসিক রোগীতে বেশী উচ্চ-শক্তির ঔষধ না দিয়ে মধ্য-শক্তির একমাত্রা ঔষধ প্রয়োগ করে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তিরিশ শক্তির এক মাত্রা

হায়োসায়ামাস দিয়ে বদ্ধ পাগল রোগীতে দু-তিন মাস পরে আশানুরূপ ফল পেতে দেখেছি। অহেতুক ঔষধের পুনঃ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও রোগী সামগ্রিকভাবে ভাল অনুভব করার সুযোগ পায় না। মানসিক অস্থিরতার রোগীতে বার বার আর্সেনিক প্রয়োগ করলে সে ভাল অনুভব করবে কি করে? আর্সেনিক তো তার মানসিক লক্ষণগুলি ক্রমাগত বাড়িয়েই যাবে।

হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধির এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হয়ে ঠিকমত রোগী পর্যবেক্ষণ করতে পারলে তবেই বোঝা যায় হোমিওপ্যাথির অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা। কিন্তু আমাদের সেই পর্যবেক্ষণ করবার মতো দৃষ্টি কই, ধৈর্য্য কই, ইচ্ছা কই, চেষ্টা কই, উৎসাহ কই? আমরা তাড়াতাড়ি বাজিমাৎ করতে চাই বা যাই। তাই সাময়িক উপশমকে আরোগ্য ভেবে খুশী হই এবং গর্ব অনুভব করি। বৃদ্ধি মানেই রোগের বৃদ্ধি নয় বা হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি নয় একথা আমরা জেনেও ভুল করি কেন? ভুল করি, তার কারণ আমরা হোমিওপ্যাথিতে পুরোপুরি আস্থাশীল নই। তাই বৃদ্ধি মানেই যে খারাপ নয় আবার বৃদ্ধি মানেই যে ভাল নয় একথা আমরা রোগী দেখার সময় ভুলে যাই। কিন্তু এগুলি না বুঝে চিকিৎসা করা মানে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

এবারে ঔষধজ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আসা যাক। হোমিওপ্যথিক ঔষধ প্রয়োগের ফলে আর এক রকম বৃদ্ধি দেখা যায়। এটা হয় যখন রোগীর বর্তমান কষ্ট ছাড়াও অনেক নতুন লক্ষণ দেখা দেয় এবং রোগী তার জন্য কষ্ট অনুভব করে। এই নতুন লক্ষণগুলি রোগের পুরাতন চাপা দেওয়া লক্ষণ ফিরে আসা নয় বা রোগের বৃদ্ধিজনিত লক্ষণ নয়। এই নূতন লক্ষণগুলি হলো, যে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছে সেই ঔষধেরই লক্ষণ। ঔষধের সঠিক নির্বাচন না হলে এই ধরণের ঔষধজ লক্ষণ দেখা দেয়। সম্পূর্ণ ভুল ঔষধও পুনঃপুনঃ প্রয়োগের ফলে এইরূপ লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধির সাথে এর প্রভেদ এই যে, হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধিতে রোগীর বর্তমান লক্ষণগুলিই শুধু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কোন নূতন লক্ষণ দেখা দেয় না। তাছাড়া হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধিতে রোগী বৃদ্ধি সত্ত্বেও ভাল অনুভব করে। কিন্তু ঔষধজ বৃদ্ধিতে রোগী ভাল অনুভব করে না। যত

বেশী ঔষধের নতুন লক্ষণ দেখা দেবে ততই ব্যবস্থাপত্রের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেবে। এই ধরণের বৃদ্ধিতে যদি অল্প দু-চারটি লক্ষণ দেখা দেয় এবং রোগী খুব কষ্ট অনুভব না করে, তবে অপেক্ষা করলে এগুলি আপনিই চলে যাবে। কোন ঔষধের দরকার হবে না। নতুন লক্ষণগুলি চলে গেলে পুনরায় রোগীতে লক্ষণ ঠিকমত সংগ্রহ করে সঠিক ঔষধ নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু যদি অনেক বেশী লক্ষণ দেখা দেয় তবে সঙ্গে সঙ্গে বিষঘ্ন (antidote) ঔষধ দিতে হবে এবং পূর্বের স্থিতাবস্থা দেখা দিলে তবেই রোগী- বিবরণ সংগ্রহ করে সঠিক ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

এবার আসি রোগজ বৃদ্ধির কথায়। নির্বাচিত ঔষধ সঠিক না হলে সুক্ষ্মশক্তিতে দু-এক দাগ ঔষধ প্রয়োগ করায় রোগীর শরীরে ঔষধের কোন ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হবে না, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে রোগীকে ঔষধ দেওয়া না দেওয়ার ফল একই -রোগ তার আপন গতিতে এগিয়ে চলবে। ফলে রোগীর রোগ-লক্ষণ বৃদ্ধি পাবে। এই বৃদ্ধিকে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি বলে ভুল করার কোন কারণ নেই। কারণ রোগজ বৃদ্ধিতে রোগী শারীরিক ও মানসিক সব দিক থেকেই খারাপ অনুভব করে এবং সামগ্রিকভাবে অবনতির দিকেই এগিয়ে যায়। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষনের চেয়ে রোগী পরীক্ষা ক'রে তার অবস্থা বুঝতে পারার মত জ্ঞানই বেশী সাহায্য করে। চিকিৎসকের নিজের পরীক্ষালব্ধ লক্ষণ, যান্ত্রিক পরীক্ষায় নির্ণীত অবস্থা এবং ল্যাবরেটারীর পরীক্ষালব্ধ বিষয়সমূহ থেকেই রোগজ বৃদ্ধি, রোগীর আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সমূহের অবস্থা এবং রোগীর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যায়।

রোগজ-বৃদ্ধিতে অবশ্যই নতুনভাবে রোগীলিপি তৈরী করে লক্ষণ-সমষ্টির চিত্র সঠিকভাবে মিলিয়ে নতুন ঔষধ নির্বাচন করতে হবে। অবশ্য এই ব্যবস্থাপত্র আরোগ্যকারী না উপশমকারী হবে তা নির্ভর করবে রোগীর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনার উপর।

অবশ্য এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। অনেক রোগী আছেন যাঁরা ইচ্ছে করে তাঁদের কষ্টের কথা বাড়িয়ে বলেন, সামগ্রিকভাবে ভাল অনুভব করলেও তা স্বীকার করতে চান না। এসব ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধিকে রোগজ বৃদ্ধি বলে ভুল করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। হ্যানিম্যানের নির্দেশমত চিকিৎসক যদি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং রোগী লিপি অনুসরণ ক'রে প্রত্যেকটি লক্ষণ সম্পর্কে জেরা করেন তবেই এ ভুল সংশোধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাজেই, দেখা যাচ্ছে যে বৃদ্ধি-জনিত সমস্যার সমাধান চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিচক্ষণতা ও গভীর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। শুধু হোমিওপ্যাথিক বিষয়ের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়- চিকিৎসাবিজ্ঞানের সব শাখার প্রয়োজনীয় সব জ্ঞানই একজন হোমিওপ্যাথের থাকা অবশ্যই দরকার।

হৃত-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, আরোগ্য ও উপশম
(Recovery, cure and Palliation)

অসুস্থতা থেকে মুক্তিলাভ করলে তাকে সাধারণতঃ আরোগ্যলাভ করাই বলে। সে হিসাবে আরোগ্য (Cure)এবং হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার (Recovery) একই হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুটোর অর্থ এক নয়। রোগমুক্তি আপনা আপনিই হতে পারে- কোন ঔষধের সাহায্য ছাড়াই। তাকে বলে হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার। কিন্তু আরোগ্য কখনও আপনা আপনি হবে না। আরোগ্যের জন্য চাই চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রয়োগ।

অপ্রবৃত্তি (Indisposition) সব রকম তরুণ রোগ এবং সিউডো-ক্রনিক রোগ জীবনীশক্তির সংগ্রাম-ক্ষমতার প্রভাবে এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য-বিধি অনুসরণে আরোগ্য হতে পারে। রোগের উত্তেজক ও বাহক (Exciting and maintaining) কারণগুলি দূরীভূত হলে এই সব অস্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে আসে। কোন ঔষধ ব্যবহার করলেও তা আসবে, না করলেও তা আসবে। কাজেই যে কোন উপায়ে নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকে "Recovery" বলে। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই এটা ঘটে। কলেরা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, বসন্ত প্রভৃতি রোগে প্রচুর লোক মারা যায় ঠিকই কিন্তু কোন প্রকার চিকিৎসা না করলেও অনেক লোক বেঁচে যায়। কারণ, জীবনীশক্তি সংগ্রাম করে উত্তেজক কারণকে পরাভুত এবং বিতাড়িত করে। একেই বলে-"Recovery" ।

বর্ষায় ভেজার ফলে কারও যদি সর্দি হয়, সে এক কাপ কফি বা একটু ব্রান্ডি, অ্যাসপিরিন বা অ্যানাসিন জাতীয় ট্যাবলেট বা তিরিশ শক্তির রাসটক্স কয়েকটি গুলি খেয়ে শুয়ে পড়লে পরদিন সকালেই সুস্থ হয়ে উঠবে। এখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই "Recovery" হয়েছে বুঝতে হবে। কারণ, কোনো কিছু না করা এবং কফি, ব্র্যান্ডি, অ্যানাসিন বা রাস-টক্স

খাওয়া এখানে একই কথা। শুধু রাত্রের বিশ্রামটুকুই তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে জীবনীশক্তির পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখানে শরীর বৃত্তীয় বোঝাপড়া (Physiological adjustment) এর সময়টুকুই বড় কথা। এই সময়ের মধ্যে উত্তেজক কারণের প্রভাব চলে যেয়ে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। সব রকম তরুণ রোগের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। তরুণ রোগের নির্দিষ্ট মেয়াদটুকু কাটিয়ে দিতে পারলেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে। যেভাবেই এই মেয়াদটুকু কাটানো হোক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। তাই পেনিসিলিন দিয়েও নিউমোনিয়া সারে আবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়েও সারতে পারে, আবার কোন কিছু না দিয়েও সারতে পারে। কাজেই স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধে প্রকৃতির এই যে অবদান একেই "Recovery" বলে।

এই হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার (Recovery)-কে অনেকে আরোগ্য বলে ভুল করেন। তাঁরা বলেন হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্য চিকিৎসায় যদি কোনো রোগ আরোগ্য সম্ভব না হয়, তবে নিউমোনিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের শত শত রোগী প্রতিদিন আরোগ্য হচ্ছে কি করে? আসলে তাঁরা ভুলে যান যে এগুলি আরোগ্য নয়- স্বাভাবিক হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার বা Recovery। অসদৃশ ঔষধ শুধু রোগের মেয়াদটা উপসর্গহীনভাবে কাটিয়ে দিতে এবং রোগীকে উপশম দিতে সাহায্য করেছে। হ্যানিম্যান অর্গ্যাননের সর্বত্র বলেছেন, হোমিওপ্যাথি ছাড়া কোন চির-রোগ কখনো আরোগ্য হয় না। তিনি তরুণ রোগের কথা বলেন নি- কারণ রিকভারী (Recovery) কে তিনি আরোগ্য বলে মনে করেন নি। তবে যে সব তরুণ রোগের পেছনে সোরা সুপ্ত অবস্থায় থাকে- সেইসব তরুণ রোগ জটিলতার সৃষ্টি করলে সোরা জাগ্রত হ'য়েছে বুঝতে হবে। এসব ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও রোগী ঔষধ ছাড়া সুস্থ্য হবে না। এখানে সাধারণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। তেমনি চির-রোগের ক্ষেত্রেও রিকভারী (Recovery) সম্ভব নয়। কারণ চির-রোগে জীবনী শক্তির প্রতিরোধ-ক্ষমতা ধীরে ধীরে এমনভাবে হ্রাস পায় যে ঔষধের সাহায্য ছাড়া কোন রোগীতেই সুস্থতা ফিরে আসে না। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা না করলে মৃত্যু

পর্যন্ত এই রোগ চলতে থাকবে। উপযুক্ত অ্যান্টি মায়াজমেটিক ঔষধ দিয়ে এইসব রোগীকে মায়াজমজনিত অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারলে তবেই আরোগ্য সম্ভব। রিকভারী (Recovery) র ক্ষেত্রে আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে। রিকভারী (Recovery)-তে রোগী সুস্থতা ফিরে পায় বটে কিন্তু রোগ-প্রবণতা যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়। তাই বারবার একই ধরণের রোগে ভুগতে থাকে। স্থায়ীভাবে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রোগী ফিরে পায় না। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যই যদি ফিরে পাবে, তবে অতি সহজেই নানারকম তরুণ রোগে ভুগবে কেন? কাজেই, যে কোন উপায়ে সাময়িকভাবে আপাতঃস্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার নামই রিকভারী (Recovery)।

কিন্তু আরোগ্য (Cure) কথাটি খুব ব্যাপক এবং এক নিগূঢ় অর্থবহনকারী। হ্যানিম্যান অর্গাননের প্রথম সূত্রে লিখেছেন অসুস্থ লোককে তার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়াই হলো আরোগ্য। এখানে লক্ষ্য করা দরকার তিনি স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের কথা বলেছেন-স্বাস্থ্যের প্রত্যাবর্তনের কথা বলেন নি- যেটা হয় রিকভারী (Recovery)-তে

রিকভারী (Recovery)-তে হয় স্বাস্থ্যের প্রত্যাবর্তন (Return of health) আর আরোগ্য হয় স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার (Restoration of health)। কথা দুটির পার্থক্য যথেষ্ট। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে হবে, অর্থাৎ ফিরিয়ে আনতে হবে। কে করবেন? চিকিৎসক। কি ভাবে করবেন? তাঁর সুনির্বাচিত ঔষধের দ্বারা। কাজেই আরোগ্যে জীবনীশক্তি বা প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছে না- করছে ঔষধ। ঔষধ জীবনীশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে উজ্জীবিত করছে এবং জীবনীশক্তি পরোক্ষভাবে রোগকে বিতাড়িত করছে। এখানে রোগ বলতে স্বাভাবিক (Natural) এবং ঔষধজ দুইই বোঝানো হয়েছে। চিকিৎসকের দ্বারা ঔষধের সাহায্যে রোগমুক্তি ঘটছে বলেই হ্যানিম্যান স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেবার কথা বলেছেন। কাজেই আরোগ্য প্রকৃতির অবদান নয়- চিকিৎসকেরই বহু পরিশ্রমলব্ধ কৃতিত্ব। কিন্তু চিকিৎসক যদি তাঁর জীবনের এই সর্বোচ্চ আদর্শের কথা

ভুলে যান এবং আরোগ্যের সংজ্ঞার ভুল অর্থ করে ভুল পথে চালিত হন তবে রোগীকে তার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়া তো দুরের কথা, বরং রোগীর আরও বেশী ক্ষতি করে তাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না।

এই আরোগ্যের আদর্শ আবার সকলের কাছে সমান নাও হতে পারে। তাই হ্যানিম্যান আরোগ্যের সর্বোচ্চ আদর্শ কি হওয়া উচিত তাও অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করে গেছেন। তিনি বলেছেন, আরোগ্যের সর্বোচ্চ আদর্শ অনুসরণ করতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূর্ণ করা দরকার ঃ-

১। আরোগ্য হবে যথাসম্ভব দ্রুত। একটা চির-রোগের রোগীকে পাঁচ বৎসর ধরে চিকিৎসা করে আরোগ্য করলেও সেটা নিশ্চয়ই রোগীর পক্ষে মঙ্গলজনক। কারণ হোমিওপ্যাথি ছাড়া চির-রোগ আরোগ্য সম্ভব নয় বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু এই আরোগ্য যদি আমরা আরও অল্প সময়ে করতে পারি তবে সেটা নিশ্চয়ই আরও ভাল হবে। সবাই চায় দ্রুত রোগ মুক্তি। এই দ্রুততার জন্যই আজ অ্যান্টিবায়োটিক্স্ ও আধুনিক ঔষধের এত প্রাধান্য। দ্রুত কর্মক্ষমতা ফিরে পাওয়াই আজ সব রোগীর লক্ষ্য। ভবিষ্যতে কি হবে, রোগটি সম্পূর্ণ আরোগ্য হলো, তার উপশম হলো না সেটি চাপা পড়লো এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চান না। কাজেই পাঁচ বছরের জায়গায় যদি দু'বছর, এক বছর বা আরও কম সময়ে আরোগ্য করা যায় তবে সেটা নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ আদর্শ হবে। হ্যানিম্যান জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই দ্রুত আরোগ্যের উপায় নিয়ে চিন্তা করেছেন, গবেষণা করেছেন, মত পরিবর্তন করেছেন এবং পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার দ্বারা যেটা যখন ভাল বলে মনে করেছেন, অকপটে তখনই তা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই অনলস ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার সার্থক ফল আমরা দেখতে পাই অর্গ্যাননের ষষ্ঠ সংস্করণে পঞ্চাশ সহস্রতমিক পদ্ধতির প্রচলনে। আজ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি- জটিলতম চির-রোগের রোগীও এই শক্তিতে অতি অল্প সময়ে অবিশ্বাস্যভাবে আরোগ্য লাভ করে- যা ইতিপূর্বে শততমিক শক্তি প্রয়োগ করে হতে দেখিনি।

২। আরোগ্য হবে রোগীকে সবচেয়ে কম কষ্ট দিয়ে। যাঁরা হোমিওপ্যাথিতে ইনজেকশন, টনিক, স্পেসিফিক ইত্যাদির প্রচলন করতে উৎসাহী তাঁদেরকে এই কথাটা ভাল করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। যদি রোগীকে একটা মাত্র গুলি (Globule) খাইয়ে আরোগ্য করা যায়, তবে তাকে ইনজেকশন দিয়ে কষ্ট দেবার দরকার কি? স্থুলমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করলে, গৌণ বিপরীত ক্রিয়ায় (Secondary Counter action) রোগী অহেতুক কষ্ট পাবে। সেই পথ পরিহার করা উচিত না গ্রহণ করা উচিত? শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অহেতুক পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি (aggravation) ঘটিয়ে রোগীকে কষ্ট দেওয়া উচিত, না ন্যূনতম মাত্রায় তা প্রয়োগ করে রোগবৃদ্ধি যথাসম্ভব কমাবার চেষ্টা করা উচিত? এই বৃদ্ধি কমাবার জন্য হ্যানিম্যান শততমিক ঔষধের প্রস্তুত প্রণালীতে অর্গ্যাননের চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত নির্দেশিত দশটি ঝাঁকি বা আঘাতের (Succussion) পরিবর্তে পঞ্চম সংস্করণে দুটি মাত্র আঘাত দিতে বলেছেন এবং ঔষধের পুনঃ প্রয়োগেও দশবারের স্থলে দুবার মাত্র ঝাঁকি দিতে বলেছেন (Plus System)। কিন্তু তিনি দেখলেন এতেও সমস্যার সমাধান হলো না। দু'টি ঝাঁকি দিয়ে এবং "Plus System" অনুসরণ করেও রোগীর বৃদ্ধি কমানো যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তিতে। তাই আবার বললেন ঝাঁকির সংখ্যা কমাবার দরকার নেই। বরং দশটির স্থলে একশটি ঝাঁকি দিলেও ভাল হয় তবে ঔষধের লঘুকরণ আরও বেশী করতে হবে। একশ ফোঁটার মধ্যে এক ফোঁটা ঔষধের পরিবর্তে তিনি বললেন পূর্ব শক্তির পঞ্চাশ হাজার ভাগের একভাগ ঔষধ পরের শক্তিতে থাকবে। ঔষধের পুনঃ প্রয়োগেও তিনি আবার আট-দশ-বারোটা ঝাঁকি দেবার কথা বললেন।

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তিতে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি ন্যূনতম পর্যায়ে আনা যায়। এমনকি প্রয়োজনমত সেই বৃদ্ধি দমনও করা যায়। এ এক বিস্ময়কর সাফল্য। শততমিক শক্তিতে ঔষধ প্রয়োগ করে আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই

করার থাকে না। রোগী রোগ-লক্ষণ জনিত প্রচন্ড কষ্ট পেলেও তারই স্বার্থে আমাদের নীরব দর্শক হয়ে অপেক্ষা করতেই হল। কিন্তু পঞ্চাশ-সহস্রতমিক শক্তিতে তা হয় না। রোগী কষ্ট পেলে সঙ্গে সঙ্গে তার কষ্ট কমাবার ব্যবস্থা করা যায়। এটাও কি আরোগ্যের একটা সর্বোচ্চ আদর্শ নয়? কষ্ট দিয়েও আরোগ্য করতে পারা নিশ্চয়ই ভাল কিন্তু কষ্ট না দিয়ে আরোগ্য করতে পারা নিশ্চয়ই সবচেয়ে ভাল। তাই নয় কি?

৩। এই আরোগ্য হবে স্থায়ী। অর্থাৎ একবার রোগমুক্ত হলে কিছুদিন পরে সেই রোগে আবার আক্রান্ত হতে হবে না। চির-রোগের চিকিৎসায় হ্যানিম্যান এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন শুধু সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করলেই হবে না, বা শুধু রোগীর কষ্ট সমূহের সামগ্রিক চিত্র মেলালেও হবে না- আরও কিছু আছে যা রোগের পুনরাক্রমণের জন্য দায়ী। সেটা হলো মায়াজম এবং মায়াজমেটিক অবস্থা। এটাই হলো যথার্থ রোগের মূল কারণ। নির্বাচিত ঔষধে রোগীর লক্ষণ সব মিললেও এই মূল কারণ যদি দূরীভূত না হয় তবে স্থায়ী আরোগ্য হবে না। বারবার রোগ ফিরে আসবে। দীর্ঘ বারো বৎসর চির-রোগ চিকিৎসার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন। তিনি বিফল মনোরথ হয়ে তাঁর অসামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং এনামনেসিস্ বা বিশ্লেষণ দ্বারা যে সত্য আবিস্কার করলেন- আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে সেই সত্য অস্বীকার করে রোগীর ক্ষতি করতে চাই। এর থেকে লজ্জার ও দুঃখের আর কি হতে পারে?

স্থায়ীভাবে লক্ষণ দূরীভূত করা আর না করার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ এই সত্য যদি আমরা বুঝেও না বোঝার ভান করি বা অস্বীকার করি, তবে পীড়িত জনগনের দুর্দশার লাঘব হবে কি করে? চিকিৎসকের একমাত্র উদ্দেশ্য (Mission) যদি আমরা ভুলে যায় তবে হোমিওপ্যাথ হওয়ার সার্থকতা কোথায়?

৪। আরোগ্য একটা সহজে বোধগম্য নির্দিষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করে হবে। মন্ত্র-তন্ত্র, জুড়িবুটি বা নীতিহীন চিকিৎসা-লব্ধ কোন আপাতঃ আরোগ্য কখনোই সর্বোচ্চ আদর্শ হতে পারে না। জগতের সব কিছুই

একটা ছন্দবদ্ধ নিয়মের মধ্যে ঘটে থাকে। প্রকৃতির নিয়মের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হতে দেখা যায় না। কাজেই আরোগ্যে এক এক সময় এক একজনের কাছে এক এক রকমে ঘটবে এবং তার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা থাকবে না- এ হতে পারে না। এমনকি, আরোগ্য লক্ষণের যে ক্রম অনুসরণ করে ঘটবে তাও একটা নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে নীতিতে এই আরোগ্যকারী চিকিৎসা সম্পন্ন হয় তা প্রকৃতির একটি রোগ-আরোগ্যকারী নিয়মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সেই নিয়ম বা আইন (Law) হলো যে, একটা দুর্বলতার ডাইনোমিক প্রভাব আর একটি অধিকতর শক্তিশালী ডাইনামিক প্রভাবের দ্বারা স্থায়ীভাবে দূরীভূত হয়- যদি শেষেরটি প্রথমটির সহিত প্রকৃতিগতভাবে সদৃশ হয় (যদিও দুটির প্রকারভেদ থাকতে পারে)। প্রকৃতির এই নিয়মের উপরই হোমিও-চিকিৎসার আইন তৈরী হয়েছে। তা হলো "Similia Similibus Curentur অর্থাৎ- Let likes be treated by likes"

আরোগ্যের সময় লক্ষণগুলি যে নিয়মে দূরীভুত হয়, হোমিওপ্যাথিতে তা “হেরিংস ল অব কিউর” নামে খ্যাত। এই নিয়ম অনুসারে লক্ষণগুলি উপর থেকে নীচে, ভেতর থেকে বাইরে, এবং রোগ হওয়ার সময় যে ক্রম অনুসরণ করে এসেছিল তার বিপরীত ক্রম অনুসরণ করে দূরীভুত হবে। এর অর্থ হলো- অধিকতর মূল্যবান দেহযন্ত্র আগে ভাল হবে তারপর অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান দেহযন্ত্রগুলি ভাল হবে।

আরোগ্যের সর্বোচ্চ আদর্শের কথা বলা হলো। এবারে দেখা যাক আরোগ্য ও উপশমের মধ্যে কি প্রভেদ।

উপশমের চেষ্টার সমগ্র চিকিৎসা-জগৎ এমনভাবে সচেষ্ট যে আরোগ্য ও উপশম (Palliation) একাকার হয়ে গেছে। একথা অনস্বীকার্য যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপশম অপরিহার্য এবং রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের কাছেই তা একান্ত কাম্য। কিন্তু আরোগ্যোপযোগী রোগীকে ক্রমাগত উপশম দিতে থাকলে এমন সময় আসে যখন রোগীর লক্ষণ চাপা পড়তে পড়তে রোগী আরোগ্যের বাইরে চলে যায়। এ অবস্থা কাম্য তো নয়ই বরং ভয়াবহ বলা যেতে পারে। রোগী তো উপশম চাইবেই- কারণ

উপশমের ফলে রোগের লক্ষণ চাপা পড়তে পারে বা ভবিষ্যতে তার ক্ষতি হতে পারে এ তথ্য তার জানা নেই। অন্য শাস্ত্রের চিকিৎসক বন্ধুগণ যাঁরা রোগ-লক্ষণ চাপা পড়ার মতবাদে বিশ্বাসী নন তাঁরাও যে এটা করবেন, তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু হোমিওপ্যাথরা, যাঁরা প্রতিদিন রোগলক্ষণ চাপাপড়া-জনিত কুফল দেখছেন এবং চিকিৎসা করছেন তাঁরাও যদি জেনেশুনে একাজ করেন তবে সেটা অমার্জনীয় অপরাধ এবং অমানবিকতার পরিচয় বলেই মনে করি। চর্মরোগ চাপা পড়ে হাঁপানি, বাত (Rheumatic fever) চাপা পড়ে হৃদরোগ তো আমরা প্রতিদিনই দেখছি। কিন্তু কোষ্টবদ্ধতা, ডিসপেপসিয়া, অম্লাধিক্য, মাথাঘোরা, মাথার যন্ত্রণা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি সাধারণ লক্ষণ চাপা পড়তে পড়তে শেষ পর্যন্ত বৃক্কের ক্ষতি, আনুষঙ্গিক উপসর্গ হিসাবে ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশন বা রক্তচাপ-বৃদ্ধি ইত্যাদি অবস্থাও কি আমরা প্রায়ই দেখতে পাচ্ছি না? কিন্তু হায়, আমরা তাইই করে চলেছি। ভগবান যেন আমাদের সুমতি দেন। আমরা রোগীর যদি ভাল করতে নাও পারি অন্ততঃ ক্ষতি করবো না এই মানবতাবোধ যেন আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়।

যাই হোক, দেখা গেল যে উপশম ও আরোগ্য এক নয়। রোগীর লক্ষণ সমষ্টির মধ্যে দু-চারটি লক্ষণের প্রকোপ কমিয়ে দেওয়াকে উপশম বলে। উপশম যেন গাছের শাখা-প্রশাখা কেটে ফেলে গাছটাকে উপড়ে ফেলার প্রচেষ্টা। রোগ-বৃক্ষ থেকে শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ দু'চারটি লক্ষণ কমিয়ে দিলে রোগ দূরীভূত হবে না। একটা রোগী হয়ত অনেকগুলি লক্ষণ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে এলো। তার মধ্যে একটা লক্ষণ হলো- অম্লাধিক্য, যা বিকেল চারটা থেকে আটটার মধ্যে বাড়ে। শুধু ঐ একটা লক্ষণের উপর ভিত্তি করে তাকে লাইকোপডিয়াম দিলে অম্ল একটু কমবে নিশ্চয়ই। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার বৃদ্ধি পাবে। তবে এবার হয়ত বৃদ্ধির সময়ের পরিবর্তন হবে। বিকেল চারটে থেকে আটটার মধ্যে বৃদ্ধি না হয়ে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত্রি দশটার মধ্যে বা অন্য কোন সময়ে বৃদ্ধি পাবে। হোমিওপ্যাথির সুবিধা এই যে একটা মাত্র লক্ষণ মিলিয়ে ঔষধ দিলেও সেই একটা লক্ষণ অন্ততঃ সাময়িকভাবে হলেও কমবে। তা না হলে সদৃশ

বিধানই তো মিথ্যা হয়ে যাবে। কিন্তু এইভাবে এক-দুই বা চারটি লক্ষণ কমাবার চেষ্টাই কি হোমিওপ্যাথি? লক্ষণ-সমষ্টির চিত্র যে চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগ বলে গণ্য করা হয় এবং লক্ষণ-সমষ্টিচিত্রের বিলুপ্তিই যেখানে আরোগ্য বলে স্বীকৃত, সেখানে দু-চারটি লক্ষণ মিলিয়ে কষ্টের উপশম দেওয়া কি ধরণের হোমিওপ্যাথি পাঠকগণকে তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

অবশ্য লক্ষণ-সমষ্টির চিত্র উদ্ধার করা এবং সেইমত চিত্র মিলিয়ে ঔষধ নির্বাচন অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। দু'ঘন্টায় পঞ্চাশ বা একশ রোগী দেখে তা করা সম্ভব নয় এটাও ঠিক। কিন্তু তাই বলে কি আমরা চেষ্টা না করে ভুলপথে চলবো? এমনকি লক্ষণ-সমষ্টির আপাতঃ চিত্র মিলিয়ে ঔষধ দিলেও আরোগ্য না হয়ে উপশম হতে পারে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এর কারণ, রোগের মূল- উৎস দূরীভুত না হওয়া বা উত্তেজক ও বাহক কারণগুলি বা তাদের কুফলজনিত অবস্থা বর্তমান থাকা।

একটা একজিমার রোগীকে চুলকানী ও আঁঠাজাতীয় রস পড়ার লক্ষণ দেখে গ্রাফাইটিস দিলে চুলকানীটা হয়ত একটু কমবে এবং রসটা কিছুদিনের জন্য জলীয় হবে বা বন্ধ থাকবে। এটা উপশম। আবার তার অন্যান্য সব লক্ষণ, এমনকি মানসিক এবং সামগ্রিক লক্ষণ মিলিয়ে সালফার দেওয়া হলো- কিছুদিন পরে সব লক্ষণগুলি চলে গেল এবং রোগীও বেশ সুস্থ অনুভব করলো। কিন্তু মাস তিন-চার পর আবার একজিমা দেখা দিল। কারণ? রোগের পেছনের সব কারণগুলির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় নি। হয়ত তার অতীত ইতিহাসে গণোরিয়া আছে, সেক্ষেত্রে থুজা, মেডোরিণাম্ ইত্যাদি কোন অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ না দিলে আরোগ্য হবে না। অথবা উপর্যুপরি টিকা দানের ইতিহাস থাকলে থুজা বা টিকার কুপল দূরকারী কোন ঔষধ না দিলে আরোগ্য হবে না। অথবা হয়তো রোগী মাতৃগর্ভে থাকাকালে মায়ের গর্ভকালীন টক্সিমিয়া এবং ত্বকের অ্যালার্জি ছিল। এক্ষেত্রে থাইরয়েডিনাম বা ঐ জাতীয় কোন ঔষধ না দিলে প্রতিবন্ধকটা দূর হবে না। শৈশবে হয়ত মারাত্মক হামজ্বর

হয়েছিল- তারপর থেকে একজিমা দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে একমাত্রা মরবিলিনাম দিয়ে তবে লক্ষণ সদৃশ ঔষধ দিতে হবে। অন্যথায়, আরোগ্য হবে না। মোটকথা লক্ষণ-সমষ্টি ও তৎসহ যাবতীয় কারণগুলি যদি অপসারিত হয়, তবেই আরোগ্য হবে। অন্যথায় উপশম আর উপশম-এই চলতে থাকবে।

আজকাল যে তিন-চারটে ঔষধ একসঙ্গে দেবার বা মাদার টিনচার ইত্যাদি ব্যবহার করার এত প্রবণতা দেখা দিয়েছে এর কারণ হ'লো এই উপশম দেবার প্রচেষ্টা। এর ফলে অল্প সময়ে প্রচুর রোগী, প্রচুর অর্থ ইত্যাদি সবই হতে পারে কিন্তু প্রকৃত আরোগ্য সারা জীবনে একটা রোগীতেও হয়ত সম্ভব হবে না। হোমিওপ্যাথের কাছে লোকে উপশমের জন্য আসেন না, আসেন আরোগ্যের জন্য। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় আমরা তাঁদের ঠকাই এবং ঠকাই হোমিওপ্যাথের ভেক ধারণ করে।

ঔষধজ কৃত্রিম রোগ এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তার ভূমিকা

জীবন্ত মানবদেহে ঔষধ প্রয়োগের ফলে, শরীরবৃত্তিয় ক্রিয়ায় এবং অদৃশ্য ডাইনামিক স্তরে কিছু পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনগুলি যেমন প্রদত্ত ঔষধের গুণ ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে- তেমনি নির্ভর করে ব্যক্তির রোগ-প্রবণতার উপরেও। শরীরে বিষের প্রবেশ, দৈবাৎ গৃহীত স্থূলমাত্রার ঔষধ এবং হোমিওপ্যাথির সুক্ষ্ম শক্তির ঔষধ এ সবই জীবন্ত মানবদেহে পরিবর্তন সৃষ্টি করতে সক্ষম। পরিবর্তনের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, পরিবর্তিত অনুভুতি ও ক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে দেহের গঠনগত পরিবর্তন মিলিত হয়ে একটি রোগের সৃষ্টি করে, যাকে কৃত্রিম ঔষধজ রোগ বলে। যত সময় ধরে ঔষধ প্রয়োগ চলেছে, এই কৃত্রিম ঔষধজ রোগের স্থায়িত্বকাল নির্ধারণে সেটিই প্রধান নিয়ামক।

চিকিৎসক হিসাবে একটা ঔষধকে আমদের জানতে হবে সব কটি দৃষ্টিকোণ থেকে-বিষক্রিয়াজনিত (Toxicological) লক্ষণ থেকে শুরু করে মাত্রাকৃত ঔষধের প্রয়োগজনিত সুক্ষ্ম পরিবর্তন পর্যন্ত। এই সব লক্ষণ ও সঙ্কেত থেকে যে সামগ্রিক রূপ আমরা পাই সেটিই একটি কৃত্রিম ঔষধজ রোগের পরিচয়।

প্রুভিংকৃত ঔষধগুলির শুধু ক্রিয়াঘটিত লক্ষণ সমষ্টিই (Symptoms of dynamic Pathology) হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকায় আছে। হোমিওপ্যাথিক ড্রাগ-প্রুভিং এই স্তরের বেশী এগোতে পারেনি। কিন্তু কোনো রোগীতে একটি ঔষধের ক্রিয়া-ঘটিত লক্ষণগুলির সামগ্রিক চিত্র (Totality) পেলেই আমরা নিঃসঙ্কোচে ঔষধটি নির্বাচন করে থাকি। হোমিওপ্যাথিতে আরোগ্য-বিজ্ঞান (Therapeutics)-এর বইয়ের বিশেষ ব্যবহার্যতা না থাকার কারণ হলো হোমিওপ্যাথিক ঔষধের লক্ষণাবলীতে গঠনগত লক্ষণের অনুপস্থিতি। কয়েকটি শরীর যন্ত্রের উপর ভীষণভাবে ক্রিয়াশীল, প্রত্যেক বিশেষ (Nosological) রোগাবস্থায় সম্ভাব্য সব ঔষধের একটি করে তালিকা প্রচলিত থেরাপিউটিকস বইতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, কোন বিশেষ রোগাবস্থার

জন্য নির্ধারিত ঔষধগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রায় আদৌ কাজে আসে না। বরং ঐ তালিকায় অন্তর্ভূক্ত নয় এমন বেশ কিছু ঔষধ সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। স্বভাবতঃই আমরা রোগচিত্রের সঙ্গে ক্রিয়াগত সাদৃশ্যসম্পন্ন ঔষধ-চিত্রের সাহায্যে অর্থাৎ রোগের ডাইনামিক প্যাথলজির সঙ্গে ঔষধের ডাইনামিক প্যাথলজির সমতা রক্ষা করে রোগ-নিরাময়ের সঠিক চাবিকাঠি খুঁজে নিই। একটি ঔষধের পূর্ণ চিত্র পেতে গেলে আমাদের তার বিষক্রিয়াজনিত ও শারীরবৃত্তিয় লক্ষণ ও সঙ্কেতগুলির এবং যখন, যেভাবে লভ্য তার আনুষঙ্গিক লক্ষণ (side effect) গুলিরও সাহায্য নিতে হবে। আর্সেনিক, নাইট্রিক অ্যাসিড, ওপিয়াম, ল্যাকেসিস, এপিস প্রভৃতি ঔষধ এবং সমস্ত নোসোড সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অংশত আমরা নিঃসন্দেহে লাভ করি তাদের বিষক্রিয়ার প্রকাশ, দৈবাৎ ঘটিত প্রুভিং, নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর উপর প্রুভিং, আরোগ্য গবেষণায় স্থূলমাত্রার ঔষধের প্রধান ও আনুষাঙ্গিক ক্রিয়া এবং নোসোড উৎপাদনকারী রোগের লক্ষণাবলী থেকে। কাজেই, এইসব ঔষধের ড্রাগ প্রুভিং-এর লক্ষণের সঙ্গে আমরা স্থূল বিষক্রিয়াজনিত এবং নোসোড উৎপাদনকারী রোগ লক্ষণ সমূহ নির্দ্ধিধায় যোগ করতে পারি।

এপিস ও ল্যাকেসিসের লক্ষণগুলির সঙ্গে তাই মৌমাছির ও বিষধর সাপের কামড়ে সৃষ্ট লক্ষণগুলির এবং আর্সেনিক ও ওপিয়ামে তাদের প্রুভিং-লব্ধ লক্ষণের সঙ্গে বিষক্রিয়াজনিত লক্ষনগুলি যুক্ত করা দরকার। যক্ষ্মা, জলাতঙ্ক, সিফিলিস ইত্যাদি রোগের লক্ষণাবলী, একই কারণে যথাক্রমে টিউবারকুলিনাম লাইসিন ও সিফিলিনামের প্রুভিং লব্ধ লক্ষণের সঙ্গে যোগ করতে হবে।

এভাবে যদি আমরা সব ঔষধের ক্রিয়া সবকটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নির্ণয় বা নিরূপণ করতে পারি, তবেই হয়ত আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ রোগ-চিকিৎসা-বিজ্ঞান (Therapeutics) পেতে পারব এবং রোগের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধীয় শর্তগুলি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান শুধু তখনই ছাত্ররা তা থেকে পেতে পারবে। তবে যে কোন রোগীর জন্য ঔষধ নির্বাচনের ব্যষ্টিবাদ নির্ভর সনাতন হোমিওপ্যাথিক নীতির অবশ্যই কোন পরিবর্তন হবে না। রোগ যাই হোক না কেন, আমাদের রোগী স্বাতন্ত্রীকরণ করতেই হবে। এটা আবার নির্ভর করে রোগীর Subjectiveও objective লক্ষণ-সব মিলিয়ে পাওয়া লক্ষণ সমষ্টির (totality of symptoms) এর উপর।

ক্রিয়াগত লক্ষণ, গঠনগত পরিবর্তন এবং ল্যাবরেটরী থেকে প্রাপ্ত অস্বাভাবিকতারূপ লক্ষণ সবই এর মধ্যে পড়ে। তবে একটি ঔষধের স্বাতন্ত্রীকরণে ক্রিয়াগত লক্ষণগুলির উপরই আমাদের বেশী নির্ভর করতে হয়। স্বভাবতঃই আমাদের সযত্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঔষধচিত্রের সঙ্গে রোগচিত্রের সাদৃশ্য সবসময় সঠিক নাও হতে পারে। তবু, হোমিওপ্যাথিক ড্রাগ প্রুভিংই প্রুভারের জীবন বিপন্ন না করে ঔষধ-চিত্র নিরূপণের একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা।

দেহের সর্বত্র ক্রিয়াশীল (Polychrest) অনেক ঔষধ প্রুভিং এর সময় এক হাজারেরও বেশী লক্ষণ সৃষ্টি করে। কোন চিকিৎসকের পক্ষে নিশ্চয়ই একটি বিশেষ ঔষধের সবকটি লক্ষণ মনে রাখা সম্ভব নয়। প্রুভিংকৃত ঔষধগুলি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য আমরা তাহলে কি করি? আমরা কৃত্রিম ঔষধজ রোগের একটা চিত্র খাড়া করার চেষ্টা করি। যে ধরণের শারীরিক গঠনসম্পন্ন (Constitution) প্রুভারে ঔষধটি সর্বাধিক লক্ষণ প্রকাশ করেছে, যে লক্ষণগুলি অধিকাংশ প্রুভারে দেখা গেছে, বিশেষ করে বিভিন্ন modalities সহ সাধারণ লক্ষণগুলি, অদ্ভুত ও বিরল লক্ষণগুলি এবং ঔষধের ক্রিয়ায় সর্বাধিক প্রভাবিত শরীর যন্ত্রগুলি- এ সবই ঐ চিত্র নির্মাণের ভিত্তিস্বরূপ। ঔষধজ রোগের চিত্রটিই ঔষধ নির্বাচনে আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। যেখানেই আমরা অনুরূপ রোগচিত্র পাই, সেখানে তখনই অনেক ঔষধের মধ্যে থেকে অনুরূপ লক্ষণ সম্পন্ন ঔষধটি বেছে নিই। এইভাবে আমরা আরোগ্য বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক নীতি (Therapeutic law of nature) অনুসারে স্বাভাবিক রোগ নিরাময়ে কৃত্রিম ঔষধজ রোগকে ব্যবহার করে থাকি। কৃত্রিম ঔষধজ রোগ অবশ্য সবসময়েই বেশী শক্তিশালী। কারণ, তারা চিকিৎসকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণেই জীবন্ত মানবদেহকে নিঃশর্তভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই কৃত্রিম ঔষধজ রোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্ভব নয়। ঔষধজ রোগের লক্ষণসমষ্টিই তাই আমদের একমাত্র পথ প্রদর্শক। লক্ষণ সমষ্টিই রোগের একমাত্র নিরাময়োপযোগী এবং ঔষধের একমাত্র নিরাময়কারী আঙ্গিক-অর্গ্যাননের এই সত্য এতেই প্রমাণিত হয়। একটি রোগের লক্ষণসমষ্টিকে কৃত্রিম ঔষধজ রোগের লক্ষণসমষ্টির সাহায্যে দূরীভুত করার নামই আরোগ্য-যে কোন চিকিৎসকের যা একমাত্র লক্ষ্য।

ড্রাগ-প্রুভিং কালে প্রাপ্ত লক্ষণগুলির সযত্ন বিশ্লেষণ (anamnesis) -এর মাধ্যমে মায়াজমেটিক জটিল রোগ চিকিৎসায়ও কৃত্রিম ঔষধজ-রোগের ভুমিকা নিরূপণ করা যায়। রোগীর ইতিহাস (অ্যানামনেসিস বা বিশ্লেষণ) এবং ঔষধের লক্ষণ-সমূহ থেকে মহামান্য হ্যানিমান অ্যান্টিসোরিক, 'অ্যান্টি-সাইকোটিক ও অ্যান্টি সিফিলিটিক ঔষধ সমূহের একটি সন্তোষজনক তালিকা প্রস্তুত করতে সমর্থ হন। আমাদের অভিজ্ঞাতায় আমরা দেখি যে আধুনিক যুগে একাধিক মায়াজমের সংমিশ্রণে সৃষ্ট রোগই বেশী। যেমন, ক্যান্সার রিউম্যাটয়েড আরথ্রাইটিস, স্পন্ডিলাইটিস, লিউপাস এরিথিমেটোসাস ইত্যাদি। কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত মিশ্র মায়াজমেটিক রোগের কোন সন্তোষজনক ঔষধ-তালিকা প্রস্তুত করতে পারিনি। স্বভাবতঃই, এই ধরণের রোগকে অনেক ঘোরালো পথে সারিয়ে তুলতে বেশ সময় লাগে। মহাত্মা হ্যানিমানের সময়ের তুলনায় এখন হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকায় ঔষধের সংখ্যা অনেক বেশী। কাজেই মিশ্র মায়াজমের রোগের চিকিৎসায় সম্ভাব্য সফল ঔষধগুলিকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। অবশ্য, যাঁরা রোগের মায়জমভিত্তিক ধারণায় অবিশ্বাসী, তাঁরা এই প্রচেষ্টার অসার্থকতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবেন এবং ঔষধের স্থূল ক্রিয়াতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাইবেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনো ব্যবহারিক জীবনে কোন জটিল মায়াজমেটিক রোগকে অ্যান্টি মায়াজমেটিক ঔষধ ছাড়া ভাল হতে দেখিনি। ক্রনিক রিউম্যাটিসমের কোন সিফিলিটিক রোগীকে তার পালসেটিলার সব লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও শুধু পালসেটিলা দিয়েই আরোগ্য করা সম্ভব কি? এই ধরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য একটি অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ যা পালসেটিলার লক্ষণগুলি মোটামুটি কভার (পূরণ) করে (যেমন সিফিলিনাম) দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

কৃত্রিম ঔষধজ-রোগ, বিষঘ্ন (antidote,) পূর্ণতাদায়ী (Complementary), সমগোত্রীয় cognate) এবং বিরোধী (inimical) -এই বিভিন্ন ধরণের ঔষধের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণেও সাহায্য করে।

স্থূল-বিষঘ্ন ঔষধ (Physiological antidote) আমাদের বিশেষ কাজে আসে না। কারণ মাত্রাকৃত একটি ঔষধের প্রভাবকে স্থূল বা মাত্রাকৃত সুক্ষ্ম অ্যান্টিডোট দিয়ে দূরীভুত করা দুঃসাধ্য। একটি ঔষধের স্থূল প্রভাব ঐ

ঔষধের (Potentised) এক বা কয়েক মাত্রা প্রয়োগেই দুর করা যায়। কিন্তু খুব উচ্চশক্তি সম্পন্ন, বিশেষতঃ নোসোড শ্রেণীভুক্ত কোন ঔষধের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট কুফল ঐ ঔষধই কম শক্তিতে দু-এক মাত্রার সাহায্যে কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত বা আপাতরুদ্ধ করা গেলেও মাত্রাকৃত অন্য ঔষধের সাহায্যে তাকে দূরীভুত করা খুবই শক্ত। উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্য, শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া এবং ঔষধের সুক্ষ্ম-শক্তির ক্রিয়া- এ সবই আমাদের সমগোত্রীয়, পূর্ণতা দায়ী ও বিরোধী ঔষধের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে।

কোন ঔষধেয় একটি মাত্রার ক্রিয়াকালের স্থায়িত্ব ড্রাগ-প্রুভিং এর সময়ে লক্ষণ সমূহের আবির্ভাব ও প্রস্থানের সযত্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিরূপিত করা যায়। একটি ঔষধের ক্রিয়াকালের স্থায়িত্ব অবশ্যই জানা থাকা দরকার। কারণ, প্রায়শঃই আমরা প্রথম ব্যবস্থাপত্রের কার্য্যকাল শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের নির্দেশ দিই এবং রোগীর ক্ষতি করি। সঠিকভাবে নির্বাচিত হলেও চির-রোগে লাইকোপোডিয়ামের মতো কোন গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ প্রয়োগের এক সপ্তাহ বা দশদিনের মধ্যে যদি আমরা দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের নির্দেশ দিই তবে হয়ত ভুল করা হবে।

সবশেষে আয়াট্রোজেনিক রোগ সম্বন্ধে দু-চার কথা আলোচনা করা যাক। একথা আমরা সবাই জানি যে স্থুল অথবা মাত্রাকৃত সুক্ষ্মশক্তির যে কোন ঔষধ দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহারের ফলে মানবদেহে একটি ঔষধজ জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। একে আয়াট্রোজেনিক রোগ বলে। পেটেন্ট ঔষধ, অ্যান্টিবায়োটিকস্, সালফা-ড্রাগস, ট্রানকুলাইজার, স্টেরয়েড, আজকের দিনের অন্যান্য ম্যাজিক ঔষধ এবং সেই সঙ্গে মাত্রাকৃত সুক্ষশক্তির হোমিওপ্যাথিক ঔষধের যথেচ্ছ প্রয়োগ এই ধরণের অসংখ্য জটিল রোগের কারণ। এরা আজ সংখ্যায় এত বেশী যে, প্রায় প্রতিদিনই আমরা এ ধরণের রোগীর সম্মুখীন হচ্ছি। এটা আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রেরই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেখা যাক, মেটিরিয়া মেডিকালব্ধ কৃত্রিম ঔষধজ-রোগের জ্ঞান এই ধরণের রোগের চিকিৎসায় কি সাহায্য করে? সমস্যাটা একটু সহজ হয়ে দাঁড়ায় যদি আমরা রোগীর ইতিহাস থেকে তার বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী ঔষধটি খুঁজে বের করতে পারি। লভ্য হলে ঐ ঔষধটিই মাত্রাকৃত অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্ট্রেপটোমাইসিনের অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট একটা স্থায়ী ঘুর্ণিরোগ (vertigo)-এর রোগীতে দুই-এক মাত্রা তিরিশ বা দু'শ শক্তিসম্পন্ন স্ট্রেপটোমাইসিন দিলেই আরোগ্য হবে। কিন্তু ঐ ঔষধটি যদি মাত্রাকৃত অবস্থায় লভ্য না হয়, তখন

পূর্ববর্তী ঔষধের কুফল দূর করতে আমরা নাক্স-ভমিকা বা ক্যাম্ফর প্রভৃতি অন্য ঔষধের সাহায্য নিতে পারি। এই ধরণের শত শত রোগী আছে কিন্তু আমি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই বলেই আয়াট্রোজেনিক রোগের চিকিৎসায় কৃত্রিম ঔষধজ রোগের (মেটিরিয়া মেডিকা বর্ণিত) ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করছি। হোমিওপ্যাথিক ঔষধজ রোগ সম্পর্কে জ্ঞানের ব্যবহার আমরা তখনই করতে পারি যখন রোগী পূর্ববর্তী হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের দেওয়া শক্তি ও মাত্রার উল্লেখসহ সমস্ত ব্যবস্থাপত্র সঙ্গে নিয়ে আসেন। ঐ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে রোগীর কি কি লক্ষণ ছিল এবং চিকিৎসা চলাকালে কি কি নতুন লক্ষণের আবির্ভাব হয়েছে তা আমাদের যত্নসহকারে অনুধাবন করতে হবে। তখনই দেখা যায় যে, রোগীর লক্ষণ-সমষ্টি লাইকোপোডিয়াম, ল্যাকেসিস, সিপিয়া বা নেট্রাম মিউরের চিত্র দিলেও এটাই তার মৌলিক রোগ চিত্র নয়। এটা ভুল বা সঠিকভাবে নির্বাচিত এই ধরণের কোন একটি ঔষধের দীর্ঘকালস্থায়ী যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলশ্রুতিমাত্র। এসব ক্ষেত্রে, ঔষধ লক্ষণগুলি দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কোন ঔষধ নির্বাচনই করা উচিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে শুধু প্লাসেবোই রোগ-আরোগ্যের পক্ষে যথেষ্ট। যদি তা নাও হয়, তবুও ঔষধজনিত লক্ষণের প্রস্থান ঘটলে তবেই মূল রোগ লক্ষণগুলি প্রকট হবে এবং তখনই রোগীর লক্ষণ-সমষ্টির উপর নির্ভর করে আমরা ঔষধ-নির্বাচন করতে পারব। হোমিওপ্যাথিতে আয়াট্রোজেনিক রোগের চিকিৎসায় কৃত্রিম ঔষধজ রোগ সম্পর্কে জ্ঞান এইভাবেই আমাদের প্রভূত সাহায্য করে।

অন্ততঃ দেহের সর্বত্র ক্রিয়াশীল (Polychrest) ঔষধগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করলেই, অধিকাংশ জটিল ও পুরাতন রোগীতে এমনকি, সবচেয়ে দুরারোগ্য কৃত্রিম-জটিল রোগীতেও আমরা সেগুলিকে নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবহার করতে পারব। স্বাভাবিক রোগের চিকিৎসায় এবং আরোগ্যে কৃত্রিম ঔষধজ রোগ সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। এটা অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো। যে কাঁটাটি তুলতে হবে সেটি হল স্বাভাবিক রোগ। ঔষধজ রোগ হল আরও শক্তিশালী কাঁটা যা দিয়ে আগের কাঁটাটি তুলতে হবে। তাই ঔষধজ রোগের সমস্ত বৃত্তান্তই আমাদের মনে রাখা দরকার।

কাজটা নিঃসন্দেহে শক্ত, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক রোগ-আরোগ্যের এটাই একমাত্র সম্ভাব্য পথ। পথটি দুর্গম ও কষ্টকর বলেই কি আমরা সেইপথ পরিত্যাগ করবো ?

রোগ নয়, রোগীর চিকিৎসাই হোমিওপ্যাথি

হোমিওপ্যাথির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই এমন কি বহু রোগীও উপরোক্ত মন্তব্যের সঙ্গে সুপরিচিত। কাজেই এ বিষয়ে আলোচনা আপাতদৃষ্টিতে নিরর্থক বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু বর্তমান যুগের হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্য এই বিষয়ের পুনঃপুনঃ আলোচনার একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠেছে বলেই আমি মনে করি। বিশেষ করে Practice of Medicine, Surgery, Pathology, Obstetrics and Gynaecology প্রভৃতি বিষয়ে বিশদভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথদের কাছে রোগের চিকিৎসা না করে রোগীর চিকিৎসা করার কথা অবাস্তব বলে মনে হওয়াই খুব স্বাভাবিক।

প্রথমেই দেখা যাক রোগী ও রোগ এর মধ্যে প্রভেদ কি/রোগী হলো একজন অসুস্থ মানুষ যার মধ্যে কতকগুলি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এই রোগী চিকিৎসকের কাছে আসে এই আশা নিয়ে যে চিকিৎসক তার অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি দূর করে তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেবেন। শরীরের কোন যন্ত্রের অসুখ, কি কারণে সেই যন্ত্র অসুস্থ হলো, সেই যন্ত্রে কি পরিবর্তন হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে জানতে রোগীরা মোটেই উৎসাহী নয়। তারা শুধু চায় তাদের অস্বাভাবিক লক্ষণগুলি যাতে চলে যায়। আজকাল যে রোগীরা রোগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতে আগ্রহী হয় তার জন্য আমরাই দায়ী। আমরাই তাদেরকে রোগ তথা যান্ত্রিক পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছি।

এবার দেখা যাক রোগ বলতে কি বোঝায়? রোগ হলো অস্বাভাবিক লক্ষণগুলির একটি নামকরণ। রোগীর লক্ষণ-সমষ্টির দ্বারা যদি একটা নামকরণ না করা যায় তবে তার রোগ হয়েছে বলে গণ্য করা হয় না- এবং লক্ষণগুলি রোগীর কল্পনাপ্রসূত বা মানসিক দূর্বলতা, দুশ্চিন্তা, নৈরাশ্য, ভয় ইত্যাদির প্রকাশ বলে মনে করা হয়। স্বভাবতঃই এই সব রোগীকে তাদের মনস্তুটির জন্য যা হোক কিছু একটা ঔষধ দেওয়া ছাড়া চিকিৎসকের আর কিছু করণীয় থাকে না। এইসব রোগ না থাকা রোগী

কিন্তু উত্তরোত্তর অবনতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এমন কি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও বরণ করে- কোন প্রকার তথাকথিত রোগ ছাড়াই। অনেক ভাগ্যবান রোগী হয়ত মৃত্যুর ২/১ মাস আগে এইটুকু জেনে কৃতার্থ হয় যে তার ক্যানসার হয়েছে এবং রোগটা এত বেশী এগিয়ে গেছে যে কোন প্রকার চিকিৎসাতেই কোন ফল হবে না। অর্থাৎ মৃত্যুদন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর মত সেই রোগী তার অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়। ছয় মাস আগে তার রোগ ছিল না- কিন্তু অস্বাভাবিক লক্ষণ ছিল। আজ তার ক্যানসার রোগ নির্ণয় হলো কিন্তু অস্বাভাবিক লক্ষণ তার আগেও যা ছিল আজও তাই আছে। কাজেই আমরা দেখলাম রোগ ছাড়া রোগী সম্ভব, কিন্তু রোগী ছাড়া রোগ সম্ভব নয়।

কাজেই রোগের চিকিৎসা করতে হলে প্রবন্ধে বর্ণিত রোগীর চিকিৎসা হবে না- সাময়িক কষ্টের উপশম ছাড়া। কিন্তু রোগীর চিকিৎসা করলে ক্যানসার হওয়ার পূর্বেই তার সুচিকিৎসা হতো এবং তার হয়ত কোনদিনই ক্যানসার হতো না। তথাকথিত রোগ নির্ণয়ের বহু পূর্বেই লোকটি অসুস্থ ছিল কিন্তু কোন যান্ত্রিক পরিবর্তন ধরা পড়েনি বলেই তার রোগের কোন নামকরণ সম্ভব হয় নি- ফলে আরোগ্য লাভের উপযুক্ত কোন চিকিৎসাই তার হয় নি। কিন্তু প্রথম যেদিন লোকটির মধ্যে অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন থেকেই সে রোগী। এই রোগীর চিকিৎসাই আমাদের করতে হবে। তাই হ্যানিম্যান অর্গ্যাননের প্রথম সূত্রে বলেছেন- "Physician's only mission is to restore the sick to health".

রোগ নির্ণয় করতে যেয়ে রোগীর প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশের দিন থেকে যান্ত্রিক পরিবর্তন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয় যার ফলে সহজসাধ্য রোগীও দুরারোগ্য হয়ে পড়ে। যান্ত্রিক পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত যে "Dynamic Pathology" তা আমরা কোন Pathology বা Practice of Medicine গ্রন্থে পাই না। সেই Pathology পাওয়া যায় যে গ্রন্থে তা হলো হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা। হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকায় রোগ-চিত্র নেই-আছে রোগী-চিত্র। লাইকোপোডিয়াম ক্যালকেরিয়া, সালফার, থুজা প্রভৃতি রোগীকে আমরা

দেখতে পাই মেটেরিয়া মেডিকায়। একেবারে প্রাথমিক পরিবর্তনের দিন থেকে যান্ত্রিক পরিবর্তনের শুরু পর্যন্ত রোগীর প্রতিচ্ছবি আছে হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকায়। এই সব ভেষজ রোগীর ছবি যখন আমরা স্বাভাবিক রোগগ্রস্থ (Natural Diseases) রোগীতে পাই তখন তার যে যন্ত্রই আক্রান্ত হয়ে থাকুক না কেন সদৃশ লক্ষণ সম্পন্ন ভেষজ-রোগী স্বাভাবিক রোগগ্রস্থ রোগীকে আরোগ্য করবেই-অবশ্য যদি তার আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা থাকে। Dynamic এবং Organic Pathology-র এমন সার্থক ছবি আর কোথায় পাওয়া যাবে হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা ছাড়া? আমাদের মেটিরিয়াতে কি রোগ আছে? আমাদের ঔষধ কি Test Tube-এর মধ্যে জীবাণু মারতে পারে? নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, লিভার সিরোসিস, পেপটিক আলসার প্রভৃতি রোগ Drug proving-এর সময় কোনো হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগে তৈরী হতে দেখা যায় নি। মেটিরিয়া মেডিকা পিউরায় কোন রোগের কথা লেখা নেই- আছে অস্বাভাবিক লক্ষণসমূহের বিবরণ-যা সুস্থ শরীরে ঔষধ প্রয়োগের ফলে দেখা দিয়েছিল। ল্যাকোসিস, মার্কসল, সিপিয়া, ফসফরাস প্রভৃতি রোগ নয়- রোগী। তেমনি টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, লিভার সিরোসিস, মাইট্রাল ষ্টেনোসিস প্রভৃতি রোগী নয়- রোগীর অন্ত্রের, ফুসফুসের লিভারের, হৃৎপিন্ডের যান্ত্রিক পরিবর্তনজনিত এক একটা অবস্থা- যা ব্যাপটিসিয়া, ফসফরাস, লাইকোপডিয়াম, সালফার প্রভৃতি ভেষজ-রোগীতে ঘটতে পারে। তাই এক সালফার রোগীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই একাধারে টাইফয়েড, কলেরা, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, লিভার সিরোসিস বা মাইট্রাল ষ্টেনোসিস- প্রভৃতি অনেক রোগকে। সালফার একটা রোগী যার তথাকথিত অনেক প্রকার রোগ হতে পারে। তেমনি অস্বাভাবিক লক্ষণ-সমষ্টি সম্পন্ন একটা রোগীর এক বা একাধিক যান্ত্রিক রোগ দেখা দিতে পারে। সালফার যেমন যক্ষ্মা বা সিরোসিস নয় তেমনি একটা রোগীও কখনও যক্ষ্মা বা সিরোসিস হতে পারে না। হোমিওপ্যাথিক কোন ঔষধই Test-Tube এর মধ্যে জীবাণু ধ্বংস করতে পারে না কিন্তু রোগীতে প্রয়োগ করলে B.Coli, কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সব রোগের জীবাণুই ধ্বংস হয়। তা যদি না হতো তবে এই সব রোগ আমরা আরোগ্য করি কি উপায়ে? সালফার

B.Coli, T.B., Malarial Parasite ধ্বংস করতে পারে কিন্তু সালফার মানেই B.Coli বা T.B নয় এবং B.Coli, T.B., M.P মানেই সালফার নয়।

ঔষধ চিত্রের সহিত রোগী-চিত্রের সাদৃশ্য থাকলে তবেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু লক্ষণ সমষ্টির সাদৃশ্য না থাকলে Tuberculinum, Tubercle Bacilli ধ্বংস করতে পারে না বা Sulphur B. Coli রোগীকে আরোগ্য করবে না- যে কোন শক্তিতে যতবার খুশী প্রয়োগ করা যাক না কেন।

সুস্থ অবস্থায় যেমন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপাতসাদৃশ্য সত্ত্বেও স্বাতন্ত্র বর্তমান, অসুস্থ অবস্থায়ও তেমনি প্রত্যেকটি রোগী অনুরূপ আর সব রোগীর থেকে স্বতন্ত্র। সব রোগীই যদি রোগাক্রান্ত অবস্থায় একই রকম লক্ষণ দেখাত, তবে হয় সব রোগী ভাল হয়ে যেতো না হলে সবাই মারা যেত। কিন্তু তা হয় না। একই ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত দশজন রোগী দশরকম লক্ষণ সমষ্টি প্রকাশ করে-যদিও সকলের মধ্যে ডায়াবেটিসের সাধারণ লক্ষণগুলি কমবেশী বিদ্যমান থাকে। কেউ বা অনেকবার প্রস্রাব করে, কেউ বারে কম কিন্তু পরিমাণে বেশী প্রস্রাব করে, কেউ দিনে বেশী, কেউ রাত্রে বেশী প্রস্রাব করে, কেউ বা প্রস্রাব মোটেই বেশী করে না, অথচ রক্তে শর্করা অনেক বেশী। কেউ মিষ্টি, কেউ টক, কেউ বা লবণ খেতে পছন্দ করে। কারও জলপিপাসা খুব বেশী, কারও বা একেবারেই নেই, কেউ শীত কাতর, কেউ গ্রীষ্মকাতর, কারও ঘাম খুব বেশী, কারও বা কম-এই রকম বহু পার্থক্য প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে। ডায়াবেটিসের জন্য ঔষধ দিলে এই পার্থক্যগুলির কি হবে? সবচেয়ে বড় কথা কিসের ওপর ঔষধ নির্বাচন হবে? Pancreas-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত কোষগুলির ওপর, না রক্তের শর্করা বা প্রস্রাবের শর্করার ওপর? মেটিরিয়া মেডিকায় এমন কোন ঔষধ আছে কি যা Provingএর ফলে সব Prover এর মধ্যে শুধুমাত্র Diabetesতৈরী হয়েছিল? তারপরের প্রশ্ন- অন্য কোন ঔষধেও কি ডায়াবেটিসের লক্ষণ তৈরী হয় নি? তা যদি হয়ে থাকে তবে কি ডায়াবেটিসের লক্ষণ তৈরী করে এমন সব কটি ঔষধ একত্রে মিশিয়ে ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসা হবে? তা যদি না হয়, তবে

কেন আমরা Diabetes মাত্রেই Uranium nit., Syzigium, Cephalandra Indica ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করি? কোথায় সদৃশ লক্ষণ, কোথায় হোমিওপ্যাথি? Bronchial asthma-র সব রোগীতেই Blatta, Arsenic বা Ipecacউপশম দেয় কি? যদি না দেয়, তবে দিই কেন? অথবা কয়েকটা ঔষধের সংমিশ্রণে Asthma drop প্রয়োগ করি কেন? রোগীর উপশমই যদি কাম্য হয়, তবে প্রচলিত Allopathic Tablet না খেয়ে রোগী আমাদের কাছে আসবে কেন? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানুষকে মানুষের থেকে পৃথক করে। তেমনি রোগী-স্বাতন্ত্র্য রোগীকে অন্যান্য রোগী থেকে পৃথক করে। উত্তেজক, ধারক ও বাহক কারণসমূহ, লক্ষণসমষ্টি ও constitutionমিলিয়ে রোগীর যে সামগ্রিক চিত্র মেটিরিয়ায় বর্ণিত ভেসজচিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাবে, সেই ভেষজই হবে সেই বিশেষ রোগীর ডায়াবেটিস বা অন্য যে কোন রোগের ঔষধ। অর্থাৎ রোগীর ঔষধই রোগের ঔষধ। রোগী-চিকিৎসা করলে রোগ যাবে। কিন্তু রোগ চিকিৎসা করলে রোগী আরোগ্য হবে না। তবে, রোগের দু-একটি লক্ষণের সাময়িক উপশম বা অবদমন (suppression) হবে মাত্র। তাই রোগের নয়, রোগীর চিকিৎসাই হোমিওপ্যাথি।

গ্রাম্য বহু লোক এখনও ভূতপ্রেত ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন। কাইকে ভুতে পেয়েছে মনে করলে তাঁরা ওঝার শরণাপন্ন হন। ওঝা এসে প্রথমেই সেই ভূত বা প্রেতকে নাকি চেনবার চেষ্টা করেন। ভুতে পাওয়া লোকটি তখন যে ধরণের ভুত ভর করেছে, তারই মতো আচরণ করতে থাকে। নিজের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য একেবারেই থাকে না। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় যে খুব অল্প আহার করতো, এ অবস্থায় সে হয়ত তিন-চার থালা ভাত খেয়ে নেবে। স্বাভাবিক অবস্থায় যে ছিল খুবই দূর্বল, এই অবস্থায় হয়ত তার শরীরে প্রচন্ড শক্তি দেখা দেয়- এমনকি তিন-চারজন জোয়ানও তাকে হয়ত ধরে রাখতে পারে না। এসবের কারণ হলো যে ভুত তাকে ভর করে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি লোকটির মধ্যে প্রকাশ পায়। যাই হোক, ভুত নির্ণিত হবার পর ওঝা যে ভুতের যেমন দরকার, তেমন ব্যবস্থা করেন এবং সে আরোগ্য লাভ করে। ঘটনা কতদুর সত্য সেকথা বলা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কিন্তু এখানে আমার বক্তব্য হলো-ভুতে

পাওয়া লোকটির মধ্যে থেকে ভুতকে চেনবার মতোই রোগনামক ভুতে-পাওয়া রোগী থেকে রোগী-ভুতকে প্রথমে চিনতে হবে। রোগী-ভুতকে চিনতে হলেই ভেষজ-ভুতকে সর্বাগ্রে খুব ভালভাবে চিনতে হবে, জানতে হবে। আমাদের দূর্বলতা ঔখানে। আমরা ঔষধের কয়েকটা লক্ষণ হয়তো জানি, কিন্তু ঔষধ-ভুতকে চিনি না। তাই রোগী-ভুতকেও চিনতে পারি না। শুধু তার কয়েকটা লক্ষণ নিয়ে সেইগুলিকে যেন তেন প্রকারে কমাবার চেষ্টা করি। ভুতে-পাওয়া লোকটিকে বেঁধে রাখলে বা মাথায় জল ঢাললে যেমন ভুত যাবে না, তেমনি রক্তের শর্করা কমাবার জন্য Syzigium দিলে রোগী-ভুত যাবে না- রক্তের শর্করা সাময়িকভাবে হয়ত কমবে, কিন্তু রোগী নিজের ও চিকিৎসকের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে সব চিকিৎসার বাইরে চলে যাবে এবং আর কখনো চিকিৎসার জন্য, সম্পূর্ণ রোগ নিরাময়ের জন্য আমাদের কারো শরণাপন্ন হবে না।

অর্গ্যানন ও মেটিরিয়া মেডিকা যেদিন হোমিওপ্যাথির পাঠ্যসূচীতে মুখ্য ভুমিকা গ্রহণ করবে এবং অন্যান্য বিষয়গুলি গৌণ ভুমিকা নেবে, শুধু সেইদনিই রোগী ও রোগের পার্থক্য হোমিওপ্যাথিক ছাত্র তথা চিকিৎসকদের সম্যক হৃদয়ঙ্গম হবে, তার আগে নয়। পাঠ্যক্রমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রোগ নির্ণয় এবং তার Therapeutics শিখিয়ে তারপর যদি ছাত্রদের বলা হয়, রোগের নয় রোগীর চিকিৎসা করতে হবে, তবে তাদের পক্ষে এমন ধারণা করা খুবই সঙ্গত যে উপদেশ দাতার মাথার গোলমাল আছে অথবা তিনি ১৭৫ বছর আগে হ্যানিমানের তৈরী হোমিওপ্যাথির অন্ধকূপে বাস করছেন- হোমিওপ্যাথি যে কত উন্নত, প্রশস্ত ও আধুনিক হয়েছে, তার খবর উপদেশ দাতা রাখেন না। লেখক বিনীতভাবে এই অভিযোগ মাথা পেতে নিয়েও সব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধু ও ছাত্রসমাজকে অনুরোধ করেছেন ভেষজ-চিত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে এবং রোগীর লক্ষণসমষ্টি-চিত্রের সঙ্গে ভেষজ-চিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পেতে সচেষ্ট হতে। যে হোমিওপ্যাথ এই যোগ্যতা লাভ করেছেন, হোমিওপ্যাথিতে সিদ্ধিলাভ তাঁর করতলগত।

রোগী-লিপি তৈরী
(Case-Taking)

রোগী-লিপি বা ইংরেজীতে যাকে বলা হয় কেস টেকিং (Case-Taking) এই কথার সঙ্গে সমস্ত হোমিওপ্যাথ মাত্রই পরিচিত। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত এবং নিয়ম মাফিক রোগী-লিপি তৈরী করা এবং সেই সঙ্গে লক্ষণের মূল্যায়ণ করা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং, হোমিওপ্যাথিতে রোগী-লিপি তৈরী করার মূল্য সবচেয়ে বেশী এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় এটা একটি কঠিনতম কাজও বটে। আমরা আমাদের পাঠ্য-পুস্তক "প্র্যাকটিস অব মেডিসিন" (Practice of Medicine) এ যে ধরণের রোগী লিপির কথা পড়ি তার সঙ্গে ডাঃ হ্যানিম্যানের লেখা "অর্গানন অব মেডিসিন" এর রোগী-লিপির অনেক পার্থক্য দেখতে পাই। আমাদের কিন্তু এই দু'রকম নিয়মকেই একই সূত্রে বাঁধতে হবে, যাতে আমরা উভয় উৎস থেকেই সব চেয়ে বেশী উপকার পেতে পারি।

হোমিওপ্যাথিক রোগী-লিপি এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের রোগী লিপির মূল পার্থক্য এই যে, হোমিওপ্যাথিতে রুগীকে সামগ্রিকভাবে চিকিৎসা করা হয়। রোগের শ্রেণী-বিভাগ অনুযায়ী রোগের নাম ধরে রুগীর চিকিৎসা করা হয় না। অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের চিকিৎসকগণ তাঁদের রোগী লিপিতে রোগীর প্রধান কষ্টগুলি এবং শারীরিক ও পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের উপর বেশী প্রাধান্য দেন, যাতে করে রোগের শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা রোগীর কষ্ট সমূহকে একটা নাম দেওয়া যায়, যেমন নেফ্রাইটিস (Nephritis) টিউবারকিউলোসিস (Tuberculosis) ইত্যাদি। তাঁরা রোগীর দেহে অসুস্থাবস্থায় যে গঠনগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে প্রধানতঃ তার কথাই বিবেচনা করেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথি প্রত্যেকটি লোকের স্বাস্থ্যের তথা রোগের মধ্যেও পার্থক্য আছে এই কথা বিশ্বাস করে। গঠনগতভাবে, সমগ্র মানবজাতিই একই বিভাগের মধ্যে পড়ে। কিন্তু তবুও এই পৃথিবীতে কোন দু'টি

মানুষই একেবারে এক নয়। হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, যকৃত, মস্তিষ্ক, ইত্যাদির শরীরস্থান-বিষয়ক (anatomical) অথবা শারীরবৃত্তীয় (Physiological) কার্যে কোন পার্থক্য নেই, তবুও মানুষের মধ্যে প্রকৃতি, রীতি, ব্যবহার, অবয়ব, মেজাজ ইত্যাদির পার্থক্য দেখা যায়। এইভাবে যখন, বেশ কয়েকজন রোগী একই শ্রেণীভুক্ত কোনো বিশেষ রোগে ভোগেন তখন বিভিন্ন রোগীতে বিভিন্নভাবে রোগের লক্ষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সুতরাং সর্বোৎকৃষ্ট এবং আদর্শ রোগী-লিপি তৈরী করতে গেলে রোগের লক্ষণ-সমূহ এবং রোগীর নিজস্ব লক্ষণ সমূহ লিপিবদ্ধ করা দরকার। এবং আমরা, হোমিওপ্যাথরা তাই করে থাকি।

এখন, দেখা যাক, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে দক্ষতার সঙ্গে সাফল্য লাভ করার উপায় কি?- হ্যানিম্যান তাঁর অর্গ্যাননে লিখেছেন যথার্থ রোগ তথা রোগ-চিত্র পেতে হলে চিকিৎসকের কতকগুলি বিশেষ যোগ্যতা থাকা একান্ত দরকার। সেগুলি হলো- (১) ইন্দ্রিয়সমূহের প্রখরতা (Sound Senses) (২) সংস্কারমুক্ত মন (Freedom from Prejudice) (৩) পর্যবেক্ষণের একাগ্রতা (Attention in observing) এবং (৪) রোগীলিপি প্রস্তুতিকরণে একান্ত বিশ্বস্ততা (Fidelity in tracing the Picture of the disease)।

চিকিৎসকের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় যদি সতেজ, সুস্থ ও স্বাভাবিক না থাকে তবে সঠিক রোগী-চিত্র পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। যেমন চিকিৎসকের দৃষ্টিশক্তি যদি প্রখর না হয় তবে রোগীর চোখ, মুখ, নাক, কান বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশেষ কোন অস্বাভাবিকতা চিকিৎসকের দৃষ্টিগোচর হবে না- ফলে যথার্থ রোগী-চিত্র তিনি পাবেন না। তেমনি চিকিৎসকের শ্রবণ-শক্তি যদি কম হয় তবে অচৈতন্ন রোগীর কাতরোক্তি বা অনুচ্চ প্রলাপ তার কর্ণগোচর হবে না- ফলে ঔষধ নির্বাচনও ঠিক হবে না। ঘ্রাণ-শক্তি প্রখর না হলে রোগীর মল-মূত্র ঘর্ম বা শরীর থেকে নির্গত কোন দুর্গন্ধ চিকিৎসক অনুভব করতে পারবেন না। কাজেই দেখা যাচ্ছে চিকিৎসকের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় সুস্থ ও সতেজ থাকা একান্ত দরকার। এরপর আসে সংস্কার-মুক্ত মনের কথা। এই সংস্কার কোন পূর্বকল্পিত ধারণার জন্য সৃষ্টি হতে পারে, গোঁড়ামির জন্য হতে পারে, পূর্বলব্ধ

অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠতে পারে বা আরও অনেক কারণে হতে পারে। যে ভাবেই গড়ে উঠুক চিকিৎসকের পক্ষে সম্পূর্ণ সংস্কার মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অথচ, এই ধরণের সংস্কারবদ্ধ মন নিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা রোগীর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর সন্দেহ নেই। কোন রোগী সম্বন্ধে রোগী-লিপি তৈরীর পূর্বেই চিকিৎসক অন্যের মুখে শুনে বা যে ভাবেই হোক ধারণা করে নিলেন রোগীটির স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। কাজেই সাইকোটিক বা সিফিলিটিক মায়াজম অবশ্যই রোগীর মধ্যে আছে। প্রকৃত পক্ষে, রোগীটি হয়ত পুরাপুরি সোরিক। কাজেই তিনি ভ্রান্ত ধারণার বশে ভুল ঔষধ নির্বাচন করবেন। আবার কাউকে হয়ত অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশে চরিত্রবান ভেবে নিয়েও ভুল করতে পারেন। যান্ত্রিক পরিবর্তনযুক্ত রোগ সোরিক নয়, টিউমার বা কোন উদ্ভেদ অর্থেই হলো সাইকোটিক বা ক্ষত মাত্রেই হলো সিফিলিটিক এই ধরণের বদ্ধমূল ধারণাও এক ধরণের সংস্কার। কোন একটা ঔষধে একটা বিশেষ রোগ আরোগ্যলাভ করায় সেই ধরণের সব রোগীতে একই ঔষধ ব্যবহার করা বা কোন একটা ঔষধে কোন রোগে কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করে ভাল ফল না পেয়ে সেই ঔষধকে সেই রোগে চিরদিনের মত ব্যবহার বন্ধ করাও এক ধরণের সংস্কার হ্যানিম্যান বলেছেন-এবং আমরাও দেখেছি যে এই ধরণের সংস্কারবদ্ধ মন নিয়ে প্রকৃত হোমিওপ্যাথি করা সম্ভব নয়। এরপর আসে পর্যবেক্ষণের একাগ্রতা। উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের অভাবে কত সহজ অথচ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ আমরা দেখতে পাই না। ফলে সঠিক ঔষধ নির্বাচনও করতে পারি না। অর্দ্ধনিমিলিত চোখ, শুধু মাত্র নাসিকাগ্রে ঘাম, চিবুক বা ঠোঁট লাল, অচৈতন্য রোগীর হাত পা ঠোঁট ইত্যাদির কম্পন, রোগ বিবরণ বর্ণনাকালীন রোগীর ব্যবহার ইত্যাদি একাগ্রতা সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে তবেই সঠিক রোগী-চিত্র পাওয়া সম্ভব। চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় সব গুণ থাকা সত্ত্বেও পর্যবেক্ষণে একাগ্রতার অভাব ঘটলে প্রকৃত হোমিওপ্যাথ হওয়া সম্ভব নয়। সবশেষে আছে রোগী-চিত্র অঙ্কনে বিশ্বস্ততা। রোগীর বক্তব্যের কোন পরিবর্তন না করে যথাযথভাবে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। রোগী বলল তার সব কষ্টের সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত বৃদ্ধি ঘটে অথচ চিকিৎসক তাকে লাইকোপডিয়াম দেবার জন্য রোগী-লিপিতে লিখলেন বেলা ৪টা থেকে রাত্রি ৮ টার মধ্যে বৃদ্ধি, ফলে

রোগী-চিত্র বিকৃত হবে। ঔষধ নির্বাচনও ভুল হবে। তাই হ্যানিম্যান বলেছেন বিশ্বস্তার সাথে রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে যেন তার মধ্যে কোন ভুল তথ্য না থাকে।

রোগী-চিত্র অঙ্কনে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আলোচনা করা হলো। এবারে রোগীর বিবরণ কিভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

প্রথমে রোগীর মুখ থেকে তার অসুস্থতার বিবরণ বা কষ্ট এবং তার ইতিহাস, রোগী যেভাবে বলে সন্তুষ্ট হয় সেইভাবেই তাকে বলতে দেওয়া উচিত। এই সময় রোগীকে বলার কোনরূপ বাধা দেওয়া উচিত হবে না, যদি না রোগী তার বিবরণ থেকে অন্য কথায় চলে যায়। রোগীর প্রত্যেকটি বিবরণ পৃথক পৃথক ভাবে লেখা দরকার। সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি বিবরণের মাঝে কিছুটা ফাঁক রাখতে হবে যাতে ভবিষ্যতে দরকার পড়লে আমরা ফাঁকা জায়গাটি ব্যবহার করতে পারি। রোগীর বক্তব্য শেষ হলে চিকিৎসকের পক্ষে সমস্ত লক্ষণের নির্দিষ্ট জায়গা, অনুভুতি, হ্রাস-বৃদ্ধি, কনকমিট্যান্ট ও স্বাতন্ত্রীকরণ লক্ষণ-সমূহের অনুসন্ধান করা উচিত। যেসব লক্ষণ রোগী দেয় তার মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ সম্পূর্ণ থাকে, অবশিষ্ট লক্ষণগুলির বিষয় রোগী তার সঠিক অনুভুতি, হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্বন্ধে নিশ্চিত নয়। এই থেকে বোঝা যায় রোগীর প্রধান প্রধান কষ্ট তিন-চারটি থাকে এবং অবশিষ্ট অস্পষ্টভাবে বলা লক্ষণগুলি হয় রোগীর লক্ষণ-সমষ্টির আয়তন বাড়ানোর জন্য কল্পনা-প্রসূত বিবরণ (যেমন আমরা স্নায়ুরোগগ্রস্থ (Neurotic) ব্যাক্তির ক্ষেত্রে দেখতে পাই) নতুবা ঠিকমত ব্যক্ত করার অক্ষমতা (যেমন আমরা অশিক্ষিত রোগীর ক্ষেত্রে দেখতে পাই)। এখন, যে সমস্ত সম্পূর্ণ-লক্ষণগুলি পাওয়া গেছে সেগুলির নীচে দাগ দেওয়া দরকার, কারণ এই লক্ষণগুলিই ঔষধ নির্বাচনে সাহায্য করবে।

তারপর রোগীর নিজস্ব ইতিহাস সংগ্রহ করতে হবে। অতীতে কোন মায়াজমেটিক রোগের, বাহ্যিক কোন কিছু প্রয়োগ করে রোগ চাপা দেওয়ার ইতিহাস, অসুস্থতার প্রধান ও প্রথম কারণ, টিকা দেওয়ার এবং তার কুফলের কথা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রধান কথা হলো এই

যে রোগীর জন্ম থেকে বর্তমান অসুস্থতা পর্যন্ত কোন মূল্যবান তথ্য থাকলে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। নিজস্ব ইতিহাসের মধ্যে রোগীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, জীবন যাত্রার মান, অভ্যাস, আসক্তি, যৌন-অনুভুতি প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে মাসিকের ইতিহাস ও প্রসব সম্বন্ধীয় ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করতে হবে।

এরপর কোন বংশগত রোগের ইতিহাস থাকলে তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই বংশ ইতিহাস নেবার সময় রোগীর পিতৃকুলের, মাতুল বংশের এবং বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের স্বামীর বংশের যাবতীয় চির-রোগের ইতিহাস সংগ্রহ করা দরকার। কারণ এই বংশ-ইতিহাস থেকে রোগীর মায়াজমজনিত অবস্থার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই বংশ ইতিহাস হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই বংশ ইতিহাস শুধুমাত্র দু-চারটি বড় বড় রোগের নাম নয়- যে কোন চির-রোগ এর অন্তর্গত-যেমন টিউবারকিউলোসিস, ক্যানসার, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, অর্শ, ফিসচুলা, বাত, চর্ম্মরোগ, পাগলামি, আত্মহত্যা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এরপর চিকিৎসকের উচিত রোগীর সামগ্রিক লক্ষণগুলির কথা জিজ্ঞাসা করা। কারণ, এই সমস্ত লক্ষণগুলি রোগীর কাছে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় রোগী বর্ণনা করেন না। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে রোগীর স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপনের জন্য অথবা পৃথকীকরণের জন্য এই সমস্ত সামগ্রিক লক্ষণাবলীর মূল্য সবচেয়ে বেশী। এই সামগ্রিক লক্ষণাবলীর মধ্যে পড়ে তার ইচ্ছা ও কামনা, ঘৃণা ও ভালবাসা, খাদ্য সংক্রান্ত ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, মানসিক লক্ষণাবলী, শীতকাতরতা অথবা গরমকাতরতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘাম, ঘুম ও স্বপ্ন, কোনো জিনিষের প্রতি সহজেই অত্যধিক অভিভূত হওয়া অথবা আবহাওয়া, ঋতু পরিবর্তনে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি, মাসিক স্রাবের বা অন্য কোনে স্রাবের দ্বারা কোনোরকম পরিবর্তন, সামগ্রিক হ্রাস-বৃদ্ধি এবং আরও অনেক কিছু। আমাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রোগীর সামগ্রিক লক্ষণসমূহ নিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত রোগীর স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক কোন লক্ষণ আমরা না পাই। কারণ স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক লক্ষণ ছাড়া কোনো কার্যকরী হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্বাচন সম্ভবপর নয়।

অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে এই সামগ্রিক লক্ষণাবলী সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত। তাই আমরা আমাদের পাঠ্যপুস্তক প্র্যাকটিস অব মেডিসিন-এ এর উল্লেখ পাই না।

তারপর আমাদের রোগী পরীক্ষা দ্বারা ও লব্ধ লক্ষণাবলীর (objective symptoms) দিকে নজর দিতে হবে। এগুলি হ'লো আমাদের "প্রাকটিস অব মেডিসিন" এর অন্তর্গত সমস্ত তথ্য ও চিহ্ন। প্রথমেই রোগীর আত্মীয় ও পরিচারকের দেওয়া লক্ষণাবলীর কথা জানতে হবে। হোমিওপ্যাথিতে এইসব লক্ষণাবলীর গুরুত্ব অনেক কম। কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে, অজ্ঞান অবস্থায় রোগীদের ক্ষেত্রে ও মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত লক্ষণাবলী ঔষধ নির্বাচনে প্রচুর সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে একজন মানসিক রোগীর পক্ষে তার মানসিক অস্বাভাবিকতা বর্ণনা করা প্রায়ই সম্ভবপর হয় না। এবং একজন চিকিৎসকের পক্ষেও চব্বিশ-ঘন্টা কোন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং যে পরিচারক রোগীকে সর্বদা পরিচর্যা করছে তার দেওয়া তথ্য আমাদের অনেক সাহায্য করে।

এরপর চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ দ্বারা লব্ধ লক্ষণাবলী লিখতে হবে। রোগী যেভাবে তার রোগ বিবরণী প্রকাশ করে, তার অভ্যাস, ব্যবহার, অঙ্গভঙ্গী ও চলাফেরা, বিছানায় যে অবস্থায় শয়ন করে, জিহ্বার চরিত্র, মুখ ও চোখের চাহনি ইত্যাদি প্রতিটি জিনিষ খুব মনযোগের সঙ্গে এবং সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করে লিখতে হবে। হোমিওপ্যাথি মাত্রই জানেন ঔষধ নির্বাচনে জিহ্বা, গন্ধ, চোখের চাহনি প্রভৃতি লক্ষণ অনেক সময় কত সাহায্য করে। হোমিওপ্যাথিতে এই পর্যবেক্ষণ শক্তি একটা শিল্প-বিদ্যা এটা অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জন করতে হয় এবং তা যে কেবল অনুসন্ধান শক্তির উপর নির্ভর করে তা নয়, সব বিষয়ে একটা পরিস্কার ধারণা এবং গভীর জ্ঞানই এই কাজে প্রধান সহায়।

এরপর রোগীকে সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষার (Inspection, Palpation, Percussion, Auscultation) দ্বারা যে সমস্ত শারীরিক তথ্য পাওয়া যাবে, সেইগুলি লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই তথ্যগুলি ঔষধ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুব সামান্যই সাহায্য করে কিন্তু রোগী

আরোগ্য যোগ্য কিনা অথবা কোনোরকম গঠনগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিনা, রোগটা ভবিষ্যতে উন্নতিযোগ্য কিনা-ইত্যাদি বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। সেইজন্য এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

সবশেষে, আমরা পরীক্ষাগারের তথ্যের উপর মনযোগ দেব- যার মধ্যে থাকবে রক্ত পরীক্ষা, মলমূত্র পরীক্ষা, এক্সরে, ই.সি.জি., ই.ই.জি. প্রভৃতি বিষয়। যদিও এগুলি আমাদের ঔষধ নির্বাচন ক্ষেত্রে খুব সাহায্য করে না, কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

এইভাবে রোগী-লীপি তৈরী শেষ হলে, আমাদের লক্ষণের মূল্যায়ন করতে হবে- যেটা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্ত কাজ। যে চিকিৎসক এই লক্ষণের মূল্যায়ন যত বেশী দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারবেন, তিনি তত সহজেই ঔষধ নির্বাচন করতে পারবেন। কারণ, রোগী যে সকল লক্ষণাবলীর বিবরণ দেয় তার সব কটিই রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অথবা স্বাতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে সমান উপযোগী বা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

লক্ষণের মূল্যায়নের জন্য আমাদের প্রথমে সামগ্রিক লক্ষণের উপর নির্ভর করতে হবে,-রোগীর শারীরিক কষ্ট সমূহ যেমন, মাথার যন্ত্রণা, পেটে ব্যাথা একজিমা প্রভৃতির উপর নয়। সামগ্রিক লক্ষণাবলীর মধ্যে আবার যে সমস্ত লক্ষণগুলি সাধারণত দেখা যায় না, যেমন, যদি কোন রোগীতে দেখা যায় যে সে অনুভব করছে যেন বাতাসে উড়ে বেড়ায়- তবে এই লক্ষণের নীচে দাগ দিতে হবে এবং ঔষধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই লক্ষণকে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিতে হবে। তারপর যে সমস্ত সাধারণ সামগ্রিক লক্ষণাবলী আছে তার নীচে দাগ দিতে হবে। তারপর অসাধারণ স্থানীয় লক্ষণাবলী, যেমন লালবর্ণ ছাড়া প্রদাহ, গলায় ব্যথা খাইলে উপশম প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণ হিসাবে তলায় দাগ দিতে হবে। এইভাবে লক্ষণের মূল্যায়ণ শেষ হলে, রোগীর স্বাতন্ত্রী করণ সহজেই সম্ভবপর হবে এবং প্রায়ই আমরা সঠিক ঔষধ নির্বাচন করতে সক্ষম হবো- যে ঔষধ নিঃসন্দেহে সমস্ত সাধারণ স্থানীয় লক্ষণাবলী এবং সেই সঙ্গে অসমাপ্ত লক্ষণাবলী যা রোগী নিজে বলেছে সেইগুলি পূরণ করবে। এমনকি যদি আমরা সঠিক ঔষধ নির্বাচন করতে সক্ষম নাও হই, রেপার্টরি আমাদের সঠিক ঔষধ এবং তার সবচেয়ে নিকটতম ঔষধগুলি

নির্বাচনে সাহায্য করবে।তারপর আমরা মেটেরিয়া মেডিকার সাহায্যে সঠিক ঔষধ নির্বাচন করতে পারবো।

সবশেষে, আমি আমার সমস্ত পাঠকবন্ধুগণকে ও হোমিওপ্যাথির ছাত্র-বন্ধুগণকে এই কথা বলে শেষ করতে চাই যে, আপনার রোগী-লিপি তৈরীর হাজার রকম উপায় গ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু আপনাদের অভিজ্ঞতালব্ধ নতুন নিয়ম গ্রহণ করার আগে চেষ্টা করবেন "প্রাকটিস অব মেডিসিন ও হোমিওপ্যাথিক "অর্গ্যানন অব মেডিসিন" এর মধ্যে যোগসুত্র স্থাপন করতে। এটাই নিঃসন্দেহে রোগী-চিত্র পাওয়ার সব চেয়ে ভাল উপায় বলে আমি মনে করি।

লক্ষণের মূল্যায়ণ

রোগীর লক্ষণের সাথে সাদৃশ্য আছে এমন ঔষধ প্রয়োগ করে রোগীকে আরোগ্য করাই হলো হোমিওপ্যাথি। কাজেই লক্ষণের আবার মূল্যায়ণ কি এবং কেন? স্বভাবতইঃ এই প্রশ্ন উঠতে পারে। রোগীর পারিবারিক ইতিহাস, অতীত ইতিহাস, ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং বর্তমান লক্ষণাবলী পর্যালোচনা করে যে রোগী-চিত্র আমরা পাই তার সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে এমন ঔষধ প্রয়োগ করাই হলো হোমিওপ্যাথি। কিন্তু এ বড় কঠিন কাজ- বিশেষ করে নবীন চিকিৎসকদের কাছে। কারণ, সব লক্ষণ মিলিয়ে একটা মাত্র ঔষধে পৌঁছানো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব কি তরুণ, কি অভিজ্ঞ সকল চিকিৎসকের পক্ষে। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগীর যে সব লক্ষণ দেখা দেয়, সুচিকিৎসা না হলে সেই সব লক্ষণ দীর্ঘ দিন থাকার ফলে নতুন লক্ষণের সৃষ্টি করে। কাজেই পুরাতন জটিল রোগী যখন আমাদের কাছে আসে তখন, লক্ষণের লক্ষণ, আবার তার লক্ষণ এমনি বহু লক্ষণ-বিশিষ্ট হয়েই আসে যার একটির সাথে অপরটির কোন মিল তো থাকেই না বরং বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। এ অবস্থায় একটা রোগীতে তিন-চারটি অথবা আরও বেশী ঔষধের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত হোমিওপ্যাথি করতে হলে- একটি মাত্র ঔষধই দিতে হবে। কাজেই এমন কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে যার দ্বারা বহুর মধ্যে একককে খুঁজে পাওয়া যাবে। সেই উপায়ই হল লক্ষণের মূল্যায়ন।

গভীর ক্রিয়াশীল একটা ঔষধের গুণ নিরীক্ষণ (Proving)-এ শত শত লক্ষণ দেখতে পাই। কারও পক্ষে কি সম্ভব একটা ঔষধের সব লক্ষণ মনে রাখা? নিশ্চয়ই নয়। তবে, আমরা কিভাবে প্রতিদিন থুজা, ক্যালকেরিয়া, লাইকোপডিয়াম, সালফার, সিপিয়া, ফসফরাস ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করছি? সেও এই মূল্যায়ণের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো এই মূল্যায়ণের মানদন্ড নিয়ে। আমরা সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে লক্ষণের মূল্যায়ন করেই চলেছি কিন্তু সেই মূল্যায়নের মানদন্ড সকলের সমান নয়। তাই একই রোগীতে দশজন

হোমিওপ্যাথ দশটি ঔষধ নির্বাচন করেন। এখানেই হলো হোমিওপ্যাথির সমস্যা। রোগী একই, অথচ তার ঔষধ দশটি, এ আবার কেমন চিকিৎসাব্যবস্থা- একথা অনেক রোগীকেই বলতে শুনেছি। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে এটাই চিরদিন হয়ে এসেছে, হচ্ছে এবং হবেও। তার একমাত্র কারণ এই মূল্যায়ণের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ। মূল্যায়ণ প্রকৃতপক্ষে এক ধরণের শিল্পকলারই নামান্তর। পার্থিব জগতে সকলের কাছে সব জিনিষের মূল্য কি সমান? আমরা কেউ সারাজীবন অর্থের পেছনে ছুটছি, কেউ বা সঙ্গীত সাধনায় সারাজীবন কাটিয়ে দিচ্ছি, কেউ বা অঙ্কনের মধ্যে ডুবে আছি, কেউ বা সাহিত্য সাধনায় মেতে আছি- এ ধরণের কত প্রভেদ? কারণ? সেই মূল্যায়ণ- জীবনের উদ্দেশ্যের মূল্যায়ণের প্রভেদ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের মধ্যেও তেমনি কেউ বা রোগীর পেটের যন্ত্রণার প্রকৃতি ও হ্রাস বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেন, কেউ বা তার চর্মরোগের বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেন, কেউ বা তার মানসিক লক্ষণের উপর গুরুত্ব দেন, কেউ বা মায়াজমের উপর অধিক গুরুত্ব দেন, আবার কেউ বা রেপার্টরি করে যে ঔষধে বেশী লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাই নির্বাচন করেন। এই কারণেই একই রোগীতে দশজন চিকিৎসক দশটি ঔষধ নির্বাচন করেন। এর মধ্যে কে সঠিক পথ অনুসরণ করছেন সেটা একমাত্র বোঝা যায় রোগীর উপর ঔষধের ক্রিয়া বা ফল দেখে। মূল্যায়ণ যদি সঠিক না হয়, নির্বাচিত ঔষধ হয় কিছুই করবে না বা আংশিক উপশম দেবে মাত্র। রোগী আরোগ্য করতে পারবে না। মূল্যায়ণে যখন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনিবার্য তখন সঠিক ঔষধ নির্বাচনে এই ধরণের অরাজকতাও চলবে- এটাই হয়তো আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কিন্তু তা ঠিক নয়। মূল্যায়ণ, চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, গভীর জ্ঞান, আন্তরিকতা, ধৈর্য্য, একাগ্রতা, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির উপর অনেকখানি নির্ভর করে তা সত্য। কিন্তু এর একটা সুনির্দিষ্ট নীতিও আছে। হ্যানিম্যান আংশিকভাবে এবং পরবর্তীকালে কেন্ট ও অন্যান্য স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথিক দিকপালগণ বিস্তারিতভাবে এই মূল্যায়ণের নিয়ম ও পথ নির্দেশ করে গেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেও অধিকাংশক্ষেত্রে এই মূল্যায়ণের নিয়মই আমাদের সঠিক পথে নিয়ে যাবে। এই মূল্যায়ণের দক্ষতা যে চিকিৎসক অর্জন করেছেন, হোমিওপ্যাথিতে সাফল্য তাঁর করতলগত।

এবার দেখা যাক লক্ষণের মূল্যায়ণের পদ্ধতি কি? মানুষ মাতৃগর্ভে জন্মলগ্ন থেকেই এই জীবনীশক্তি তথা ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। ভ্রুণ অবস্থায় যে ইচ্ছাশক্তি অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত থাকে, সেই ইচ্ছাশক্তিরই ফলশ্রুতি একটা পুর্ণাবয়ব মানব শিশুর জন্মে। সব মানুষই জন্মায় একটা জন্মগত বৈশিষ্ট নিয়ে, যে বৈশিষ্ট্য আবার বংশগতি বাহক (gene) বংশপরম্পরাগত রোগ এবং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া শক্তি প্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জন্মের পর থেকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, বিভিন্ন রোগ-উৎপাদক শক্তি, স্থান, কাল, ঘটনা-প্রবাহ, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভতি এই বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করে। ইচ্ছাশক্তি, মন ও দেহ এই ত্রয়ীর সমষ্টি আমরা দেখতে পাই প্রতিটি মানুষের মধ্যে।

মানুষের ইচ্ছাশক্তিতে যা উদয় হয়, মনে হয় তার বিশ্লেষণ আর দেহে হয় তার বাহ্যিক প্রকাশ। কারোর কোথাও যাবার ইচ্ছা হলো। মন বিশ্লেষণ করবে-যাওয়া উচিত হবে কি না? কখন গেলে ভাল হয়, কেমনভাবে যাবে ইত্যাদি। তারপর সিদ্ধান্ত যখন হলো তখন দেহ চললো। দেহ মনের অধীন, মন ইচ্ছাশক্তির অধীন এবং ইচ্ছাশক্তি, মন ইত্যাদি সবই "আমার" বা "আমির" অধীন। এই "আমি" কে? এর কোন ব্যাখ্যা নেই "আমি" একটা মানবসত্ত্বা। এই সত্ত্বার সবচেয়ে নিকটে হলো ইচ্ছাশক্তি, তারপর মন, দেহ ইত্যাদি। লক্ষণের মূল্যায়ণ করতে এই ক্রমবিকাশটুকু আমাদের বুঝতে হবে।

মানুষ যখন অসুস্থ হয় তখন এই ক্রম অনুসরণ করেই তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। দেহ-যন্ত্রে যখন রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন রোগ শেষ স্ত রে পৌঁছেছে বুঝতে হবে। যান্ত্রিক পরিবর্তনগুলিকে রোগ মনে করে তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সুক্ষ্ম-শক্তিতে ঔষধ প্রয়োগ করলে মারাত্মক ভুল করা হবে। হোমিওপ্যাথিক মতে ঔষধ প্রয়োগের সময় ও স্থান হলো রোগের প্রাথমিক স্তর- যে স্তরে জীবনীশক্তি আক্রান্ত হয়ে লক্ষণ প্রকাশ করে কিন্তু কোন যান্ত্রিক পরিবর্তন দেখা দেয় না।

কাজেই লক্ষণের মূল্যায়ণে আমরা কি যান্ত্রিক পরিবর্তনজনিত লক্ষণের উপর বেশী গুরুত্ব দেবো? কখনই না। যে লক্ষণ মানুষের ইচ্ছাশক্তি বা মনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত সেই লক্ষণই আমাদের কাছে সবচেয়ে

মূল্যবান। এ জগতে কে না বাঁচতে চায়? কিন্তু যদি কোন রোগীতে আত্মহত্যার ইচ্ছা এতই প্রবলভাবে দেখা দেয় যে কোন কারণ ছাড়াই সে সব সময় নিজের জীবন ধ্বংস করার জন্য সচেষ্ট এবং তার মুখে সব সময়ই বিষাদের ছায়া বিরাজ করছে তবে বুঝতে হবে তার ইচ্ছাশক্তি এমনভাবে বিকৃত হয়েছে যে সে এই জগতে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতাই খুঁজে পাচ্ছে না।এই ধরণের রোগীর যান্ত্রিক লক্ষণ-সমষ্টি যে ঔষধই নির্দেশ করুক না কেন = "প্রবল আত্মহত্যার ইচ্ছা" এই লক্ষণের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে এই ইচ্ছাশক্তি মানুষের সবচেয়ে কাছে।

এরপর আসে মন। ধীর, শান্ত, লাজুক অল্পতেই কেঁদে ফেলে, একটু সান্তনা দিলে মুহূর্তেই সব দুঃখ ভুলে যায় এমন রোগীর যদি জল পিপাসা না থাকে তবে দেহের যেখানেই রোগ হোক না কেন এবং স্থানীয় লক্ষণ সমূহ যে ঔষধকেই নির্দেশ করুক না কেন পালসেটিলা নির্বাচনে কোনই অসুবিধা হবে না। স্থানীয় লক্ষণ সবগুলি যদি পালসেটিলার বিরুদ্ধে যায় তবুও। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে ইচ্ছাশক্তির পরে মনই হলো মানুষের সত্ত্বার নিকটবর্তী।

এরপর আসে স্বপ্ন ও নিদ্রা সংক্রান্ত লক্ষণাবলী। স্বপ্নে মানুষের অবচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া নিদ্রাও মানুষের সুস্থতা বা অসুস্থতার প্রতীক।

এরপর আসে ইচ্ছাশক্তি, মন ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় হ্রাস-বৃদ্ধির ঘটনাজড়িত লক্ষণ। পূর্ণিমার রাত্রে পুলকিত মনে কবিতা লেখার ইচ্ছা, মেঘলা আবহাওয়ায় আনন্দিত বোধ করা ইত্যাদি ঘটনা একটা রোগীর মানসিক অবস্থার চিত্র প্রকাশ করে এবং ঔষধ নির্বাচনে সর্বোচ্চ স্থান পেয়ে থাকে।

এরপর আসে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, খাবার বা পানীয়ের পছন্দ, অপছন্দ, কোন বিশেষ খাদ্য বা পানীয় সহ্য না হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ। এইসব লক্ষণগুলিও একটা মানুষকে সামগ্রিকভাবে প্রকাশ করে। যে লক্ষণ মানুষের শরীরের কোন একটা অংশে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র মানুষটাকে নির্দেশ করে সেইসব লক্ষণই ঔষধ নির্বাচনে সবচেয়ে মূল্যবান। কারণ

একটা মানুষ তার দেহের বা যে কোন অংশের চেয়ে অনেক বড়। একখানা হাত বা পা না হলে একজন বাঁচতে পারে কিন্তু মানবসত্ত্বা বাদ দিয়ে শরীরের কোন অংশ বাঁচতে পারে না। এই সামগ্রিক লক্ষণের মধ্যে পূর্বে যা বলা হয়েছে তার পরই আসে রোগী শীতকাতর না গরমকাতর, তার ঘাম কম না বেশী, ঘাম দিলে ভাল অনুভব করে না খারাপ লাগে, ঘামে কোন বিশেষ গন্ধ আছে কি না ইত্যাদি। এরপর আসে অন্য যে কোন সামগ্রিক লক্ষণ এবং সামগ্রিক লক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় হ্রাস বৃদ্ধির ঘটনা। যেমন সর্বশরীরে জ্বালা- কিন্তু গরমে উপশম, সব কষ্টের শীতকালে বৃদ্ধি, অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে কষ্টের বৃদ্ধি, কোন স্রাব নির্গত হলে কষ্টের উপশম ইত্যাদি।

কাজেই দেখা গেল ইচ্ছাশক্তি, মন এবং দেহ অথবা দেহ-মন এককভাবে যে সব সামগ্রিক লক্ষণ প্রকাশ করে সেইগুলিই হোমিওপ্যাথিতে ঔষধ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান।

কিন্তু এইসব লক্ষণের সবগুলিই সমান মূল্যবান নয়। সামগ্রিক লক্ষণের মধ্যে যেগুলি অসাধারণ অর্থাৎ যে সব লক্ষণের চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে কোন ব্যাখ্যা মেলে না, চিকিৎসকের কাছে অদ্ভুত মনে হয়, বিস্ময়ের সৃষ্টি করে সেইগুলিই সর্বোচ্চ স্থান দখল করে। কারণ যা সাধারণ তাতো বহু রোগীতে পাওয়া যায় এবং বহু ঔষধেও পাওয়া যায়- কিন্তু বা অসাধারণ তা হয়ত একটি, দুটি বা তিনটি ঔষধেই মাত্র পাওয়া যায়, কাজেই ঔষধ নির্বাচন সহজ হয়। যেমন, একটি রোগী যদি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে বলে যে পথ চলার সময় তার মনে হয় সে যেন শূন্যে উড়ে যাচ্ছে তাহলে আসেরাম ইউরোপিয়াম বা ভ্যালেরিয়ানা প্রভৃতি তিন, চারটি ঔষধের কোন একটির মধ্যে রোগীর স্বাতন্ত্র খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু কোন রোগী যদি বিকারের ঘোরে ঔ লক্ষণ প্রকাশ করে তবে হয়ত রাস-টকস নির্বাচনে খুবই সুবিধা হবে। মেটিরিয়া মেডিকায় এ ধরণের প্রচুর অসাধারণ বা অদ্ভুত লক্ষণ আছে যার সাহায্যে রোগী স্বাতন্ত্রীকরণ খুব সহজ হয়। এরপর আসে অন্যান্য সাধারণ সামগ্রিক লক্ষণ।

যে সব লক্ষণ রোগীর দেহের কোন অংশ বা যন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সেগুলিকে বলে স্থানীয় লক্ষণ। এই স্থানীয় লক্ষণের মধ্যে যেগুলি

অসাধারণ তাদের মূল্য অধিক। যেমন, গলার ব্যাথা কিছু খেলে কমে, কাশি হলে শরীরের দূরবর্তী স্থানে যন্ত্রণা হয়, শক্ত জিনিসের চেয়ে জলীয় জিনিস খেতে গলায় বেশী ব্যাথা লাগে, শ্বাসকষ্ট হাঁটাচলা করলে উপশম ইত্যাদি। এই ধরণের লক্ষণের চিকিৎসা শাস্ত্রে কোন ব্যাখ্যা মেলে না। কাজেই ঔষধ নির্বাচনে এবং রোগী-স্বাতন্ত্রীকরণে এগুলি অনেক বেশী মূল্যবান। কিন্তু সাধারণ স্থানীয় লক্ষণ যথা প্রদাহস্থানে দপদপ করা, গরম বোধ করা, ব্যাথা লাগা বা শ্বাসকষ্ট চলাফেরায় বৃদ্ধি, গলায় ব্যাথা শক্ত কিছু খেতে গেলে বৃদ্ধি এগুলি সব সাধারণ লক্ষণ। কারণ এইগুলি এইসব অবস্থায় হওয়াই স্বাভাবিক। তাই ঔষধ নির্বাচনে এগুলির বিশেষ মূল্য নেই। এগুলির দ্বারা রোগী স্বাতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়। এগুলির উপর নির্ভর করে ঔষধ দিলে রোগীর সাময়িক উপশম হলেও হতে পারে- কিন্তু আরোগ্যলাভ কখনই সম্ভবপর নয়। অনেক সময় স্থানীয় লক্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধি বা কনকমিট্যান্ট লক্ষণও একটা বিশেষ ঔষধে পৌছাতে সাহায্য করে।

এই কনকমিট্যান্ট সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকলে অনেক সময় একটা মাত্র লক্ষণ থেকেও সঠিক ঔষধ নির্বাচন করা সম্ভব হয়। যন্ত্রণা হলেই তার সাথে শীত শীত ভাব, রান্নার গন্ধে গা বমিবমি ভাব, যন্ত্রণা হলেই সেই স্থানে ঘাম হওয়া, অন্যসময়ে নয়- এইসব বহুমূল্যবান, কনকমিট্যান্ট মেটিরিয়ায় আছে। সেগুলিকে অন্য সময়ে নয়-এইসব বহুমল্যবান কনকমিট্যান্ট মেটিরিয়ায় আছে। সেগুলিকে জানতে হবে এবং পর্যবেক্ষণ করে খুঁজে বের করতে হবে- তবেই রোগী-চিত্র উদ্ধার করা সম্ভব। এক রাশি সাধারণ লক্ষণ (যা সাধারণতঃ রোগীরা এসে বলেন)- কখনই কোন বিশেষ ঔষধকে নির্দেশ করে না।

অতএব কোন রোগীতে তথাকথিত রোগ লক্ষণগুলিকে প্রথমে পৃথক করতে হবে। তারপর দেখতে হবে ঐ সব লক্ষণের মধ্যে রোগীর স্বাতন্ত্র্য জ্ঞাপক কোন লক্ষণ আছে কি না। তা যদি না থাকে তবে রোগীর ধাতুগত কোন বৈশিষ্ট্য রোগীকে পৃথকীকরণ করতে সাহায্য করে কিনা তাও দেখতে হবে। সেখানেও যদি কিছু না পাওয়া যায় তবে উত্তেজক, ধারক বা বাহক কারণগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্রজ্ঞাপক কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখা দরকার। কখন কোথায়, কি স্বাতন্ত্রজ্ঞাপক লক্ষণ পাওয়া যাবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম বা পথ নেই। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং অধ্যবসায়ের উপরই

তা নির্ভর করে। তবে মূল লক্ষ্য হওয়া চাই স্বাতন্ত্রীকরণ। দুরারোগ্য রোগীতে উপশম দেওয়াই হোক, তরুণ রোগের নিরাময়ই হোক আর পুরাতন জটিল রোগীকে আরোগ্য করাই হোক, স্বাতন্ত্রীকরণ ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। স্বাতন্ত্রীকরণ ছাড়া যে উপশম দেওয়া হয় তা প্রকৃত হোমিওপ্যাথি নয়। হোমিওপ্যাথির নামে অপহোমিওপ্যাথি- যার পরিণাম রোগীর পক্ষে মারাত্মক।

এবারে কয়েকটি রোগীর বিবরণ দিয়েই আমার লেখা শেষ করবো। এতেই আশাকরি সকলের কাছে পরিস্কার হবে লক্ষণের মূল্যায়ণ কি এবং তা করতে গেলে চিকিৎসকের অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার কত দরকার। একটা সোরিয়েসিস-এর রোগী। সাত আট বৎসর যাবৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলছে, সব সন্ধিস্থলগুলি জোড়া লেগে গেছে। সোজা করার চেষ্টা করলেই ঝরঝর করে রক্ত ঝরে। রোগী শয্যাশায়ী- চলতে পারে না। ক্রমাগত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগের ফলে সব লক্ষণই চাপা পড়েছে বা পরিবর্তিত হয়েছে? ফলে কোন একটা ঔষধে পৌঁছান সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু ঐ অবস্থাতেও রোগীর সেতার বাজাবার আগ্রহ, সুন্দর চেহারা এবং কুকুরে ভীতি-এই লক্ষণগুলির উপর নির্ভর করে টিউবারকুলিনাম প্রয়োগ করা হলো এবং রোগী আরোগ্য লাভ করলো। টিউবারকুলিনাম এরপর মাত্র এক মাত্রা সালফার তাকে দেওয়া হয়েছিল।

চোখে ক্যানসার-এর রোগীর লাল জিহ্বা ও নাড়ীর গতির দ্রুতি দেখে পাইরোজেন এবং পরে নাইটিক অ্যাসিড দেওয়ায় আশাতীত ফল পাওয়া গেছে।

হাঁপানির রোগী। সব লক্ষণ সাইলিসিয়াকে নির্দেশ করছে। কিন্তু ছোট বেলায় হুপিংকাশি(whooping Cough) হয়েছিল এবং তারপর থেকে হাঁপানি শুরু হয়েছে- এই ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে পারটসিন (Pertussin) দেওয়ায় আরোগ্য হয়।

বাতের রোগী সব লক্ষণ মেডোরিনামকে নির্দেশ করলেও রাত্রে ঘুম ভাঙ্গলেই ক্ষুধা পায় এই লক্ষণের উপর সোরিণাম প্রয়োগ করে আরোগ্য হয়।

মাথা খারাপ রোগীর সব লক্ষণ হাইওসায়মাসকে নির্দেশ করলেও অন্তঃ সত্ত্বার তিন, চার মাসের সময় থেকে শুরু হয়েছে জেনে থাইরেডিনাম দিয়ে আরোগ্য হয়।

কিডনী পাথুরী (Kidny Stone) এর রোগী। সব লক্ষণ লাইকোপডিয়ামকে নির্দেশ করলেও রাত্রে ঘুমের মাঝে উঠে জল খেতে হয় এই লক্ষণের উপর মেডোরিণাম দেওয়াতে তিনটি বড় বড় Stone বের হয়ে যায় এবং রোগী এক মাসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। ডিসপেপসিয়া ও কোলাইটিস এর রোগী। সব লক্ষণ নেট্রাম সালফ (Nat. Sulph) কে নির্দেশ করলেও রোগী অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এই লক্ষণের উপর আর্সেনিক দেওয়ায় বার বৎসরের রোগ যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায়।

এই ধরণের অসংখ্যা রোগী আরোগ্যের ঘটনার কথা জানি- যেখানে শুধু লক্ষণের মূল্যায়ণই রোগীকে আরোগ্য করতে সাহায্য করেছে। সদৃশ ঔষধ নির্বাচন করলেই হবে না। কার সদৃশ, কিসের সদৃশ সেটা সম্যক উপলব্ধি করে মূল্যায়ণ করতে হবে। তবেই আসবে সফলতা- অন্যথায় নয়।

ঔষধের শক্তি নির্বাচন

অনেককেই বলতে শুনেছি- ঔষধ নির্বাচন যদি নির্ভূল হয় তবে যে শক্তিতেই তা প্রয়োগ করা হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না- ঔষধ ঠিকই কাজ করে। যুক্তিস্বরূপ তাঁরা বলেন- হ্যানিম্যান অর্গাননে বলেছেন ঔষধ কখনও রোগ-শক্তির চেয়ে দুর্বলতর হতে পারে না। কাজেই যে কোন শক্তিতে ঔষধ প্রয়োগ করলেই তা রোগশক্তিকে পরাভূত করতে অবশ্যই সক্ষম। কিন্তু প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় আমরা কি দেখি? অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় কাতর রোগী বেলেডোনার পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করার পরও বেলেডোনা ৩০ শক্তিতে দেওয়ায় কিছুমাত্র পরিবর্তন হলো না। কিন্তু বেলেডোনা হাজার বা ১০ হাজার শক্তির একটি মাত্র গ্লোবিউল প্রয়োগে জাদুমন্ত্রের মত কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই রোগী আরোগ্য লাভ করল। দু'মাস যাবৎ একটানা অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় কাতর বালিকা, যার রোগ কোন পরীক্ষায় ধরা পড়ল না, - কলোসিন্থ-এর সব লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও সুযোগ্য ডি. এম.এস. ডাক্তার কলোসিন্থ ৩০ ও ২০০ শক্তিতে প্রয়োগ করে কোন ফল পেলেন না। অথচ সেই রোগী করোসিন্থ ৫০ হাজার শক্তির একটা গ্লোবিউল খেয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। আর কখনও তার পেট ব্যাথা ফিরে আসে নি। Bacillary Dysentery রোগীর মার্ক কর-এর সব লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও ৩০ শক্তিতে প্রয়োগ করে কোন পরিবর্তন হলো না। কিন্তু হাজার শক্তি ৩-৪ মাত্রা প্রয়োগ করতেই সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করলো। সিনা ৩০ শক্তিতে ফল দেখায় নি- অথচ হাজার শক্তিতে তৎক্ষণাৎ ফল দেখিয়েছে। চর্মরোগের রোগীকে সালফার ২০০ বা হাজার শক্তি প্রয়োগে শুধু বৃদ্ধিই ঘটেছে- কিন্তু ৬ শক্তি পুনঃপুনঃ প্রয়োগে দ্রুত আরোগ্য করা সম্ভব হয়েছে। পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীতে উচ্চ শক্তির ঔষধ কোন ফল দেখায়নি, কিন্তু সেই ঔষধই নিম্নশক্তিতে অপূর্ব ফল দেখিয়েছে।

পাঠকদের সকলেরই অভিজ্ঞতায় নিশ্চয়ই উল্লিখিত দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ২০ বছরের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় অনুরূপ প্রচুর সংখ্যক রোগীর সম্মুখীন হয়েছি এবং আজও হচ্ছি। এরপরও কি করে স্বীকার করি ঔষধের শক্তি নির্বাচনে

কিছু যায় আসে না? অনেকেই হয়ত প্রশ্ন তুলবেন তাহলে হ্যানিম্যান কি অর্গ্যাননে ভুল লিখে গেছেন? তার উত্তরে বলবো হ্যানিম্যান ঠিকই লিখে গেছেন। অর্গ্যাননের একটি শব্দকেও নস্যাৎ করবার ক্ষমতা বা ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু আমরা অনেক সময় তাঁর লেখার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা না করে ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যা করে ফেলি। জ্ঞানী ও মাননীয় পাঠকগণকে অনুরোধ করবো সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি অর্গ্যানন থেকে আর একবার পড়তে এবং তার অর্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে। মহামতি কেন্ট লিখেছেন- তিনি যতবার অর্গ্যানন পড়েছেন ততবারই তার থেকে নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন এবং তার অন্তর্নিহিত সত্য ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

উক্ত অনুচ্ছেদে যা লেখা আছে এবং আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে তার যে অর্থ আমি বুঝেছি তা হলো এই যে- চিকিৎসকের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলেই ঔষধ সব সময়ই রোগশক্তির চেয়ে শক্তিশালী। কোন ব্যক্তি বা রোগী ঔষধের কোন শক্তিতে প্রয়োজনীয়রূপে আক্রান্ত হবে তা নির্ভর করে তার 'প্রবণতা'র উপর। যার স্নায়ু এমন যে মনে হয় যেন সব সময়ই সপ্তম স্বরে বাঁধা আছে, তাকে ৬ বা ৩০ শক্তির ২/১ মাত্রা ঔষধে আক্রান্ত করা যাবে না। তার জন্য হাজার, দশ হাজার বা লক্ষ শক্তির এক মাত্রা ঔষধই হয়ত যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু তাকে যদি ঔষধের নিম্ন শক্তি দ্বারা আক্রান্ত করাতে হয় তবে পুনঃ পুনঃ নিম্ন শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করেই তা করা সম্ভব হতে পারে। একজন ঘুমন্ত লোককে একটি মাত্র মশা একবার দংশনে হয়ত জাগাতে পারে না, কিন্তু পুনঃপুনঃ দংশনের ফলে সেই একটা মশাই তার ঘুমের (তা যত গভীরই হোক না কেন) অবশ্যই ব্যাঘাত ঘটাবে। ঔষধের বার বার প্রয়োগে প্রবণতার পরিবর্তন ঘটানো যায়- এই বিষয়টি এই অনুচ্ছেদে একান্তভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। আমাদের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি বলেই ঔষধ যে কোন শক্তিতে প্রয়োগ করেও সুস্থ বা অসুস্থ মানবদেহে লক্ষণ সৃষ্টি করা যায়। 'প্রবণতা' কমানো বা বাড়ানো যায় বলেই এটা করা সম্ভব। সুক্ষ্ম শক্তির এক মাত্রা ঔষধে কোন সুস্থ লোকের শরীরে বা মনে কোন লক্ষণ সৃষ্টি করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু পুনঃপুনঃ প্রয়োগে লক্ষণ সৃষ্টি হতে বাধ্য।

কাজেই ঔষধ প্রয়োগের নীতিই ("Similia Similibus Curentur") শুধু অনুসরণ করলে হবে না। যে Law -এর উপর এই আরোগ্য-নীতি প্রতিষ্ঠিত সেই "Therapeutic Law of Nature" কে অনুসরণ করতে হবে। তা করতে হলে শুধু "Let likes be treated by likes" হলেই হবে না-"Let likes be treated by likes"-which are stronger, হওয়া দরকার। যে প্রবণতা থেকে রোগের সৃষ্টি সেই প্রবণতার উর্দ্ধে উঠতে পারলে তবেই ঔষধ রোগ প্রবণতা দুর করে আরোগ্য বিধানে সক্ষম হবে। কাজেই একবারে একটি মাত্র ঔষধ ন্যূনতম মাত্রায় প্রয়োগ করে হ্যানিম্যানিয়ান হোমিওপ্যাথি যদি করতে হয় তবে ঔষধের শক্তি নির্বাচন প্রবণতা অনুসারে যথাসম্ভব সঠিক হওয়া একান্ত দরকার। তবে প্রয়োজনীয় শক্তির চেয়ে কম শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করেও আরোগ্য করা সম্ভব- যদি সেই ঔষধ নিম্নশক্তিতে পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা যায়। তবে এ সব ক্ষেত্রে রোগীর আরোগ্যলাভে অহেতুক দীর্ঘ সময় লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপেক্ষাকৃত নিম্নশক্তির ঔষধ পুনঃপুনঃ প্রয়োগে জীবনীশক্তির ঔষধ-প্রবণতা বাড়ে, রোগ-প্রবণতা কমে এবং রোগী আরোগ্য লাভ করে। এর থেকেই সম্ভবতঃ ডাঃ কেন্ট-এর "Principle of Series and Degress" এর প্রবর্তন।

৩০ শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেও হ্যানিম্যান রোগীর স্থায়ী আরোগ্য বিধানে সক্ষম ছিলেন। আজ আমরা হাজার, দশ হাজার বা লক্ষ শক্তির ঔষধ ব্যবহার করেও তা করতে পারছি। কিন্তু সহজেই অনুমান করা যায় যদি প্রবণতা উপযোগী সঠিক শক্তিতে ঔষধ দেওয়া যায় এবং প্রয়োজন মত পুনঃ প্রয়োগ করা যায় তবেই হ্যানিম্যান বর্ণিত "Highest ideal of cure" বাস্তবে রূপলাভ করবে। এই "Highest ideal of cure" সার্থক করার চেষ্টাই হ্যানিম্যান আজীবন করে গেছেন- এবং কি উপায়ে তা সম্ভব অর্গ্যাননের ২৪৬ অনুচ্ছেদে (৫ম সংস্করন) তার হদিস আমাদের দিয়ে গেছেন যা তাঁর সারাজীবনের নিরলস সাধনা ও অভিজ্ঞতালব্ধ ফসল।

ডাঃ কেন্ট এর "Twelve observation" থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করেছি? আমরা সেখানে দেখি- ঔষধ নির্বাচন সঠিক হলেও ভুল

শক্তি ও মাত্রা নির্বাচনের ফলে আরোগ্যাপযোগী রোগীও কিভাবে আরোগ্যের বাইরে চলে যেতে পারে আবার আরোগ্য সীমার বাইরে চলে গেছে এমন রোগীও সঠিক শক্তিতে ঔষধ প্রয়োগের ফলে ধীরে ধীরে আরোগ্যাপযোগী হয়ে উঠতে পারে। Homeopathic aggravation, Medicinal aggravation প্রভৃতি ঘটনাও ঔষধের শক্তি নির্বাচনের ত্রুটি ও মাত্রার আধিক্য হেতু ঘটে থাকে। কাজেই ঔষধ নির্বাচন সঠিক হলেও ঔষধের শক্তি ও মাত্রা সঠিক না হলে হোমিওপ্যাথিতে আরোগ্য হয় না বা আরোগ্যলাভে অহেতুক বিলম্ব ঘটে।

হোমিওপ্যাথিতে নিজের জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঔষধ নির্বাচনের অক্ষমতা নয়, ঔষধের শক্তি ও মাত্রা নির্ধারণে অসাবধানতা ও অক্ষমতাই এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী। পরিশেষে তাই সব হোমিওপ্যাথি-সেবকদের অনুরোধ করবো- শুধু সদৃশ ঔষধের সঠিক নির্বাচনই নয়, ঔষধের সঠিক শক্তি ও মাত্রা সম্বন্ধে আরও বেশী সচেতন হোন এবং দেখুন হোমিওপ্যাথি যা আপনাকে দিয়েছে বা দিচ্ছে তার চেয়ে বেশী কিছু দিতে পারে কি না।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে ঔষধের শক্তি-নির্বাচনের ওপর এবং রোগীর রোগ-প্রবণতা অনুসারে সেই শক্তি - নির্বাচন করতে হয়-একথা জানার পর এবারে দেখা যাক কোথায়, কি অবস্থায়, কি ধরণের শক্তি নির্বাচন করা দরকার।

জীবনীশক্তির উৎস- 'Vital Principle' যা অর্গ্যাননের ষষ্ঠ সংস্করণে উল্লিখিত হয়েছে। এই 'Vital Principle' থেকে 'Vital force' মানুষের শরীরের প্রতিটি জীবকোষে ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই, 'Vital Principle' এর একটা Substantial অস্তিত্ব কল্পনা করতে হবে। এই Substance অন্যান্য Substance এর মতো চোখে দেখা যায় না। তাই মহামতি কেন্ট এই Substance এর নাম দিয়েছেন 'Simple substance'। রোগের প্রাথমিক স্তরে এই "Vital Principle" তথা জীবনীশক্তি আক্রান্ত হয়। তারপর ধীরে ধীরে তা প্রকাশ পায় অস্বাভাবিক লক্ষণ হিসাবে, যার শেষ পরিণতি হিসাবে আসে যান্ত্রিক পরিবর্তন। রোগের আক্রমণ থেকে শুরু করে যান্ত্রিক পরিবর্তনের

পূর্ব পর্যন্ত রোগের যে অবস্থা, তাকে বলে 'Dynamic Pathology'। যান্ত্রিক পরিবর্তনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হল Organic Pathology, যা আমরা Pathology বইতে পাই।

Dynamic Pathological Stage-ই প্রধানতঃ স্নায়ুর আক্রমণই প্রকাশ পায় বিভিন্ন লক্ষণের মাধ্যম্যে। কাজেই এই stage -এ রোগীর প্রবণতা কমে যাওয়ার কোনো কারণ ঘটে না। এই ধরণের চির-রোগে আমরা উচ্চশক্তির ঔষধ এক মাত্রা দিয়ে অপেক্ষা করলেই আশানুরূপ ফল দেখতে পাবো এবং যতদিন তার ক্রিয়া চলতে থাকবে, ততদিন শুধু Placebo দিয়ে অপেক্ষা করবো। এসব ক্ষেত্রে উচ্চশক্তির ঔষধ অহেতুক বারবার repeat করলে বিপরীত ফল ফলবে। Dynamic stage এর রোগী ঔষধের ক্রিয়াজনিত Organic change এ রূপান্তরিত হবে। রোগীর ভাল করতে যেয়ে আমরা খারাপই করে বসবো। এ ধরণের ঘটনা আজকাল এত বেশী হচ্ছে যে, আমাদের ভেবে দেখার দরকার হয়ে পড়েছে, আমরা অর্গাননের প্রথম সূত্রটাও অন্ততঃ পড়েছি বা মনে রেখেছি কি না। আজকাল Neurotics এবং নানারকম মানসিক রোগাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা যে কত বেশী তা চিকিৎসক মাত্রেই জানেন। এই সব রোগীদের প্রবণতা বেশী বলেই তারা খুব সামান্য কারণেই আক্রান্ত হয়। কাজেই উচ্চশক্তির ঔষধ সামান্যতম মাত্রায় প্রয়োগ করলে তবেই এদের রোগ প্রবণতা দূর হবে। তা না করে যদি ক্রমাগত উচ্চ অথবা নিম্নশক্তিতে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তবে তাদের স্নায়বিক উত্তেজনা উত্তরোত্তর বাড়বে এবং ক্রমাগত ঔষধঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগী দুরারোগ্য হয়ে পড়বে।

এই সব রোগীদের মধ্যে ব্যতিক্রম হলো Idiosyncratic রোগীরা। এই সব রোগীর প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। কিন্ত তাই বলে সর্বাধিক উচ্চশক্তিতে ঔষধ দিলে সমূহ বিপদ দেখা দেবে। এদের ক্ষেত্রে ৩০ শক্তির ঔষধের কয়েকটা গ্লোবিউল মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য শোঁকানোই যথেষ্ট। তারপর ২/৩ অথবা ৬ মাস পরে হয়ত আবার অনুরূপভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অন্যথায় এদের আরোগ্যলাভের কোনো সম্ভাবনা নেই।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদেরও স্নায়ুই আক্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের প্রবণতা বেশী নয়, বরং তুলনামূলকভাবে কম। এসব ক্ষেত্রে পক্ষাঘাতের কারণের ওপর প্রবণতা নির্ভর করে। যদি স্নায়ুকোষের ধ্বংস বা স্নায়ুর organic পরিবর্তনের জন্য পক্ষাঘাত হয় তবে প্রবণতা সাধারণতঃ কম হয়। পক্ষান্তরে যদি শুধু প্রদাহজনিত কারণে হয় বা (organic) পরিবর্তন না থাকে, তবে প্রবণতা সাধারণতঃ বেশীই থাকে। তাই Hemiplegia, Paraplegia, Brain tumor প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিম্নশক্তির ঔষধ (৩০ শক্তির বেশী নয়) বার বার প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু Bell's Palsy, Epilepsy এবং অজ্ঞাত কারণ সম্ভূত পক্ষাঘাত রোগে উচ্চশক্তির ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে আশাতীত ফল লাভ করা যায়। এই ধরণের রোগীতে এক মাত্রা যথেষ্ট নাও হতে পারে। কারণ স্নায়বিক অবসাদ কাটাতে হলে বা উত্তেজিত স্নায়ুকে শান্ত করতে হলে বার বার ঔষধ প্রয়োগের একান্ত প্রয়োজন। পাঠকগণ এসব ক্ষেত্রে ৫০ সহস্রতমিক শক্তির ঔষধ ব্যবহার করে দেখেছেন কি? যদি না করে থাকেন, তবে করে দেখুন না, কিছু ভাল ফল লাভ করতে পারেন কিনা?

তরুণ রোগে প্রবণতা স্বভাবতই বেশী থাকে। কারণ, যান্ত্রিক পরিবর্তন বিশেষ কিছু হয় না, হলেও তা হয় সাময়িক, অর্থাৎ তাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। কাজেই, এসব ক্ষেত্রে উচ্চ শক্তির ঔষধ উপযুক্ত সময় অন্তর বারবার প্রয়োগ করলে অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ হবে। আমদের দেশে, কেন জানি না, তরুণ রোগে নিম্ন শক্তির ঔষধ দেবার রীতি বহুদিন থেকে চলে আসছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে উচ্চ শক্তির ঔষধ ঠিক মতো প্রয়োগ করতে পারলে আশাতীত ফল লাভ করা যায়, যা কিনা antibiotics দিয়েও হয়ত সম্ভব নয়। একটা Influenza রোগীকে Rhus-tox ৩০ শক্তিতে দিয়ে যদি ৪/৫ দিনে ভালো হয়, তবে ১০০ বা হাজার শক্তিতে দিয়ে দু-এক দিনেই ভাল করা সম্ভব বলে আবার অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা antibiotics এর যুগে বাস করছি। রোগী যদি antibiotics খেয়ে ১ সপ্তাহে মোটামুটি কর্মক্ষম হয়ে উঠতে পারে, তবে ৩/৪ সপ্তাহ

পরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খেয়ে সুস্থ হতে রাজী হবে না কিছুতেই। কারণ, ভবিষ্যতে কি ঘটবে-এ নিয়ে বেশীর ভাগ লোকই কোনো রকম চিন্তা করেন না। আপাততঃ কি করে দ্রুত সুস্থ হয়ে কাজ করে অন্নসংস্থান করা যায়, সেই চেষ্টাই তাঁরা করবেন এবং আমাদের দরিদ্র দেশে সেটাই স্বাভাবিক। কাজেই ৩ সপ্তাহের আরোগ্যকে কিভাবে ৩ দিনে বা অন্ততঃ এক সপ্তাহের মধ্যে আনা যায়, সেই চেষ্টা বা চিন্তাই করা উচিত। যা আমরা করছি, তা অবশ্যই ভালো। কিন্তু চেষ্টা করলে এর চেয়েও অনেক বেশী ভালো আমরা করতে পারি বৈকি? এখানে মনে রাখতে হবে যে, সব রকম তরুণ রোগে প্রবণতা বেশী থাকে না। যেমন- কলেরা, গুরুতর উদরাময়, ক্রমাগত রক্তস্রাব ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে জীবনীশক্তি ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হয়- ফলে প্রবণতা কমে যায়। কাজেই এসব ক্ষেত্রে উচ্চ শক্তিতে ঔষধ প্রয়োগ করলে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে। এখানে নিম্নশক্তিতে, যথা-৩,৬,১২ বা সর্বোচ্চ ৩০ শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করাই বিধেয়। তাহলে মূলকথা সেই প্রবণতা। তরুণ রোগ মাত্রেই উচ্চশক্তিসম্পন্ন ঔষধ প্রয়োগ করলে চলবে না। রোগী বিশেষে, তার প্রবণতা বুঝে উচ্চ বা নিম্নশক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

কলিক পেন বা অসহ্য যন্ত্রণার ক্ষেত্রে যদি Organic কারণ বিদ্যমান থাকে, তবে নিম্নশক্তি এবং Organic কারণ না থাকলে উচ্চ শক্তির প্রয়োগ সাধারণভাবে বিধেয়।

Psora, Syphilis, Sycosis এর primary অবস্থায় উচ্চ শক্তির পুনঃ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু Secondary অবস্থায় যখন organic destruction হয়ে যায়, তখন নিম্নশক্তিতে সঠিক ব্যবধানে বার বার প্রয়োগ করা উচিত।

টিউমার আঁচিল প্রভৃতি অর্বুদ জাতীয় রোগীতে প্রথমে নিম্নশক্তি বার বার প্রয়োগ করে ঔষধে ফল পাওয়া মাত্র উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করা ভাল। কারণ, টিউমার organic change হওয়া সত্ত্বেও রোগীর প্রবণতা সাধারণতঃ বেশী থাকে। কাজেই উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ না করলে সাময়িক উপশম হলেও স্থায়ী আরোগ্য হবে না। Dynamic Pathology-র পরিণত ফল হলো টিউমার। কাজেই Dynamic plane এ পৌছাতে

পারে এমন শক্তিতে প্রয়োগ করলে, তবেই Vital forceতথা vital principle রোগমুক্ত হবে। যদি টিউমার থেকেও যায়, তবু তার Mechanical effect ছাড়া রোগীর আর কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না। Cancer, sarcoma প্রভৃতির advanced stage-এ কিন্তু নিম্নশক্তি প্রয়োগ করা বিধেয়। আমাদের দেশের চিকিৎসকদের চিররোগের ক্ষেত্রে উচ্চশক্তি এবং তরুণ রোগের ক্ষেত্রে নিম্নশক্তির প্রয়োগ সম্পূর্ণ হোমিও দর্শন বিরোধী। অবশ্য ঔষধের শক্তি নির্বাচন হোমিওপ্যাথির জন্মলগ্ন থেকেই একটা প্রধান সমস্যা-এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হ্যানিম্যান সারাজীবন এই নিয়ে চিন্তা করেছেন। তারই ফলশ্রুতি ৫০ সহস্রতমিক শক্তি। এই শক্তিতে ঔষধ-নির্বাচন করলে সকলেই ঔষধের শক্তি সমস্যার সমাধানে অনেকাংশে সফল হবেন-এই আমার বিশ্বাস।

আমরা দেখলাম যে প্রবণতাই হলো ঔষধের শক্তি-নির্বাচনের মূল ভিত্তি। এই প্রবণতা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। একটু চিন্তা করলেই রোগীর লক্ষণসমষ্টি থেকে তার প্রবণতা সম্বন্ধে মোটামুটি সঠিক ধারণা করা যায়। সেই মত শক্তি-নির্বাচন করে ঔষধ প্রয়োগ করলে অবশ্যই ভাল ফল হবে। কিন্তু আমরা ঔষধ নির্বাচনকেই আমাদের একমাত্র কর্তব্য মনে করি। তাই সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করেও আমরা ব্যর্থ হই। আসুন, সবাই ঔষধের শক্তি ও মাত্রা সম্বন্ধে আরও সচেতন হই।

ঔষধের মাত্রা নির্বাচন ও পুনঃ প্রয়োগ

সঠিক ঔষধ ও তার শক্তি নির্বাচনের পর চিকিৎসকের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো ঔষধের মাত্রা নির্বাচন। শক্তি নির্বাচনের মত, ঔষধের মাত্রা নির্বাচনেও আমাদের মধ্যে তীব্র মত পার্থক্য দেখা যায়। কেউ ৩০ বা ২০০ শক্তির ১ মাত্রা দিয়ে তার ফল পর্যবেক্ষণ করেন, কেউ ৩০, ২০০, ১০০০, এমনকি ১০,০০০ শক্তির ঔষধ প্রত্যহ একবার বা একাধিকবার প্রয়োগ করেন। কেউ বা আবার মাসের পর মাস এইভাবে একই ঔষধ ক্রমাগত রোগীকে খেয়ে যেতে নির্দেশ দেন। সবচেয়ে মজার কথা হলো, সকলেই দাবী করেন তাঁর প্রয়োগ পদ্ধতিটাই সঠিক। কারণ, তিনি এইভাবে প্রয়োগ করে ফল পেয়ে থাকেন। তারপর আবার মাত্রার পরিমাণগত পার্থক্য যথেষ্ট। কেউ ৪টি ২০ নং গ্লোবিউলকে একমাত্রা বলে মনে করেন, কেউ পুরোপুরি এক ফোঁটাকেই একমাত্রা মনে করেন, আবার কেউ ১০ নং বা ২০ নং গ্লোবিউলের একটিকে একমাত্রা ধরেন। বেশী পরিমাণে ঔষধ যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের যুক্তি হ'ল Potentised ঔষধের মধ্যে Crude substance যখন নেই, তখন তার একটি গ্লোবিউলও যা, চারটি, ছয়টি গ্লোবিউলও তাই। এতে কিছু যায় আসে না। Dynamis এর আবার পরিমাণ কি? আমি বুঝতে পারি না, আমাদের মধ্যে এই ধরণের মনগড়া ব্যাখ্যা আসে কি করে? সব প্রশ্নের জবাবই কি অর্গ্যাননে দেওয়া নেই? কতটুকুতে এক মাত্রা হওয়া উচিত, কখন ও কিভাবে তার পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে, কি প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করতে হবে,- সবই খুব সুন্দরভাবে 'অর্গ্যানন ও ক্রনিক ডিসিস' গ্রন্থে বর্ণনা করা আছে। তবু কেন এই মতভেদ, কেন আমরা যে যার খেয়াল-খুশীমত চলি? চলি বোধ হয় এই কারণেই যে, আমরা সকলেই নিজেকে হ্যানিম্যান মনে করি। হোমিওপ্যাথিকে বাঁচাতে হলে আমদের এই মানসিকতার পরিবর্তন অপরিহার্য আমরা সবাই যখন একমত হয়ে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলবো, একমাত্র তখনই হোমিওপ্যাথির বিজয়বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে অবমাননাকর উক্তির অবসান হবে।

অর্গ্যাননের চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত হ্যানিম্যান এক মাত্রা ঔষধ প্রয়োগের পর দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার কথা বলেছেন, অর্থাৎ যতদিন সেই একমাত্রা কাজ করবে, ততদিন শুধু Placebo দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর

ঔষধের কাজ শেষ হয়ে গেলে তবেই প্রয়োজন বোধে পুনঃ প্রয়োগের কথা বলেছেন। এর মধ্যে অহেতুক পুনঃ প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। যাঁরা হ্যানিম্যানিয়ান হোমিওপ্যাথি করেন, তাঁরা অনেকেই আজও এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং ঔষধের ক্রিয়া বুঝতে, দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্বাচন করতে এই পদ্ধতি যে শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। এতে রোগীর আরোগ্যলাভে একটু দেরী হলেও কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা একেবারেই নেই যদি যথাযথভাবে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু হ্যানিম্যান রোগ নিরাময়ের সর্বোচ্চ আদর্শ সারাজীবন এক মুহুর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি। তাই আরোগ্য কাল কি উপায়ে কমানো যায়, অথচ রোগীর অহেতুক Homeopathic aggravation না হয়, সেই চিন্তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি করে গেছেন। অর্গ্যাননের পঞ্চম সংস্করণে ২৪৬ অনুচ্ছেদে তিনি লিখলেন- যদি আরোগ্য দ্রুততর করতে হয়, তবে উপযুক্ত ব্যবধানে ঔষধ পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু কি সে ব্যবধান, বা কতদিন প্রয়োগ করতে হবে, এ সম্বন্ধে কোনো সঠিক নির্দেশ ছিল না। শুধু এইটুকুই বলা আছে, ঔষধ Liquid form এ দিতে হবে এবং প্রত্যেকবার প্রয়োগ করার আগে medicinal solution-কে কয়েকবার succussion দিয়ে নিতে হবে। Homeopathic aggravation হলে নিম্নশক্তিতে নেমে আসতে হবে, অথবা আংশিক সাদৃশ্য আছে এমন অন্য কোন ঔষধ দিয়ে পুনরায় পূর্বের ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। এই সময় ১০ বারের পরিবর্তে মাত্র ২ বার succussion দেবার কথা বলেছেন। মাত্রার পরিমাণ সম্বন্ধে বলেছেন-এক ফোঁটা ঔষধ ২০০ গ্লোবিউলকে medicated করা যায় এমন আকারের একটি গ্লোবিউল জলে Dissolve করে সেই solution থেকে প্রয়োজনমত পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু তিনি নিজেই পরে দেখলেন এবং আমরাও দেখছি বা দেখি যে, এই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় না। বরং একই solution বার বার succussion দেওয়ায় অহেতুক প্রবল Homeopathic aggravation হয়। তাছাড়া, একমাত্র Idiosyncratic রোগী ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে উচ্চ শক্তি দেবার পর নিম্ন শক্তিতে প্রয়োগ করলে কোনো সুফল পাওয়া যায় না। তাছাড়া Intercurrent ঔষধ হিসাবে আংশিক সদৃশ অন্য ঔষধ প্রয়োগে রোগী আরও জটিল হয়ে পড়ে।

হ্যানিম্যান নিজেও নিশ্চয়ই অনুরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ অর্গ্যাননের পঞ্চম সংস্করণের পর "chronic disease' গ্রন্থের যে

সংস্করণ বের হয়, তাতে তিনি লিখেছেন যে, succussion কমাবার কোন প্রয়োজন নেই। আট-দশবার sucussion দিয়ে medicated solution থেকে এক চামচ নিয়ে আবার সাত-আট চামচ জলে Dissolve করে তার থেকে চা-চামচের এক চামচ এক মাত্রা হিসাবে দিতে ও প্রয়োজনবোধে পুনঃ প্রয়োগ করতে। অর্থাৎ succussion এর সংখ্যা না কমিয়ে ঔষধ প্রয়োগের পূর্বে আবার জলে dilute করে তারপর প্রয়োগ কতে হবে। এতে ফল পাওয়া গেল আশাতীত এবং এই পদ্ধতিরই সার্থক রূপ দিলেন তিনি অর্গ্যাননের ষষ্ঠ সংস্করণে ৫০ সহস্রতমিক শক্তির প্রবর্তন করে। এই নতুন শক্তিতে ঔষধের পরিমাণ পূর্ববর্তী শক্তির ১০০ ভাগের এক ভাগ-এর স্থলে ৫০,০০০ ভাগের এক ভাগ হবে এবং ১০ বার succussion এর স্থলে ১০০ বার succussion দিতে হবে। অর্থাৎ succussion বেশী দিয়ে অধিকতর শক্তিশালী করতে হবে। কিন্তু, সেই সঙ্গে Dilution -টাও কল্পনাতীতভাবে বাড়াতে হবে। তাছাড়া ঔষধ প্রয়োগের সময় পুনরায় succussion এবং পুনরায় Dilution করতে হবে। অত্যাধিক Dilution এর ফলে ঔষধের ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী হয়, আবার অনেক বেশী succussion দেওয়ায় ক্রিয়া খুব গভীর ও শক্তিশালী হয়। প্রতিবার সেবনে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করায় একই শক্তির ঔষধ বারবার প্রয়োগ করে জীবনীশক্তিকে অহেতুক উত্তেজিত করার কারণ ঘটে না, রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে এবং Homeopathic aggravation-কে স্বচ্ছন্দে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত ঔষধের একটিমাত্র globule(যার ৫০০টি এক ফোঁটা ঔষধে সিক্ত করা চলে) এক বা দু আউন্স Distilled water-এ dissolve করতে হবে। জল যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য চার-পাঁচ ফোঁটা সুরাসার ঐ medicated solution-এ দিতে হবে। এই solution প্রতিবার ব্যবহারের আগে ৬ থেকে ১০ বার succussion দিয়ে তার থেকে চা চামচের এক চামচ নিয়ে আবার সাত-আট চামচ জলে Dissolve করে তার থেকে চা চামচের এক চামচ একমাত্রা হিসাবে রোগীকে দিতে হবে। তরুণ রোগের ক্ষেত্রে এইভাবে এক, দুই বা চার ঘন্টা অন্তর বা তার চেয়েও অল্প সময়ের ব্যবধানে ঔষধ পুনঃ প্রয়োগ করা যাবে এবং চির-রোগে (Chronic disease) প্রতি সপ্তাহে, তিন দিন অন্তর বা একদিন অন্তর

এমন কি প্রত্যহ পুনঃ প্রয়োগ করা যাবে। রোগীর Homeopathic aggravation দেখা দিলে ঔষধ বন্ধ করে aggravation অতিক্রান্ত হওয়ার পর বেশী সময়ের ব্যবধানে আরও বেশী Dilute করে ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। এইভাবে রোগী যতক্ষণ বা যতদিন না সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে ততদিন ঔষধ বার বার প্রয়োগ করা যাবে। চিকিৎসার শেষের দিকে প্রথমে অন্তর্নিহিত লক্ষণগুলি আবার দেখা দিলে বুঝতে হবে আর ঔষধের প্রয়োজন নেই। তখন স্থায়ীভাবে ঔষধ বন্ধ করে দেওয়া যাবে। তবে যদি ঔষধ বন্ধ করার বেশ কিছুদিন পরেও লক্ষণগুলি থেকে যায় তবে অপেক্ষাকৃত উচ্চশক্তিতে অধিকতর ব্যবধানে দু-চার মাত্রা প্রয়োগ করলেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ৫০ সহস্রতমিক শক্তিতেও খুব Homoepathic aggravation হতে দেখা যায়-সেসব ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ করা দরকার। এ বিষয়ে পরবর্তী কোনো প্রবন্ধে লেখার ইচ্ছা রইল। এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হোমিওপ্যাথিক নীতির সফল ও সার্থক প্রয়োগ দ্বারা রোগীকে দ্রুত আরোগ্য করতে হলে খুব কম মাত্রায় বার বার প্রয়োগ করতে হবে। সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস-এর প্রাথমিক অবস্থায় Medicated solution থেকে এক চামচের পরিবর্তে বেশী পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করার কথা অর্গ্যাননের ষষ্ঠ সংস্করণে আছে। বাস্তবক্ষেত্রে এর প্রত্যক্ষ ফল আমি বহু রোগীতে পেয়েছি। তাই সব চিকিৎসক বন্ধুদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ– আসুন সবাই একত্র বসে আলোচনার মাধ্যমে ঔষধ প্রয়োগের একই নীতি অনুসরণ করে রোগীকে যতশীঘ্র সম্ভব স্থায়ী আরোগ্যর চেষ্টা করে Highest ideal of cure -এর সব শর্ত পূরণ করার যোগ্যতা ও গৌরব অর্জন করি। তাহলে "হোমিওপ্যাথিতে আরোগ্যলাভ করতে সারাজীবন কেটে যায়"- এই মিথ্যা অপবাদ আর শুনতে হবে না। জনসাধারণের মধ্যেও হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে ভুল ধারণার অবসান হবে।

সবশেষে একটা কথা বলি- ঔষধ নির্বাচন যদি Totality of symptoms-এর উপর ভিত্তি করে করা না হয়, তবে ৫০ সহস্রতমিক শক্তিতে বার বার প্রয়োগে রোগের সাময়িক উপশম হবে মাত্র, যা রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত ক্ষতিকর- একথা চিকিৎসকমাত্রেরই সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

আরোগ্য পথে অন্তরায়

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সাফল্যের শিখরে আরোহণ করা তখনই সম্ভব যখন আমরা নির্দিষ্ট ক্রমিক সোপানগুলি সুষ্ঠুভাবে অতিক্রম করতে পারি। এর কোনও একটি পর্যায়ে কিছুমাত্র অবহেলা ঘটলে ব্যর্থতা অবধারিত।

ক্রমিক সংখ্যা হিসাবে সাজালে প্রথম সোপানটি হল রোগী লক্ষণ সংগ্রহ। যথার্থ হোমিওপ্যাথিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রোগীর লক্ষণাবলী সংগ্রহ করে সেগুলির সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে যথাযথভাবে চিত্রিত করতে পারলেই আমরা নির্ভূল লক্ষণ সমষ্টিতে (Totality of symptoms) উপনীত হয়ে রোগী চিত্রের সন্ধান পাব। রোগী চিত্রের সহিত যে ভেষজচিত্র সদৃশতম, হবে- সেই ভেষজটিই হবে ঐ রোগীর প্রকৃত ঔষধ। রোগী লক্ষণের মূল্যায়ন সন্নিবেশ এবং সেই ভিত্তিতে ঔষধ নির্বাচন যথাক্রমে আমাদের পরবর্তী সোপানগুলি নির্দেশ করে।

এইভাবে আমাদের সঠিক ঔষধ নির্বাচন হল বটে কিন্তু সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে হলে আরও অনেক সোপান অতিক্রম করতে হবে। এরপর নির্বাচিত ভেষজের শক্তি, মাত্রা ও পুনঃ প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক এবং সেগুলি প্রত্যেকটিই সাফল্যের এক একটি সোপান। এরপরও আছে যথাক্ষেত্রে ভেষজের পরিবর্তন এবং ভেষজ ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক থাকলে তার অনুসন্ধান ও অপসারণ প্রভৃতি।

অবশ্য সোপান আরোহণ এভাবে শুনতে যত সহজ ও সরল মনে হয় বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু মোটেই তা নয়। একটু সহজবোধ্য করার জন্যই এই উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। কার্যতঃ প্রতিটি সোপানে আরোহণের বিশেষ পদ্ধতি আছে- পদে পদে আছে বিচ্যুতির আশঙ্কা। বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে আমরা আরোগ্য পথে প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় সম্বন্ধে আলোচনা করব।

রোগী লক্ষণ সংগ্রহ, লক্ষণের মূল্যায়ণ, লক্ষণ সমষ্টির ভিত্তিতে ভেষজ নির্বাচন এবং ভেষজের শক্তি, মাত্রা ও পুনঃ প্রয়োগ যতই সঠিক হোক না কেন আমাদের সাফল্যের জন্য আরও কয়েকটি সোপান অতিক্রম করতে হবে। তার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় হল ভেষজ ক্রিয়ায় কোন অন্ত রায় সৃষ্টি হচ্ছে কি না এবং হলে তা দূর করার উপযুক্ত ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য এই অন্তরায় বহুবিধ কারণে সৃষ্টি হতে পারে। মোটামুটি সেগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়-১) আভ্যন্তরিক ও ২) বাহ্যিক।

আভ্যন্তরিক কারণের মধ্যে উত্তেজক, ধারক ও বাহক কারণগুলিই প্রধান। দৃঢ়মূল মায়াজমের প্রাধান্য থাকলে গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধানে মায়াজমের স্বরূপ উদঘাটন করে উপযুক্ত মায়াজম দোষঘ্ন চিকিৎসা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। আরও একটি কারণ থাকতে পারে যেখানে সার্জিক্যাল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক এক ব্যক্তি প্রায়ই বেলেডনার লক্ষণ সদৃশ মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পান। কিন্তু বার বার বেলেডনা প্রয়োগেও সাময়িক উপশম ব্যতীত স্থায়ী আরোগ্য হয় না। সে স্থলে মায়াজম ভিত্তিক কারণ থাকা অসম্ভব নয় এবং সেই মত ভেষজ নির্বাচন না হলে স্থায়ী ফল কখনই পাওয়া যাবে না। তেমনি কষ্ট-প্রসবে যতই সদৃশ ভেষজ প্রয়োগ করা হোক না কেন তা বিফলই হবে যদি প্রসবিনীর বস্থিদেশের অস্থির কোন রকম গঠনগত বৈষম্য থাকে- এখানে অস্ত্র চিকিৎসা আবশ্যিক। অতীতে মারাত্মক তরুণ রোগের ইতিহাস থাকলে রোগী আরোগ্যের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। এসব ক্ষেত্রে উক্ত রোগের উপযুক্ত প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করে তারপর ধাতুগত ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। রোগ-সৃষ্ট যান্ত্রিক পরিবর্তনসমূহ অনেক সময় আরোগ্যর পথে অন্তরায় হ'য়ে ওঠে। যেমন আভ্যন্তরিণ একটা বড় টিউমার কোন ধমনী, শিরা বা স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকলে সুনির্বাচিত ঔষধেও কোন ফল হবে না।

বাহ্যিক কারণগুলিও বহুবিধ এবং বর্তমান যুগে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায়শঃই এই কারণগুলির সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। কলকারখানার জন্য দুষিত বায়ুমন্ডল- বিষাক্ত জল, ভেজাল খাদ্য- খাদ্য দ্রব্য রং করার জন্য নানারকম অস্বাস্থ্যকর রাসায়নিক রং-এর এবং মিষ্টত্বের জন্য ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার, কোল্ড ষ্টোরেজে অতিরিক্ত সময়

খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত রাখা, দুগ্ধদাত্রী গবাধি পশুর দেহে নিয়মিত হরমোন প্রয়োগ, নানা রকম ক্ষণিক আরামের আশায় বাতানুকুল গৃহাদি ও বহুবিধ কৃত্রিম ব্যবস্থা, অধিক ফলনের জন্য অতিরিক্ত রাসয়নিক সার ব্যবহার, আণবিক বিস্ফোরণের জন্য বায়ুমন্ডলে তেজস্ক্রিয়তা, স্বাস্থ্যোন্নয়নের নাম যথেচ্ছ ভিটামিন, টনিক, উত্তেজক ও নিদ্রাকর্ষক ভেষজ ব্যবহার, পরিবার পরিকল্পনার নামে নিয়মিত হরমোন বটিকা সেবন, বারংবার নান জাতীয় টিকা প্রভৃতির বহুল প্রচলন ইত্যাদি ইত্যাদি সহস্র রকমের অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

আর একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করব। একটি বালিকাকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছিল। টনসিলাইটিসে ভুগছিল মেয়েটি- আনুষঙ্গিক লিভার ও অন্যান্য উপসর্গও ছিল। লক্ষণ সমষ্টির ভিত্তিতে চিকিৎসা চলতে লাগল। বলতে ভুলে গেছি- মেয়েটির দাদামহাশয় একজন প্রতিষ্ঠিত এ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক। যেহেতু তাঁদের শাস্ত্রে এক্ষেত্রে অস্ত্র চিকিৎসার বিধান এবং হোমিওপ্যাথিক ভেষজ চিকিৎসায় এই রোগ আরোগ্য হতে দেখেছেন সেহেতু তিনিই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছেন। কিছুদিন পর মেয়েটি উচ্চ জ্বর, কাশিতে আক্রান্ত হওয়ায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবুকে রোগীর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। রোগী দেখার পর ডাক্তার বাবু লক্ষ্য করেন টেবিলে একটি 'লিভোজেন' এর শিশি রয়েছে। প্রশ্ন করে জানলেন, ঐ মেয়েটিকেই লিভোজেনও খাওয়ান হচ্ছে। অভিভাবকের নিরীহ উত্তর- ডাক্তারবাবু আপনি তো টনসিলের ঔষুধ দিচ্ছেন কিন্তু ওর লিভারটাও খারাপ, সেজন্য ওর দাদু লিভারের ওষুধটা দিয়েছেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে অনভিজ্ঞ অভিভাবক অথবা রোগীর এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক দাদা মশাই কারও দোষ দেখা যায় না। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকেরই সম্ভাব্য অন্তরায় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত এবং যথাযথ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যায় অভিভাবকের প্রত্যয় জন্মাতে হবে। বাস্তব জীবনে এমন বহু ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান করলে জানতে পারবেন চিকিৎসাধীন রোগীকে বারংবার টিকা, কালমেঘের রস, চিরতা বা ত্রিফলা, ভিটামিন, টনিক ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে বাড়ী থেকে। বিবাহিত মহিলাগণও অনেকেই নিয়মিত হরমোন বটিকা ব্যবহার করছেন।

সর্বশেষ আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। সেটি হচ্ছে আমরা নিজেরাও অধৈর্য্য হয়ে ভেষজ প্রয়োগের পর উহার ক্রিয়া শেষ হবার পূর্বেই ভেষজের পুনঃ প্রয়োগ অথবা ভেষজ পরিবর্তন করে বিষম অন্তরায় সৃষ্টি করে বসি। এ সম্বন্ধেও আমাদের যথেষ্ট অবহিত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে ডাঃ এলিজাবেথ রাইটের স্মরণীয় ও বহুমূল্য উপদেশটি উদ্ধৃত না করে পারছি না- "More of good thing do not make a better thing in Homoepathic prescribing".

অবশ্যই একথা স্বীকার্য যে পূর্বোক্ত অন্তরায়গুলি সব কয়টিই দূর করা চিকিৎসক বা রোগীর ব্যক্তিগত আয়ত্তের মধ্যে আসে না। সে ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক দৃষ্টিভঙ্গির সারবত্তা বিষয়ে জনগণকে ওয়াকিবহাল করতে হবে। আর যেগুলি আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অপসারণ সম্ভব সেগুলি চিকিৎসক ও রোগীপক্ষের যৌথ প্রচেষ্টায় যথাবিহিত ব্যবস্থা করতে হবে, নচেৎ সুনির্বাচিত ঔষধেও আংশিক বা সম্পূর্ণ বিফলতা অবশ্যম্ভাবী।

ঔষধের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

রোগী তার যেসব কষ্ট নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসে, আশা করে ঔষধ খাওয়ার পর তার কষ্ট একেবারে চলে যাবে বা অন্ততঃ কিছুটা উপশম হবে। ঔষধ খেয়ে যে কষ্ট বৃদ্ধি পেতে পারে, পুরাতন চাপা দেওয়া লক্ষণ পুনরায় দেখা দিতে পারে বা নতুন লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে- এসব রোগীর জানার কথা নয়- কাজেই রোগীর নিকট থেকে এ ধরণের রিপোর্ট আশা করাও যায় না। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসাবে আমরা জানি সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগের পর অনেক রকম পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। তার প্রত্যেকটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার না করে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্বাচন করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমরা কি ঔষধের ক্রিয়া সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করি? করি না। কেন? আমরা জানি না বলে? নাকি জেনেও জানি না, বুঝেও বুঝতে চাই না- যা পাই তাতেই খুশী থাকতে চাই বলে অথবা অনায়াস-লব্ধ উপশমকেই চিকিৎসা-জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছি বলে?

আমার ধারণা যাঁরা সত্যিকারের হোমিওপ্যাথি করার চেষ্টা করেন তাঁদের অধিকাংশেরই প্রথম ব্যবস্থাপত্র মোটামুটি সুনির্বাচিত হয়, কিন্তু সেই সুনির্বাচিত ঔষধ কি পরিবর্তন আনতে পারে, কতদিন পরে সেই পরিবর্তন আসতে পারে, কতদিন ধরে সেই পরিবর্তন থাকতে পারে, কোন পরিবর্তন কি নির্দেশ করে ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক অবগত হওয়ার চেষ্টা না করায় অতি দ্রুত ভুল দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্বাচন করে ফেলেন। ফলে বিফলতার সম্মুখীন হন এবং হোমিওপ্যাথির রোগ নিরাময় ক্ষমতায় সন্দিহান হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পান না। ফলে নিজের উপর ধীরে ধীরে আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং ভাগ্যক্রমে একশত রোগীর মধ্যে একটি রোগীকে আরোগ্য করতে পারলে তাতেই খুশী থাকতে বাধ্য হন এবং আত্মতুষ্টি লাভ করেন। সকলের কাছে তাঁর সেই একটি আরোগ্যের কাহিনী ফলাও করে প্রচার করেন কিন্তু বাকি

নিরানব্বইটি রোগী কেন ভাল হলো না তার কারণ অনুসন্ধানের কোন চেষ্টাই করেন না। তাই আজ আরোগ্য শব্দটি শুধু অর্গ্যাননের অলঙ্কার হিসেবেই শোভা পাচ্ছে- প্রকৃত আরোগ্য লাভের ঘটনা অতি বিরল হয়ে উঠেছে। তাই প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগী যেটুকু ফল লাভ করেন সেইটুকু করতে পারলেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আজ আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে ওঠেন এবং সাময়িক বাজিমাৎ করার ঐ বিদ্যাটুকুকে হোমিওপ্যাথিতে তাঁর সাফল্যের কারণ হিসাবে প্রচার করেন এবং সহযেগী চিকিৎসক বন্ধুগণকেও সেই পথ অনুসরণ করতে প্ররোচিত করেন।

আমার জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র, অভিজ্ঞতাই বা কি? তবু সব চিকিৎসক ভাই বোনদের অনুরোধ করছি- প্রথম ব্যবস্থাপত্রে যে ঔষধ নির্বাচিত করবেন- সেটা প্রয়োগের পর সেই ঔষধের নিকট থেকে কি আপনি আশা করেন এবং কতটুকু আশা করেন সে সম্বন্ধে নিজের যেন পরিস্কার একটা ধারণা ও জ্ঞান থাকে। তাহলে রোগী যে রিপোর্টই দিক না কেন তার সঠিক অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন এবং ঔষধ যে রোগীর দেহাভ্যন্তরে কাজ করে চলেছে এই বিষয়ে আপনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবে না কাজেই পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণে কোনই অসুবিধা হবে না। হোমিওপ্যাথিতে যথার্থ সফলকাম চিকিৎসকদের সাফল্যের গোপন চাবিকাঠি বোধ হয় এটাই, অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়।

একটা ১০/১২ বছরের পুরাতন রোগীকে প্রথম ব্যবস্থাপত্রে Kali Carb প্রয়োগের ১০/১২ দিন পরে এসে সে রিপোর্ট দিল- সে বেশ ভাল আছে। স্বভাবতঃই আমরা খুশী হয়ে তাকে Placebo দিয়ে বিদায় করবো। কিন্তু এটা ঠিক হলো কি? ঐটুকু রিপোর্টের উপর কি আমাদের নির্ভর করা উচিত? কি ভাল আছে, কোন কষ্ট তার কমেছে, রোগী মনের দিক দিয়ে কেমন অনুভব করছে, ঔষধ খাওয়ার পর প্রথমদিকে কোন প্রকার বৃদ্ধি হয়েছিল কিনা- এসব কোন কিছু না জেনেই যদি আমরা রোগী ভাল আছে মনে ক'রে Placebo দিই তবে হয়তো মারাত্মক ভুল করবো। এমন কি রোগীর মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। কারণ ঔষধ যদি কয়েকটি লক্ষণ মাত্র কমিয়ে থাকে অথচ রোগী ভাল অনুভব করছে না

তাহলে বুঝতে হবে- ঔষধটা শুধু সাময়িক উপশমদায়ক হিসেবেই কাজ করেছে, কয়েকদিন পরেই মারাত্মকভাবে তার কষ্ট আবার বেড়ে যাবে। Kali Carb এর মত গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ ১০/১২ বছরের পুরাতন রোগীতে কোন প্রকার প্রাথমিক বৃদ্ধি ছাড়াই উপশম ঘটালো এতে আনন্দিত হওয়ার চেয়ে চিন্তিতই হওয়া উচিত এবং প্রয়োজনবোধে তখনই antidote করার ব্যবস্থা করে পরবর্তী ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণ করা কর্তব্য। Totality of Symptoms মিলিয়ে antimiasmatic ঔষধ প্রয়োগ করলে এ ধরণের ফল প্রত্যাশিত নয়। প্রথমে সামান্যতম হলেও বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। তারপর রোগীর লক্ষণসমষ্টিসহ রোগী নিজে সামগ্রিকভাবে ভাল অনুভব করবে। তবেই বোঝা যাবে রোগী ভাল আছে। অবশ্য প্রাথমিক বৃদ্ধি ছাড়াও রোগী ভাল থাকতে পারে (মহামতি কেন্ট-এর চতুর্থ পর্যাবেক্ষণ)-কিন্তু সেখানেও রোগীর কষ্টের উপশমের সাথে রোগীও ভাল অনুভব করবে। তাছাড়া এ ধরণের ফল আমরা সাধারণতঃ তরুণ রোগেই পেয়ে থাকি।

আবার হয়তো প্রথম ব্যবস্থাপত্রের ২/৩ সপ্তাহ পরে এসে রোগী বললো তার কোন কষ্টই কমে নি- যেমন ছিল সব কষ্ট তেমনি আছে। তখনই আমরা ধরে নিই আমাদের ঔষধ নির্বাচন ভুল হয়েছে। কাজেই ঔষধ পরিবর্তন করে নুতন ঔষধ দিই। কিন্তু নিজেদের উপর আস্থা থাকলে আমরা ঐটুকু রিপোর্টেই সন্তুষ্ট না হয়ে বিশদভাবে জানতে চাইব এবং বুঝতে চেষ্টা করবো রোগীর রিপোর্ট এর আসল তাৎপর্য কি? হয়তো দেখা যাবে রোগীর কোন কষ্টই কমেনি সত্যি। বরং কয়েকটি কষ্ট বেশ বেড়ে গেছে এবং ঔষধ খাওয়ার ৩/৪ দিন পর থেকেই এই বৃদ্ধি দেখা দিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে রোগী আগে অফিসে যেতো না, ঘরে শুয়েই দিন কাটাতো, সে এখন নিয়মিত অফিস যাচ্ছে এবং বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্প-গুজবে অংশ নিচ্ছে। অর্থাৎ Homoeopathic aggravation বলতে আমরা যা বুঝি তাই হয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রে Placebo দিয়ে অপেক্ষা না করে আমরা যদি ঔষধ পরিবর্তন করি তবে রোগী আরোগ্যের বাইরে চলে যেতে পারে। তবে রোগীর কষ্ট যদি এত বেশী বেড়ে যায় যে

তার জীবন সংশয় হয়ে উঠেছে তবে অবশ্যই Antidote করতে হবে এবং aggravation শেষ হলে উপযুক্ত সময়ের ব্যবধানে পুনরায় পূর্বের ঔষধ অপেক্ষাকৃত নিম্নশক্তিতে দিতে হবে।

অনেক রোগী ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এসে রিপোর্ট দেয় তার কোন কিছুই উপকার হয় নি। অথচ- প্রতিটি লক্ষণ পৃথকভাবে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল বেশ কয়েকটি কষ্টের উপশম হয়েছে, বাকি কষ্টগুলি কমেনি। আমাদের দেশের অনেক রোগীর ধারণা ডাক্তারবাবুকে উপশম হয়েছে না বলে নিজের অবস্থার কথা বাড়িয়ে বললে ভাল ঔষধ দিবেন- দ্রুত আরোগ্য হবে। নইলে ডাক্তারবাবু রোগী হাতে রেখে রেখে চিকিৎসা করবেন। তাই তাঁরা মিথ্যা করে বাড়িয়ে বলেন। রোগীর এই মানসিক অবস্থা না বুঝে ক্রমাগত ঔষধ পরিবর্তন করলে বিফলতা অবশ্যম্ভাবী। এমনও হতে পারে- রোগীর শিক্ষা, বুদ্ধি ও অনুভবশক্তি এত কম যে সঠিকভাবে নিজের অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলতে পারেন না। এক কথায় হয় ভাল, না হয় খারাপ এই রিপোর্টই দিয়ে থাকেন। এসব ক্ষেত্রেও সতর্কতার সঙ্গে রোগীলিপি পর্যালোচনা না করলে ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

আজকাল 'নিউরোসিস' এত বেশী দেখা দিয়েছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীদের রিপোর্ট সঠিক হয় না। এটা তাঁদের ইচ্ছাকৃত নয়- তাঁদের অস্বাভাবিক মানসিকতাই এর জন্য দায়ী। এদের সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হলে অতি সুক্ষ্ম চিন্তার ও পর্যালোচনার দরকার। এসব ক্ষেত্রে অসাবধানতা ও দ্রুততার সাথে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণ করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

অনেক ধনী ও উচ্চশিক্ষিত রোগী আছেন যাঁদের হোমিওপ্যাথিতে একেবারেই আস্থা নেই। কিন্তু এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় কোন ফল না পেয়ে আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে একটু হোমিওপ্যাথি করে দেখার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের কাছে আসেন। তাঁদের আলাপ আলোচনা থেকে এটাও বেশ বোঝা যায় তাঁরা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এসে হোমিওপ্যাথ তথা হোমিওপ্যাথিকে কৃতার্থ করতেই এসেছেন। এঁদের নিকট থেকে

কদাচিৎ সঠিক রিপোর্ট পাওয়া যায়। রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলেও এঁরা এসে বলেন, "কই ডাক্তারবাবু, আপনার ঔষধের কোন ক্রিয়াই তো বুঝতে পারছি না।" আর যদি কোন লক্ষণ সামান্যও বৃদ্ধি পায় তবে তখনই অ্যালোপাথি করেন এবং আমাদেরকে এসে বলেন- "হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আমার রোগীর Suit করছে না" বা -"প্রচুর অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা হওয়ায় আপনার ঔষধ ঠিক কাজ করছে না"। এসব ক্ষেত্রে ক্রমাগত ঔষধ পরিবর্তন করে কোনই লাভ হবে না বরং দৃঢ়তার সাথে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারলে তবেই রোগীর আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকে। তবে সন্দেহ নেই যে এঁদের আরোগ্য করা অতীব দুরূহ এবং তা করতে হলে মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

একটা যক্ষ্মা রোগীকে গভীর ক্রিয়াশীল কোন ঔষধ প্রয়োগের কয়েক দিন পরে রোগী এসে জানাল সে ভালই আছে - তবে তার কাশি বেড়ে গেছে, জ্বরটাও বেড়েছে, রাত্রে প্রচুর ঘাম হচ্ছে, haemoptysis বেশী হচ্ছে এবং ক্ষুধা কমে গেছে। রোগীর এই অবস্থাকে Homoeopathic aggravation বলে মনে করলে ভুল হবে। কারণ যক্ষ্মারোগের একটা সাধারণ লক্ষণ হলো রোগী খুব আশাবাদী হয়। তাই খুব খারাপ অবস্থাতেও সে বলে, "ভাল আছি"। কিন্তু অন্যান্য লক্ষণগুলি বিচার করলে পরিস্কার বোঝা যাবে যে রোগী মোটেই ভাল নেই- বরং অধিকতর অবনতির দিকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় Placebo দিয়ে অপেক্ষা করলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। এ অবস্থায় ঔষধ নির্বাচন ভুল হয়েছে বলেই বুঝতে হবে। কাজেই শীঘ্র antidote করে নতুন ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

দীর্ঘ দিনের জটিল রোগীকে গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ প্রয়োগের পর Homoeopathic aggravation দেখা দিল, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সেই aggravation চলতে থাকল। এ অবস্থায় Placebo দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলে রোগী ধীরে ধীরে ক্রমাবনতির পথে যাবে। কারণ Homoeopathic aggravation এত দীর্ঘদিন স্থায়ী হওয়ার কথা

নয়। দীর্ঘদিন aggravation চলার অর্থ জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতার অভাব। দেহের অভ্যন্তরে অতিমাত্রায় যান্ত্রিক ধ্বংসই এর কারণ। এই সব রোগীর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা খুবই কম। কাজেই দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে নিম্নশক্তিতে (৩০ শক্তির অধিক নয়) ঔষধ প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে রোগীকে আরোগ্যের স্তরে আনতে হবে। তবেই হয়তো ভবিষ্যতে সুনির্বাচিত ঔষধ উচ্চ শক্তিতে প্রয়োগ করে রোগীকে আরোগ্য করা সম্ভব। এই সব ক্ষেত্রে ৫০ সহস্রতমিক শক্তিতে ঔষধ প্রয়োগ ক'রে আশাতীত ফল পাওয়া যায় এবং বহু দুরারোগ্য রোগীকেও আরোগ্য করা সম্ভব হয়।

কখনও বা প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক aggravation সত্ত্বেও রোগী ভাল অনুভব করে না। মনের উপর গভীরভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ঔষধ অহেতুক খুব উচ্চ শক্তিতে প্রয়োগ করলে বা বিনা কারণে পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করলে রোগী ভাল অনুভব করার পরিবর্তে খারাপই অনুভব করবে এবং চিকিৎসকও বুঝতে না পেরে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে ঔষধ পরিবর্তন করে রোগীর ক্ষতি করবেন।

গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ প্রয়োগের অব্যবহিত পরেই রোগীর কষ্টসমূহ যদি কমে যায় এবং পরে কষ্টসমূহের বৃদ্ধি ঘটে তবে বুঝতে হবে ঔষধটি সুনির্বাচিত হয়নি- কেবলমাত্র কষ্টদায়ক লক্ষণসমষ্টির সাদৃশ্যহেতু সাময়িক উপশম ঘটেছে অথবা ঔষধ নির্বাচন ঠিকই হয়েছে, কিন্তু রোগী আরোগ্যের বাইরে চলে যাওয়ায় জীবনীশক্তি আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে নি। এখানে অবস্থা বুঝে প্রয়োজনানুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী Chronic Disease-এর ক্ষেত্রে ঔষধ প্রয়োগের পর এই ধরণের ফল প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু আমরা রোগী ভাল আছে মনে করে প্রথম ব্যবস্থাপত্রে দেওয়া ঔষধকে আরও উচ্চ শক্তিতে প্রয়োগ করে রোগীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করি।

গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ প্রয়োগের পর প্রাথমিক Homoeopathic aggravation কেটে গেলে রোগী যতদিন ভাল থাকবে ব'লে আশা করা

যায় যদি দেখা যায় তার চেয়ে খুব কম সময় মাত্র ভাল থেকে ঔষধের ক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে তবে বুঝতে হবে- হয় রোগী ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট হওয়ার মত কিছু করেছে বা খেয়েছে অথবা রোগী আরোগ্যের বাইরে চলে গেছে। তরুণ রোগে ঔষধের এই ধরণের ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়া রোগের ভয়াবহতা এবং অধিকতর উচ্চ-শক্তিতে ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ নির্দেশ করে।

রোগীর যদি একটা Kidney, Gall Bladderবা Lungs এর একটা Lobe না থাকে তবে সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করেও রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করা যাবে না। তার সব কষ্ট কমে যেতে পারে কিন্তু রোগী সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করবে না। এ ধরণের রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করা কখনই সম্ভব নয়।

রোগীকে যে ঔষধ যে শক্তিতেই প্রয়োগ করা হোক না কেন সেই ঔষধের লক্ষণসমূহ সেই রোগীতে প্রকাশ পেতে পারে। এর দ্বারা বুঝতে হবে রোগী Idiosyncratic-এসব রোগী আরোগ্য করা অতীব দুরূহ। অনধিক ৩০ শক্তির ঔষধের বটিকা ২/৩ মাস অন্তর একবার মাত্র ঘ্রাণ নিতে দিয়ে এই সব রোগীকে আরোগ্য করার চেষ্টা করা যেতে পারে। অন্যথায় অবিবেচকের ন্যায় ঔষধ পরিবর্তন করলে রোগী অবশ্যই ঔষধজ- রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

ঔষধ প্রয়োগের পর পুরাতন লক্ষণ দেখা দিলে অপেক্ষা করতে হবে যতদিন না ঔষধের ক্রিয়া সম্পূর্ণ শেষ হয়। এই পুরাতন লক্ষণগুলি স্বাভাবিকভাবেই চলে যাবে। কোন ঔষধের দরকার হবে না। কিন্তু যদি এই পুরাতন লক্ষণ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় তবে প্রথম ব্যবস্থাপত্রে দেয় ঔষধ পুনরায় উচ্চ শক্তিতে দিতে হবে।

ঔষধ প্রয়োগের পর যদি অনেক নতুন লক্ষণ দেখা দেয় তবে বুঝতে হবে ঔষধ নির্বাচন ভুল হয়েছে। এক্ষেত্রে antidote করে নতুন ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

ঔষধ প্রয়োগের পর লক্ষণসমূহ যদি Hering's Law-এর বিপরীত পথ অনুসরণ করে তবে বুঝতে হবে ঔষধ নির্বাচন ভুল হয়েছে এবং এই অবস্থায় লক্ষণসমূহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে রোগীর জীবন সংশয় করে তুলতে পারে। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে antidote করে নতুন ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

এছাড়াও ঔষধের আরও কিছু কিছু ক্রিয়া আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি। আমার মত অনেকেরই সে অভিজ্ঞতা আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সবকিছু একবারে লেখা সম্ভব নয়। তাই এখানেই আমার লেখা শেষ করলাম।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র
(The Second Prescription)

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র কথাটির সাথে হোমিওপ্যাথ মাত্রই বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ, উপযোগিতা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে আমাদের অনেকের সম্যক ধারণার অভাব আছে বলেই আমার মনে হয়। এই বিষয়ে সম্যক উপলব্ধির অভাবই হোমিওপ্যাথিতে অকৃতকার্যতার একটা প্রধান কারণ। কাজেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সাফল্যলাভ করতে হলে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে।

যে কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হোমিওপ্যাথের প্রথম ব্যবস্থাপত্র প্রায়শঃই সুনির্বাচিত হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যথার্থভাবে ঔষধের ফলাফল পর্যবেক্ষণ না করে অতি দ্রুত, অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্বাচন করার ফলে রোগী আরোগ্যলাভ তো করেই না, বরং উত্তরোত্তর অবনতির দিকে অগ্রসর হয়। প্রথম ব্যবস্থাপত্রের ঔষধ প্রয়োগের পর রোগীর লক্ষণের অর্থ উপলব্ধি, রোগীর অবস্থা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিটি লক্ষণের সুচিন্তিত বিশ্লেষণ দ্বারাই আমরা দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে একটা সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারি। প্রতিটি দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্বাচনে এইভাবে যুক্তিপূর্ণ সতর্ক পদক্ষেপ অবলম্বন করলে রোগী সম্ভাব্যক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হবে-কখনই বিপথে যাবে না।

যে ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগের পর রোগীর দেহে বা মনে বা উভয়স্তরে কোনো না কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়, তাকেই "প্রথম ব্যবস্থাপত্র" বলা হয়। এইরূপ কোন প্রথম ব্যবস্থাপত্রের পর যে ব্যবস্থাপত্র নির্বাচন করা হয় তাকেই দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যদি প্রথম ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগের পর রোগীর মধ্যে কোনোই পরিবর্তন দেখা না দেয় তবে তাকে ব্যবস্থাপত্র বলা চলে না। এই ধরণের ভুল ব্যবস্থাপত্রের দু'এক মাত্রা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা একমাত্র

ইডিওসিনক্রেটিক ব্যক্তি ছাড়া আর কারও মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দেয় না। এই ধরণের পাঁচটি বা তারও বেশী ব্যবস্থাপত্র নির্বাচন করলেও তাদের কোনটিকেই ব্যবস্থাপত্র হিসাবে গণ্য করা যায় না। দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র প্রথম ব্যবস্থাপত্রকে অনুসরণ করবে। কিন্তু রোগীর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা না দিলে, কি বা কার অনুসরণ করা যাবে? কাজেই প্রথম ব্যবস্থাপত্রের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে রোগীর পরিবর্তিত অবস্থাকে অনুসরণ করে যে ব্যবস্থাপত্র নির্ধারিত করা হয় তাকেই দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র বলে।

অতএব সঠিক দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্বাচন করতে হলে প্রথমেই চিকিৎসককে জানতে হবে একটা ঔষধে রোগীতে কি কি পরিবর্তন হতে পারে এবং কোন পরিবর্তন কি অর্থ বহন করে। তারপর তাকে জানতে হবে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র কত রকমের হয় এবং কোথায় কি ধরণের ব্যবস্থাপত্র নির্বাচন করতে হবে। ধরা যাক, একটা তরুণ রোগের রোগীকে বেলেডোনা তিরিশ শক্তি একমাত্রা প্রয়োগ করা হলো। এক ঘন্টা পরে দেখা গেল রোগীর জ্বর কমে গেছে, যন্ত্রণার উপশম হয়েছে, এবং রোগী সামগ্রিকভাবে ভাল অনুভব করছে অর্থাৎ সুনিশ্চিতভাবে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এখানে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের কোনই প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ রোগীর উন্নতি অব্যাহত থাকবে ততক্ষণ ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে এবং রোগীকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে মাত্র। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ঘন্টা পরে পুনরায় যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং প্রথমে হ্রাস পাওয়া লক্ষণগুলি পুনরায় বৃদ্ধি পায় তবে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে বেলেডোনা অপেক্ষাকৃত উচ্চশক্তিতে পুনঃপ্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু এই রোগীতে যদি প্রথম কয়েক ঘন্টায় সব লক্ষণের বৃদ্ধি দেখা দেয় অথচ রোগী সামগ্রিকভাবে ভাল অনুভব করে তবে নিঃসন্দেহে এটাকে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি বলে বুঝতে হবে এবং এই বৃদ্ধি আপনা-আপনি দূরীভুত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এখানে ঔষধ নির্বাচন ঠিক হয়েছে কিন্তু তার শক্তি বা মাত্রা অধিক হওয়ার জন্য বৃদ্ধি ঘটেছে বলে বুঝতে হবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে এই বৃদ্ধি আপনিই কমে যাবে এবং রোগীর সবকষ্ট কমের দিকে যাবে। কিন্তু যদি কিছুটা কমার পর পুনরায় লক্ষণের বৃদ্ধি ঘটে তবে বেলেডোনা পুনঃপ্রয়োগ করতে হবে তবে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিতে, ন্যূনতম মাত্রায় এবং অধিক সময়ের ব্যবধানে। অবশ্য প্রত্যেক

মাত্রা প্রয়োগের পর তার ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে তবেই তা করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি দুরীভুত হওয়ার পর রোগী ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যাবে এবং ঐ একমাত্রা বেলেডোনাতেই আরোগ্য লাভ করবে। কিন্তু এই বৃদ্ধির জন্য যদি রোগীর জীবন-সংশয় দেখা দেয় তবে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে বেলেডোনার বিষঘ্ন (Antidote) হিসাবে অন্য কোন ঔষধ দিতে হবে এবং সেই ঔষধের ক্রিয়া শেষ হলে অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধির অবসান হলে যদি বেলেডোনার লক্ষণ তখনও বর্তমান থাকে তবে বেলেডোনা তিরিশ-শক্তির চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিতে অনেক বেশী সময়ের ব্যবধানে প্রয়োগ করতে হবে। দুই মাত্রার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ঠিক করতে হবে প্রত্যেক মাত্রার ক্রিয়া বিশেষ সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে।

কিন্তু যদি কয়েক ঘন্টা বা দিন ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকার পর রোগ লক্ষণগুলি সম্পূর্ণ দূরীভুত না হয় বা পূর্বে দূরীভুত লক্ষণগুলি বারবার পুনরাবির্ভূত হতে থাকে এবং প্রথম ব্যবস্থাপত্রের ঔষধ পুনঃপ্রয়োগ করেও এই অবস্থা চলতে থাকে তবে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে প্রথম ব্যবস্থাপত্রের পরিপূরক (Complimentary) কোন ঔষধ দিতে হবে। যেমন, কোন জ্বরের রোগীতে সুনির্বাচিত অ্যাকোনাইট পুনঃপুনঃ প্রয়োগের পরও সম্পূর্ণ নিরাময় না হলে তার পরিপূরক হিসাবে সালফার প্রয়োগ করলে রোগী আরোগ্য লাভ করবে, অবশ্য যদি সালফার-এর কিছু লক্ষণ অন্ততঃ ঐ রোগীতে বর্তমান থাকে।

যদি এই ধরণের কোনো তরুণ- রোগে সুনির্বাচিত ঔষধের প্রত্যেক মাত্রা প্রয়োগের পর ঔষধের ক্রিয়া খুব স্বল্পকাল স্থায়ী হয় এবং তার পরই তীব্র বৃদ্ধি দেখা দেয় তবে বুঝতে হবে যে, রোগীর দেহাভ্যন্তরস্থ প্রদাহজনিত অবস্থা অত্যন্ত প্রবল এবং মারাত্মক। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যবস্থাপত্রের ঔষধ শক্তি পরিবর্তন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিবারই অপেক্ষাকৃত উচ্চশক্তিতে দ্রুত পুনঃপ্রয়োগ করতে হবে। কারণ এই সব ক্ষেত্রে প্রদাহজনিত অবস্থার আধিক্যহেতু ঔষধের ক্রিয়া বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

কিন্তু যদি সব দিক থেকে রোগী বেশ কিছুদিন ভাল থাকার পর আবার সব লক্ষণই পুনরাবির্ভূত হতে থাকে তবে বুঝতে হবে এই তরুণ

রোগের পেছনে কোনো চির-রোগের মায়াজমজনিত ডিসক্রেসিয়া (Dyscrasia) বর্তমান আছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে ঔষধ পরিবর্তন করে কোনো অ্যান্টি-মায়াজমেটিক ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

যদি বর্তমান লক্ষণগুলির উপশম হয়ে কিছু নতুন লক্ষণ দেখা দেয় এবং রোগী ভাল অনুভব না করে তবে দেখতে হবে নতুন লক্ষণগুলি রোগের লক্ষণ কি না? যদি রোগের লক্ষণ হয়, তবে বুঝতে হবে রোগ-বৃদ্ধি ঘটেছে। এক্ষেত্রে, নতুন করে রোগীলিপি তৈরী করে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে ঔষধ পরিবর্তন করতে হবে এবং বর্তমান লক্ষণ-সমষ্টি মিলিয়ে নতুন ঔষধ দিতে হবে। কিন্তু যদি নতুন লক্ষণগুলি যে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছে সেই ঔষধের লক্ষণ হয়। (যা পূর্বে ছিল না) এবং রোগী ভাল অনুভব না করে তবে বুঝতে হবে ঔষধজ-বৃদ্ধি ঘটেছে। এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ব্যবস্থাপত্রের বিষঘ্ন (antidote) কোন ঔষধ দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র হিসাবে নির্বাচন করতে হবে। তারপর ঔষধজ-লক্ষণ দূরীভুত হয়ে যখন রোগীতে পূর্বের লক্ষণ-সমষ্টি পুনরায় প্রকাশ পাবে তখন নতুন করে রোগী-লিপি তৈরী করে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে নতুন ঔষধ দিতে হবে। অবশ্য, ঔষধজ লক্ষণগুলি খুব কষ্টদায়ক না হলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে আপনিই চলে যাবে- কোনো বিষঘ্ন ঔষধের দরকার হবে না। তখন ঔষধ পরিবর্তন করে ভুল সংশোধন করলেই চলবে। তবে তরুণ রোগে বেশীক্ষণ এইভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকা উচিত নয়। কারণ, প্রদাহজনিত অবস্থার তীব্রতাহেতু রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

তরুণ রোগের চেয়ে চির-রোগে (chronic disease) দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্বাচন করা অনেক বেশী শক্তি। কারণ, প্রায়শঃই রোগী তাঁর অতীত ইতিহাস, বংশ ইতিহাস, রোগের সম্ভাব্য উত্তেজক ও বাহক কারণ সমূহ ভুলে যান এবং দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের ফলে লক্ষণের সঠিক প্রকৃতি, হ্রাসবৃদ্ধির ঘটনা, কনকমিট্যান্ট ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সঠিক বর্ণনা করতে পারেন না। তা ছাড়া প্রথম ব্যবস্থাপত্রের পর সামান্য পরিবর্তন রোগী ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারেন না। ফলে চিকিৎসককে ভুল বিবরণ বা রিপোর্ট দেন এবং চিকিৎসকও বিভ্রান্ত হয়ে ভুল ঔষধ নির্বাচন করেন।এই অসুবিধা আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয় একদেশদশী এবং দুরারোগ্য রোগসমূহে।

যাই হোক, প্রথম ব্যবস্থাপত্রের পর যদি কোন চির রোগের রোগীর লক্ষণসমূহ কিছু দিনের জন্য উপশমিত হয়ে পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অথবা পূর্বের দূরীভুত লক্ষণ পুনরায় দেখা দেয় তবে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে পূর্বের দেওয়া ঔষধই অপেক্ষাকৃত উচ্চ-শক্তিতে পুনঃপ্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু যদি কিছুদিন উপশম লাভের পর রোগী একটা স্থিতাবস্থায় এসে দাঁড়ায় তবে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখতে হবে লক্ষণগুলির কোনোরকম হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে কিনা। যদি উপযুক্ত সময়ের ব্যবধানেও লক্ষণের কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হয়, তবে প্রথম ব্যবস্থাপত্রের নির্বাচিত ঔষধই আর একবার উচ্চ শক্তিতে প্রয়োগ করে দেখা দরকার যে, ঐ ঔষধ রোগীর মধ্যে আর কোন পরিবর্তন আনতে পারে কিনা।

যদি প্রথম ব্যবস্থাপত্রের পর কিছু নুতন লক্ষণ দেখা দেয় যা প্রয়োগ করা ঔষধেরও নয় বা পূর্বের অবদমিত অবস্থারও নয় তবে বুঝতে হবে এটা রোগের বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে নতুন করে রোগীলিপি প্রস্তুত করে ঔষধ পরিবর্তন করতে হবে।

যদি নতুন লক্ষণগুলি প্রয়োগ করা ঔষধের লক্ষণ হয়, তবে বুঝতে হবে ভুল ঔষধ নির্বাচন করা হয়েছে এবং তা অহেতুক পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কয়েকদিন অপেক্ষা করলে ঔষধের এই নতুন লক্ষণগুলি আপনই চলে যাবে। তখন পুনরায় লক্ষণ সমষ্টি পর্যালোচনা করে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে নতুন ঔষধ নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু ঔষধের লক্ষণগুলি যদি রোগীর পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক হয়, তবে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র হিসাবে কোনো বিষঘ্ন (antidote) ঔষধ নির্বাচন করতে হবে এবং লক্ষণগুলি দূরীভুত হলে পরবর্তী দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে নতুন ঔষধ সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। রোগী ইডিওসিনক্রেটিক হলে এই ধরণের ঔষধজ বৃদ্ধি সঠিক ঔষধ নির্বাচনের পরও হতে দেখা যায়। এইসব ক্ষেত্রে ঔষধজ লক্ষণগুলি দূরীভুত হলে প্রথম ব্যবস্থাপত্রে নির্বাচিত ঔষধই নিম্নশক্তিতে (তিরিশ শক্তির অধিক নয়) দিতে হবে এবং এই ধরণের রোগীদের জন্য ঘ্রাণের মাধ্যমে ঔষধ প্রয়োগই বাঞ্ছনীয়। এসব ক্ষেত্রে দু-তিন মাসের পূর্বে ঔষধের পুনঃ প্রয়োগও উচিত নয়।

যদি নতুন লক্ষণগুলি রোগীর পুরাতন অবদমিত লক্ষণ হয় তবে বুঝতে হবে রোগটি ডাঃ হেরিং এর আরোগ্য নীতি অনুসরণ করে উন্নতির

পথে অগ্রসর হচ্ছে। এটা খুবই ভাল লক্ষণ। এখানে শুধু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলেই দেখা যাবে কিছুদিন পরে লক্ষণগুলি প্রথম ঔষধের ক্রিয়াতেই ধীরে ধীরে দূরীভুত হবে। কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পরও যদি দেখা যায় যে লক্ষণগুলি দূরীভুত হচ্ছে না, তবে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের প্রথম ব্যবস্থাপত্রের ঔষধই পুনরায় উচ্চ-শক্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। একদেশদশী রোগে আংশিক সদৃশ ঔষধ প্রয়োগের পর এই ধরণের লক্ষণ (accessory symptoms) দেখা দিলে কিছুদিন অপেক্ষা করে প্রথম ঔষধের ক্রিয়া শেষ হলে নতুন করে লক্ষণ সংগ্রহ করতে হবে এবং লক্ষণ- সমষ্টির সামগ্রিক চিত্র মিলিয়ে নতুন ঔষধ নির্বাচন করতে হবে, অবশ্য যদি প্রথমে প্রয়োগ করা ঔষধ তখনও রোগীর ক্ষেত্রে সদৃশ বলে বিবেচিত না হয়।

যদি প্রথম ব্যবস্থাপত্রের পর রোগীর সব লক্ষণ দূরীভুত হয় কিন্তু কিছু সময়ের ব্যবধানে বারবার ঘুরে আসতে থাকে তবে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে প্রথম ঔষধটির পরিপূরক (Complimentary) কোন ঔষধ নির্বাচন করতে হবে। পরিপুরক ঔষধটি অবশ্যই রোগীর লক্ষণ সমষ্টির সদৃশ হওয়া চাই। ধরা যাক একটা মৃগী রোগীতে প্রতিবার অজ্ঞান হওয়া কালীন লক্ষণের সাথে বেলেডোনার লক্ষণ সমষ্টির মিল আছে। এই রোগীকে অজ্ঞানের সময় বেলেডোনা দিলে দ্রুত ফিট ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুদিন পর পর এই ফিট একই লক্ষণ নিয়ে দেখা দিতে থাকলে বেলেডোনার পরিপূরক এবং বেলেডেনার লক্ষণ সমন্বিত ক্যালকেরিয়া-কার্ব দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের দিলে রোগী আরোগ্য লাভ করবে।

যদি চির-রোগের চিকিৎসার সময়ে হঠাৎ কোনো তরুণ রোগ দেখা দেয় এবং রোগীর পক্ষে তা খুবই কষ্টদায়ক হয় তবে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র হিসাবে প্রথম ঔষধের একটা কগনেট (Cognate) ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। যেমন কোনো একটা হাঁপানী রোগীতে কস্টিকাম প্রয়োগ করার পর রোগী সব দিক থেকে ভাল আছে। হঠাৎ তার পায়ে সায়াটিকার ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণা দেখা দিল। এ অবস্থায় দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে কষ্টিকামের কগনেট হিসাবে কলোসিন্থ প্রয়োগ করা যেতে পারে। পায়ের যন্ত্রণা ভাল হলে পুনরায় কস্টিকাম উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে।

যদি সোরাপ্রধান মিশ্র মায়াজমেটিক রোগে সুনির্বাচিত অ্যান্টি-সোরিক ঔষধ প্রয়োগের পর রোগীর সব সোরিক লক্ষণ উপশমিত হয়, কিন্তু রোগী হঠাৎ গলায় বা জিভে ক্ষত বা অন্য কোনো সিফিলিটিক লক্ষণ প্রকাশ করে তবে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে অ্যান্টি-সোরিক পরিবর্তন করে কোন অ্যান্টি সিফিলিটিক ঔষধ নির্বাচন করতে হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন সাইকোটিক লক্ষণ দেখা দেয় তবে অ্যান্টি-সোরিক পরিবর্তন করে অ্যান্টি-সাইকোটিক ঔষধ দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে দিতে হবে। রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার পূর্বে এইভাবে অনেকবার চিকিৎসা-পরিকল্পনা পরিবর্তন (Change in the plan of treatment) করতে হতে পারে।

যদি প্রথম ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগের পর দীর্ঘদিন ধরে হোমিওপ্যাথিক-বৃদ্ধি চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত রোগী অবনতির পথে অগ্রসর হয়, তবে বুঝতে হবে রোগী-আরোগ্য সম্ভাবনাহীন এবং রোগীর শরীর যন্ত্রের এমন ধ্বংস সাধিত হয়েছে যে প্রতিক্রিয়া করার চেষ্টায় আরও বেশী ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে প্রথম ঔষধের বিষঘ্ন (antidote) কোন ঔষধ নিম্নশক্তিতে (তিরিশ-শক্তির অধিক নয়) প্রয়োগ করতে হবে। ভবিষ্যতে আরোগ্যকারী ঔষধ না দিয়ে শুধুমাত্র উপশমদায়ী ঔষধ তিরিশ শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। এইভাবে উপশম দিতে দিতে যদি রোগী আরোগ্যপযোগী হয়ে ওঠে তখন আরোগ্যকারী ঔষধ প্রথমে নিম্নশক্তিতে ব্যবহার করে, পরে উচ্চ শক্তিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তিতে অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়।

আরোগ্য সম্ভাবনার বাইরে যাওয়ার সীমায় পৌঁছেছে এমন রোগীকেও উপরোক্ত উপায়ে আরোগ্য করা যেতে পারে।

যদি প্রথম ব্যবস্থাপত্রের পর প্রথমেই উপমশ দেখা দেয় এবং পরে বৃদ্ধি ঘটে তবে বুঝতে হবে, হয় ঔষধ নির্বাচন ভুল হ'য়েছে অন্যথায় রোগী ছিল আরোগ্য সম্ভাবনাহীন। লক্ষণ-সমষ্টির চিত্র না মিলিয়ে কয়েকটা মাত্র লক্ষণের উপর নির্ভর করে ঔষধ প্রয়োগ করলে এই ধরণের ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে প্রথম ঔষধের বিষঘ্ন (antidote) ঔষধ প্রয়োগ করে পরে লক্ষণ-সমষ্টি মিলিয়ে গভীর ক্রিয়াশীল নতুন অ্যান্টি-মায়াজমেটিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু

ঔষধ নির্বাচন যদি বোঝা যায় ঠিক আছে তবে বিষঘ্ন ঔষধ তিরিশ-শক্তি পর্যন্ত প্রয়োগ করে পরে শুধু উপশমদায়ী ঔষধ দিতে হবে। আরোগ্যোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়মে চিকিৎসা চালাতে হবে।

যদি প্রথম ব্যবস্থাপত্রে নির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগের পর ঔষধের ক্রিয়া যতদিন থাকা উচিত তা না থাকে এবং অতি দ্রুত ঔষধের ক্রিয়া শেষ হয় তবে বুঝতে হবে, হয় রোগী ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট হওয়ার মত কিছু করেছে অন্যথায় রোগীর আরোগ্য সম্ভাবনা নেই। ঔষধের ক্রিয়ার পথে যদি কোন বাধা না থাকে তবে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে শুধু উপশমদায়ী ঔষধই প্রয়োগ করে যেতে হবে যতক্ষণ না রোগী আরোগ্যের পথে আসে। বাধা থাকলে বাধা অপসারিত করে প্রথম ব্যবস্থাপত্রের ঔষধ পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে।

যদি প্রথম ব্যবস্থাপত্রের পর রোগীর সব লক্ষণই কমে যায় কিন্তু রোগী সামগ্রিকভাবে ভাল অনুভব না করে তবে বুঝতে হবে রোগীর শরীরে কোন মূল্যবান দেহযন্ত্রের অভাব আছে এবং এই রোগী কখনোই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবে না। যেমন একটা রোগীর হয়ত প্লীহা বা একটা বৃক্ক অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঔষধের এই ধরণের ফলই পরিলক্ষিত হবে। এখানে রোগীকে সারাজীবন শুধু উপশমদায়ী ঔষধ দিতে হবে।

যদি প্রথম ব্যবস্থাপত্রের পর রোগীর লক্ষণ ডাঃ হেরিং-এর আরোগ্যনীতির বিপরীত পথে ধাবিত হয় তবে বুঝতে হবে ঔষধ নির্বাচন ভুল হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে, বিষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করে পরে লক্ষণ-সমষ্টি মিলিয়ে সঠিক ঔষধ নির্বাচন করতে হবে। যেমন একটা বাতের রোগীতে লিডাম বা ঐ ধরণের কোন ঔষধ প্রয়োগের পর যদি বাতের লক্ষণ কমে যায়, কিন্তু হৃৎপিন্ডে যন্ত্রণা, বুক ধরফড় করা বা শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় তবে বুঝতে হবে এটা খারাপ লক্ষণ। কারণ গ্রন্থি ছেড়ে রোগ অধিকতর মূল্যবান দেহযন্ত্র হৃৎপিন্ডকে আক্রমণ করেছে। এটা ডাঃ হোরিং-এর আরোগ্য নীতি বিরোধী এবং রোগীর পক্ষে অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা।

আরোগ্য সম্ভাবনাহীন রোগ (রোগী)ঃ
(Incurable diseases)

হোমিওপ্যাথি আরোগ্যাপযোগী রোগীকেই আরোগ্য করতে পারে। আরোগ্য সম্ভাবনা যার নেই, এমন রোগীকে হোমিওপ্যাথি আরোগ্য করতে পারে না। কোনো রোগীর চিকিৎসা শুরু করার আগে এই কথাটা আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে, মনে রাখতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে। অন্যথায় অসম্ভবকে সম্ভব, করার প্রচেষ্টায় বিফল হয়ে হাস্যাস্পদ হতে হবে। এমন কি রোগীর সমূহ ক্ষতি হতে পারে। হোমিওপ্যাথির প্রতি অনেকেরেই অবজ্ঞার এবং অবিশ্বাসের কারণ এটাই। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এমন রোগীকে আরোগ্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী দু'দিনের স্থলে চারদিন জ্বরে ভুগলেই তাকে টাইফয়েড বলে মন্তব্য করা হোমিওপ্যাথ তথা হোমিওপ্যাথির গৌরবের পরিচায়ক নয়। এমন ঘটনার কারণ তিনটি। প্রথমতঃ anatomy, শারীরবিদ্যা, রোগবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞতা; দ্বিতীয়ত ঃ ঔষধের ফল পর্যবেক্ষণে অক্ষমতা এবং তৃতীয়তঃ হোমিওপ্যাথির ক্ষমতা ও সীমা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকা। Anatomy, শারীরবিদ্যা, রোগবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান থেকে আমরা মোটামুটি সমস্ত দেহযন্ত্র সমূহের স্বাভাবিক গঠন ও ক্রিয়া এবং তাদের অসুস্থতাজনিত পরিবর্তন এবং তজ্জনিত অবস্থার কথা জানতে পারি এবং কোন পরিবর্তন কোন স্তরে গেলে কোন দেহযন্ত্রের আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব নয়, তাও মোটামুটি বুঝতে পারি। এর সঙ্গে ডাঃ কেন্টের দ্বাদশ পর্যবেক্ষণ, হেরিং-এর আরোগ্য নীতি ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান যুক্ত হলে তবেই আমরা প্রায় সঠিকভাবে বলতে পারি কোন রোগী আরোগ্য হতে পারে এবং কোন রোগী আরোগ্য সম্ভাবনাহীন। এই উভয় জ্ঞান যেটুকু লেখকের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় আজ পর্যন্ত সঞ্চিত হয়েছে তারই ভিত্তিতে আরোগ্য সম্ভাবনাহীন রোগী বোঝবার উপায় এবং সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি তা পরপর লেখা হলো।

১। যে সব ক্ষেত্রে যান্ত্রিক পরিবর্তন এমন পর্যায়ে পৌছায় যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসা সম্ভব নয়, যেমন, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোনো স্নায়ু একবার সম্পূর্ণ ধ্বংস হলে তা আর আরোগ্য করা সম্ভব নয়। কারণ,

এই সব স্নায়ুর গঠনই এমন যে ধ্বংস হলে তার পুনর্গঠন হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই চক্ষুস্নায়ু সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে এমন রোগী যদি দৃষ্টিহীনতার জন্য চিকিৎসা করতে আসে তবে অনায়াসেই বলা যায় যে, এই অবস্থা আরোগ্যযোগ্য নয়। তবে যদি এই শুকিয়ে যাওয়াটা স্নায়ুর সামান্য অংশে হয়ে থাকে বা সবে শুরু হয়েছে এমন হয় তখন তার অসুখটা অন্ততঃ ঐ অবস্থায় দমন করে রাখা যায় যাতে সে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন না হয়। যদি রোগী কোন স্তরে আছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে তবে সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগের ফল পর্যবেক্ষণ করে সে সম্বন্দে সঠিক ধারণা করা যাবে। যদি সুনির্বাচিত ঔষধে রোগীর বিন্দুমাত্র উপকার না হয়, তবে বুঝতে হবে রোগীর আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই। (অবশ্য যদি আরোগ্য-পথে কোন বাধা না থাকে)। এসবক্ষেত্রেও চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। কারণ, যদি রোগীর একটি চোখ নষ্ট হয়ে থাকে তবে ধাতুগত চিকিৎসায় অন্য চোখটি রক্ষা করা যাবে। ঐ স্তরে রোগীটিকে দমন করে রাখা যাবে। এমনকি দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হলেও চিকিৎসার ফলে ঐ রোগাবস্থার অন্য কোন উপসর্গ ভবিষ্যতে দেখা দেবে না। সিরোসিস অব লিভার, হৃৎপিন্ড ও বৃক্কের রোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। সহস্র নামধারী পুরাতন রোগের পৃথক পৃথক নাম উল্লেখ করে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন নেই বলে মনে করি। কিন্তু এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে প্যাথলজির জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ঘোষিত আরোগ্য সম্ভাবনাহীন বহু রোগীও হোমিও চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে, করেছে করছে এবং করবে। এর কারণ Anatomy, শারীরবিদ্যা, রোগবিদ্যা ইত্যাদির জ্ঞান দ্বারা জীবনীশক্তির সঠিক অবস্থা অনুধাবন করা সম্ভব নয়, যেহেতু এগুলি জীবনীশক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুই নির্দেশ করে না। তাছাড়া বাহ্যিক সব রকম পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান দ্বারাও কোন দেহযন্ত্রের সঠিক আভ্যন্তরীন অবস্থা জানা সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে। যে রোগকে আপাত-দৃষ্টিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্যানসার বলে মনে হয় সেটা ক্যানসার নাও হতে পারে। কাজেই আরোগ্য সম্ভাবনা আছে কি নেই এটা সঠিক বলতে হলে ঔষধ প্রয়োগ করে তার ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে তবেই বলা সম্ভব। আজ যে রোগী আরোগ্যসীমার বাইরে চলে গেছে সুচিকিৎসার ফলে অদূর ভবিষ্যতে সেই রোগী হয়তো আরোগ্যযোগ্য হয়ে উঠবে। কাজেই আরোগ্য হবে বা হবে না এ ধরণের কোন দৃঢ় অভিমত বা শেষ কথা কোন চিকিৎসকেই বলা উচিৎ নয়। যাই

হোক ঔষধের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে কিভাবে রোগীর আরোগ্য সম্ভাবনা সম্বন্ধে জানা যাবে এবারে তাই দেখা যাক।

২। সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগের পর যদি দীর্ঘদিন ধরে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি চলে এবং শেষ পর্যন্ত রোগী-ক্রমাবনতির পথে এগিয়ে যায় তবে বুঝতে হবে রোগীর আরোগ্য সম্ভাবনা নেই। কারণ হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি সাধারণতঃ স্বল্পস্থায়ী হয় এবং শেষ পর্যন্ত রোগী আরোগ্যের পথে যায়-এটাই নিয়ম। কিন্তু মাসের পর মাস যদি বৃদ্ধি চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত রোগী মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে ঔষধ নির্বাচন ঠিক থাকলেও রোগীর গঠনগত পরিবর্তনসমূহ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসমূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং ঔষধের শক্তি নির্বাচন রোগীর প্রবণতার চেয়ে বেশী হয়েছে। অবশ্য ঔষধের শক্তি কম হলেই যে রোগী ভাল হতো তা কিন্তু নয়। কারণ রোগীর দেহকলার বিনাশ অপরিবর্তনীয় স্তরে পৌঁছেছে বলেই ঔষধের সামান্য শক্তি বৃদ্ধিতে এই ধরণের বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তিতে ঔষধ প্রয়োগ করলে এই ধরণের পর্যবেক্ষণের দূর্ভাগ্য কখনও হবে বলে মনে হয় না।

৩। সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগের পর কোন রকম প্রাথমিক হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি ছাড়াই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রোগীর লক্ষণের উপশম ঘটা এবং স্বল্পস্থায়ী উপশমের পরই রোগীর লক্ষণের বৃদ্ধি ঘটা। নির্বাচিত ঔষধ যদি সামগ্রিক চিত্র কভার না করে মাত্র কয়েকটি লক্ষণের উপর ভিত্তি ক'রে করা হয় তবে এটা হতে পারে। সেটা অবশ্যই চিকিৎসকের ভুল। প্রকৃতপক্ষে তা উপশম ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু যদি কারণসহ সামগ্রিক চিত্র মিলে যাওয়া সত্ত্বেও এ ধরণের ঘটনা ঘটে তবে বুঝতে হবে রোগীর আরোগ্যের সম্ভাবনা নেই। এ ধরণের ঘটনা আমরা ক্যানসার এবং অন্যান্য দুরারোগ্য রোগে প্রায়ই দেখতে পাই।

৪। যথারীতি হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধির পর যদি উপশম আশানুরূপ স্থায়ী না হয়। যে ঔষধে রোগীর অন্ততঃ একমাস কি দু মাস থাকার কথা সেই ঔষধে যদি মাত্র আট-দশ দিন ভাল থেকে সব লক্ষণ আবার পূর্বের অবস্থায় প্রকাশ পায় বা বৃদ্ধি পায় তবে রোগীর আরোগ্য সম্ভাবনা নেই বলে বুঝতে হবে অবশ্য যদি আরোগ্য পথে কোন বাধা নেই বলে স্থির নিশ্চিত হওয়া যায় একমাত্র তবেই।

৫। যদি সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগের পর রোগীর সব কষ্ট নিয়মমত আশানুরূপ সময় পর্যন্ত উপশমিত থাকে অথচ রোগী পুরাপুরি ভাল অনুভব না করে তবে বুঝতে হবে রোগীর শরীরে কোন মূল্যবান দেহযন্ত্রের অভাব আছে এবং রোগীর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের কোনই সম্ভাবনা নেই। যেমন কারও প্লীহা বা একটা বৃক্ক পূর্বে অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া হয়েছে এমন রোগী।

৬। সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগের পরও যদি লক্ষণ সমূহ হেরিং এর নীতির বিপরীত পথ অনুসরণ করে তবে বুঝতে হবে জীবনী শক্তির আরোগ্য ক্ষমতা নেই বলেই প্রকৃতি খুব গভীর প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে শুধু Surface (অগভীর) লক্ষণগুলি কমাবার চেষ্টা করছে। ফলে আভ্যন্তরীণ মূল্যবান দেহান্ত্র ধ্বংস হবে এবং রোগীর আরোগ্য সম্ভাবনা নেই বলেই বুঝতে হবে।

পরিশেষে পাঠকগণকে অনুরোধ-আরোগ্য সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা নিদান দেবার আগে ন্যূনতম মাত্রায় সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করে তার ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে তবেই তা দেবেন। তার পূর্বে নয়। তাহলে Anatomy, শারীরবিদ্যা ইত্যাদি জানেন না, এমন চিকিৎসকের পক্ষেও সঠিক নিদান দেওয়া অসম্ভব হবে না। প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন এবং ঔষধের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জ্ঞানের সাহায্যে কিভাবে আরোগ্য-সম্ভাবনা জানা যায় তা আলোচনা করা হলো। কিন্তু এছাড়াও আর একটি বিশেষ কথা বলার আছে। দীর্ঘস্থায়ী একদেশদর্শী রোগ (one sided disease) অথবা দীর্ঘমেয়াদী ঔষধজ রোগ (Artificial Chronic disease) অথবা যে কোন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত প্যাথলজিক্যাল অবস্থায় যদি রোগীর স্বাতন্ত্রীকরণ যোগ্য লক্ষণ রোগীতে না পাওয়া যায় তবে রোগীর আরোগ্য সম্ভাবনা খুবই কম বলে বুঝতে হবে। অবশ্য লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও সংগ্রহ করতে না পারা চিকিৎসকের ত্রুটি- এটা ভুলে গেলে চলবে না। কিন্তু সবরকম আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি তা না পাওয়া যায় তবেই রোগীর আরোগ্য সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেবে। এমনকি উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক উপশম দিতে হলেও স্বাতন্ত্রীকরণ যোগ্য দু'একটা লক্ষণ অন্ততঃ দরকার। স্থানীয় লক্ষণকেও উপশম দিতে হলে তার অবস্থান, অনুভূতি, বাহ্যাকৃতি ও কনকমিট্যান্টের কিছু স্বাতন্ত্রজ্ঞাপক লক্ষণ অবশ্যই দরকার। যে রোগীতে তা নেই, হোমিওপ্যাথি সেখানে অসহায়।

অবদমন
(Suppression)

কোনো রোগ আরোগ্যের পূর্বেই তার কোন লক্ষণ চাপা পড়া বা চাপা দেওয়াকে অবদমন (Suppression) বলে। অর্থাৎ লক্ষণটির বাইরের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রোগটি অন্তর্মূখী হয় এবং ক্রমশঃ দেহাভ্যন্তরস্থ হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, যকৃত, মূত্রগ্রন্থি ইত্যাদি অতি মূল্যবান শরীর যন্ত্র সমূহকে আক্রমণ করে। প্রকৃতির নিয়ম এই যে কোন রোগ যখন শুরু হয় তখন তার প্রথম প্রকাশ ঘটে বাইরের কোন অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান অংশ যথা দেহকলা অথবা শারীরবৃত্তীয় অঙ্গের বহিস্তকে। কাজেই রোগের প্রথম প্রকাশ সাধারণতঃ এই ত্বকের উপরেই হয়, ফলতঃ রোগীর জীবন সংশয় হয়ে ওঠার অনেক আগে রোগের প্রতি রোগীর দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু কোন কারণে এই বহিঃপ্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে তখন অভ্যন্তরস্থ মূল্যবান শরীরযন্ত্র (vital organ) সমূহ আক্রান্ত হয়। এই যন্ত্র সমূহ ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'য়ে রোগীর মৃত্যু ঘটায়।

এই অবদমন স্বাভাবিকভাবে হতে পারে আবার ঔষধ, অস্ত্রোপচার প্রভৃতির দ্বারাও ঘটে থাকে। স্বাভাবিক অবদমনের কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত-ঠান্ডা লেগে বা ভয় পেয়ে মাসিক বন্ধ হওয়া, ঘাম বসে জ্বর হওয়া; দুঃখ, ক্ষোভ, মানসিক আঘাত ইত্যাদি চাপা পড়ে মাথা খারাপ হওয়া। রাগ চাপা পড়ে তড়কা হওয়া বা অজ্ঞান হওয়া ইত্যাদি।

অস্বাভাবিক উপায়ে এই অবদমন অনেক রকমের হতে পারে যেমন মলম লাগিয়ে চর্মরোগ চাপা দেওয়া, অস্ত্রোপচারের দ্বারা টিউমার, ফিসচুলা, অর্শ ইত্যাদি চাপা দেওয়া, ক্রমাগত উপশমদায়ক ঔষধ ব্যবহারের ফলে রোগের বহিঃপ্রকাশ চাপা পড়া, চিররোগে বিসদৃশ্য চিকিৎসার ফলে এক রোগের লক্ষণ চাপা পড়ে অন্য রোগের সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

হোমিওপ্যাথ ছাড়া অন্য মতের চিকিৎসকদের পক্ষে এই চাপা পড়া ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। কিন্তু আমরা প্রতিদিন এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি এবং সঠিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগের ফলে বিশ-তিরিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বের চাপা পড়া রোগের পুনরাবির্ভাব ঘটতে দেখছি। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হয়ে আরোগ্য লাভ করেছেন এমন রোগীরাও এই সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। অনেকে তো এই পুনরাবির্ভাবের ভয়ে ইচ্ছা সত্ত্বেও হোমিওপ্যাথি করতে সাহস পান না। যত দীর্ঘদিন পূর্বে রোগ চাপা পড়ার ইতিহাস থাকবে তার পুনরাবির্ভাবের জন্য তত বেশী সময় লাগবে এবং তা আরোগ্য হ'তেও সময় বেশী লাগবে। তাছাড়া দীর্ঘদিন চাপা থাকার পর পুনরায় দেখা দিলে স্বভাবতঃই যতদিন তা থাকে ততদিন রোগী বিশেষভাবে কষ্ট পায় যদিও সামগ্রিকভাবে রোগী ভাল অনুভব করে থাকে।

বর্তমানে ক্যানসার, লিউকিমিয়া, লিউপাস, থ্যালাসিমিয়া, আপ্লাসটিক এনিমিয়া, স্পন্ডিলাইটিস, পাগলামি ইত্যাদি রোগ যে এত বেশী বেড়ে গেছে তার মূল কারণ হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বের অন্তর্গত এই অবদমন। আমাদের মতে এইসব ভিন্ন নামধারী রোগগুলি আসলে একই মায়াজমজনিত অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। কাজেই মায়াজমেটিক চিকিৎসা চালালে তার পূর্বের দেখা দেওয়া বিভিন্ন রূপের ফ্লাশ-ব্যাক ঘটবেই এবং তা আরোগ্যের সুনিশ্চিত লক্ষণ বলে ধরতে হবে। মায়াজম-তত্ত্বে বিশ্বাসী নন এমন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের পক্ষে রোগ চাপা পড়া এবং ভিন্নরূপে তার আত্মপ্রকাশ করা এবং সঠিক চিকিৎসায় পুনরায় আবির্ভূত হওয়া ইত্যাদি সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। তাই আজ হোমিওপ্যাথির নামে চলছে সাময়িক উপশম দেবার প্রচেষ্টা, যে কোন উপায়ে রোগীর বাহ্যিক কষ্টগুলিকে দূরীভূত করা বা কমিয়ে দেওয়া। ফলে বর্তমানের আরোগ্যসম্ভাবনাপূর্ণ রোগী কিছুদিন পরে আরোগ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। রোগী বা চিকিৎসক কেউই তা বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চেষ্টাও করেন না। কোন কোন চিকিৎসক বন্ধু যাঁরা সম্পূর্ণরূপে বিবেককে বিসর্জন দিতে পারেননি তাঁরা হয়তো তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন, তবুও আর্থিক বা সামাজিক কারণে গতানুগতিকতার পথে গা ভাসিয়ে দেন।

এবারে দেখা যাক অবদমনের কুফলজনিত অবস্থার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিতে কিভাবে করতে হবে।

বর্তমান অসুস্থতার পূর্ব পর্যন্ত কোন রোগ কিভাবে চাপা দেওয়া হয়েছে তার পূর্ণ ইতিহাস নিতে হবে। বর্তমান অসুস্থতা কোন স্তরে আছে, রোগীর বয়স কত এবং জীবনী-শক্তির সতেজতা (vitality কেমন তা জানতে হবে। অর্থাৎ প্যাথলজি এবং প্রাকটিশ অব মেডিসিনের জ্ঞান থেকে মোটামুটি বুঝতে হবে রোগীর আরোগ্য সম্ভব কি না। যদি আরোগ্যের সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় তবে অবদমিত অবস্থার যাবতীয় লক্ষণ এবং রোগীর বর্তমান লক্ষণ মিলিয়ে একটা ঔষধ নির্বাচন করতে হবে। বর্তমান লক্ষণ সব যদি নাও মেলে, এমনকি একেবারেই না মেলে তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু অবদমিত অবস্থার লক্ষণ অবশ্যই মেলা চাই। এমনকি তা যদি বিশ-তিরিশ বৎসর আগেকার লক্ষণ হয় তবুও। অবশ্য পূর্বের লক্ষণ না পেলে বর্তমান লক্ষণসমষ্টির চিত্রমিলিয়ে ঔষধ দিলেও পূর্বের অবদমিত অবস্থা পুনরায় ফিরে আসবে। বর্তমানে দেওয়া ঔষধের সঙ্গে পূর্বের অবস্থাও মিলে গেছে বুঝতে হবে। এটা সম্ভব হয় যদি বর্তমানের লক্ষণ-গুলি অপরিবর্তিত থেকে থাকে। কিন্তু বর্তমান লক্ষণগুলি যদি বহু ঔষধ প্রয়োগের ফলে বিকৃতিলাভের ফলশ্রুতি হয়ে থাকে তবে বর্তমান লক্ষণাবলীর উপর সঠিক ঔষধ নির্বাচন করা ঠিক হবে না।

যেভাবেই হোক সঠিক ধাতুগত ঔষধ নির্বাচন করা সম্ভব হলে পূর্বের অবদমিত অবস্থা ফিরে আসতে বাধ্য। হৈ অবদমিত পুরাতন লক্ষণ ফিরে এলে প্রথমে অপেক্ষা করতে হবে। কোন নতুন ঔষধ দেওয়া চলবে না। রোগীর কষ্ট হলেও সে সামগ্রিকভাবে সুস্থ অনুভব করবে। এই পুরাতন ফিরে আসা লক্ষণগুলি দীর্ঘদিন থাকতে পারে। অবশ্য ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে। কিছু যদি এমন হয় দীর্ঘদিন ধরে একই পর্যায়ে আছে- কমছেও না বাড়ছেও না তবে পূর্ব-নির্দিষ্ট ঔষধ পুনরায় অপক্ষোকৃত উচ্চ-শক্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু তাতেও যদি না যায় তবে পুনরায় রোগী-লিপি তৈরী করে বর্তমান অবস্থা মিলিয়ে নতুন ঔষধ দেওয়ার দরকার হতে পারে।

অবশ্য সব সময় অবদমিত অবস্থাটা একই অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না-তা সম্ভবও নয়- যেমন একটা টিউমার অস্ত্রোপচার দ্বারা অপসারণ করলে ঠিক পূর্বের আক্রান্ত স্থানেই টিউমার ফিরে আসবে তা সম্ভব নাও হতে পারে। অন্য যে কোন স্থানে পূর্বের টিউমারের মত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে অথবা পূর্বের চাপা দেওয়া অবস্থা অন্যরূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। যেমন টিউবারকিউলোসিস চাপা পড়ে পাগলামি দেখা দিলে সঠিক ঔষধ প্রয়োগের ফলে টিউবারকিউলোসিস দেখা দেবে না- সামান্য ব্রঙ্কাইটিস বা ঐ ধরণের কম অনিষ্টকর কোন অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং শেষ পর্যন্ত রোগী আরোগ্য লাভ করবে।

অবশ্য এসব ক্ষেত্রে পূর্বের চাপা দেওয়া অবস্থাটা চেনা সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে।

এখানে নিজ অভিজ্ঞতার কথা কিছু উল্লেখ করছি। সাধারণতঃ তরুণ রোগ সম্বন্ধে আমরা জানি যে, একটা সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে তা শেষ হয়- এমনকি অহোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতেও তা আরোগ্য হতে পারে। কারণ, কোন রকমে নির্দিষ্ট সময়টা পার করে দিতে পারলেই রোগীর জীবনী-শক্তি রোগ-শক্তিকে পরাভূত করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবে। কিন্তু তরুণ রোগও ঠিকমত প্রকাশ না পেয়ে বা অসদৃশ চিকিৎসার ফলে চাপা পড়তে পারে এবং চির-রোগ আরোগ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, হামজ্বর একটা অতি সাধারণ তরুণ রোগ, কিন্তু স্বাভাবিক প্রবণতার তারতম্যে অথবা ঔষধ প্রয়োগের ফলে হামজ্বরে হামের উদ্ভেদ যদি ঠিকমত প্রকাশ না পায় তবে হাম লাট খেয়ে যাবে অর্থাৎ চাপা পড়ে যাবে এবং এর কুফল স্বরূপ রোগী নানারকম জটিল ব্যাধিতে ভুগতে পারে। এমনকি ভবিষ্যতে চির-রোগ সমূহ কোন একটা রূপ পরিগ্রহ করে দেখা দিলে সুনির্বাচিত এবং সঠিক ঔষধ প্রয়োগের পরও এই চাপা দেওয়া হামের কুফল তার আরোগ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে। আপাতদৃষ্টিতে এটা অসম্ভব মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি-হামের কুফল দূর করতে পারে এমন কোনও ঔষধ প্রয়োগ

না করা পর্যন্ত রোগী আরোগ্য লাভ করে না। এমনকি হামের কুফল দূর করার জন্য ঔষধ প্রয়োগের ফলে দশ-বার বৎসর (অথবা তারও বেশী) আগেকার চাপা পড়া হাম পুনরায় মৃদুভাবে দেখা দিতে পারে। ঠিক হুবহু হামের মত উদ্ভেদ ও সামান্য জ্বরভাব দেখা দেয়- যেটাকে হাম বলে চেনাই যায় না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যালার্জি বলে ভুল করা হয়। টাইফয়েড, ডিফথিরিয়া, হুপিংকাশি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা খাটে। এগুলি উর্বর মস্তিস্কের কল্পনা প্রসুত নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ প্রকৃত সত্য। অবদমন (Suppression) তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে সঠিক নিয়ম মেনে চিকিৎসা করলে প্রতিদিনই এ ধরণের অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ সকলেরই ঘটবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অবদমনের পর অবদমন হয়ে যে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেটাই বর্তমান দিনের দুরারোগ্য রোগগুলির অন্যতম কারণ। একমাত্র হোমিওপ্যাথিই পারে এর মোকাবিলা করে সমাজকে এইসব দুরারোগ্য রোগের কবল থেকে মুক্ত করতে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও নৈরাশ্যের কথা এই যে, আমরা রোগকে সমূলে উৎপাটিত করার চেষ্টা না করে বরং আশু উপশমদায়ক ঔষধ প্রয়োগ করে পরোক্ষভাবে অবদমনের নীতিকেই চিকিৎসক জীবনের মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করেছি-ভুলে গেছি যে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য রোগীকে তার হৃতস্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়া, উপশম দেওয়া নয়।

টিকার অবদমনজনিত অবস্থায় টিকার প্রতিষেধক কোন ঔষধ না দিলে কোন পুরাতন রোগই আরোগ্য হয় না। এটা কি আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি না? পাচ্ছি। কিন্তু "উপশম দেবার পথে অবদমন কোনো বাধার সৃষ্টি করে না"- এই ভ্রান্ত ধারণার বশেই আমরা টিকার প্রতিষেধক কোন ঔষধ দেবার কথা চিন্তাও করি না। একমাত্র টিকার কুফল-জনিত কোন লক্ষণ সৃষ্টি হলে তখনই টিকার প্রতিষেধক ঔষধের কথা চিন্তা করি। কিন্তু এই আশু উপশমের পথে চললে-একটিও চির-রোগের রোগীকে সারাজীবনে আরোগ্য করা যাবে না, যদি টিকাজনিত অবদমন থাকে এবং

তার প্রতিষেধক ঔষধ না দেওয়া হয়। তবে, ভাগ্যক্রমে যদি নির্বাচিত ঔষধ টিকার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে তবে রোগী অবশ্যই আরোগ্য লাভ করবে, যদিও চিকিৎসকের অজ্ঞাতসারেই তা ঘটবে এবং চিকিৎসক তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না।

পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি
(50, Millesimal Potency)

আরোগ্য কি উপায়ে নিরুপদ্রব ও দ্রুততর করা যায় এই চিন্তা এবং চেষ্টা হ্যানিম্যান জীবনের শেষদিন পর্যন্ত করে গেছেন। তাঁর সময়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলছিল তিনি তার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি হলো। তার "Similia Similibus Curenture" অর্থাৎ সদৃশ লক্ষণ তৈরী করতে পারে এমন ঔষধ দ্বারা রোগ আরোগ্যের নীতিতে উপস্থিত হওয়া। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি প্রকৃতির রোগ আরোগ্যের নীতির (Therapeutic law of nature) উপর প্রতিষ্ঠিত এই চিকিৎসা নীতিতে পৌঁছান। এরপর এলো ঔষধের পরিমাণ হ্রাস এবং শক্তিকৃত করার (Potentisation) সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। অন্যথায় সদৃশ বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব হতো না। এরপর থেকে সারাজীবন তিনি এই চিকিৎসাশাস্ত্রকে পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার অবিরাম ও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

শুরু থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি নির্বাচিত ঔষধ উপযুক্ত শক্তিতে মাত্র এক মাত্রা প্রয়োগ করে অপেক্ষা করতে বলেন এবং যতদিন এই এক মাত্রার ক্রিয়া অব্যাহত থাকবে ততদিন ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ করতে নিষেধ করেন। কারণ, প্রথম মাত্রার ক্রিয়া শেষ হওয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করলে পূর্ব-মাত্রার ক্রিয়া নষ্ট হবে বা ক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হবে এবং রোগীর উন্নতি ব্যহত হবে। এমনকি, প্রথম মাত্রায় ঔষধ কাজ করছিল বলে অহেতুক পুনঃ প্রয়োগের ফলে পরের মাত্রাগুলিতে কোনো কাজ দেখা যাবে না- বা রোগীর লক্ষণের বৃদ্ধি ঘটবে। ফলে, দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে ভুল ঔষধ নির্বাচিত হবে এবং রোগী অবনতির দিকে যাবে। এই পদ্ধতির একটা বিশেষ সুবিধা হল এই যে ঔষধের ক্রিয়া কখন শেষ হলো তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। ফলে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্ধারণে যথেষ্ট সুবিধা হয় এবং রোগীর জটিলতা ক্রমশঃ সুন্দরভাবে দূরীভূত হয়।

কিন্তু হ্যানিম্যান ছিলেন সত্যদ্রষ্টা। তিনি দেখলেন এইভাবে ঔষধ প্রয়োগ করে একটা চির-রোগের রোগীকে আরোগ্য করতে দীর্ঘদিন সময় লেগে যায়। রোগীর পক্ষে এত দীর্ঘদিন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা বড় কঠিন। তাছাড়া আরোগ্যের সর্বোচ্চ আদর্শের একটা শর্ত হলো দ্রুততা। কাজেই, কি উপায়ে দ্রুত আরোগ্য হ'তে পারে অথচ রোগী অহেতুক কষ্ট না পায় এই হলো তার চিন্তা ও লক্ষ্য। তাই তিনি লিখলেন তিনটি শর্ত পূরণ হলে রোগী অর্ধেক, তিন ভাগের একভাগ বা চারভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে আরোগ্য লাভ করতে পারে।

১। ঔষধটি সম্পুর্ণরূপে রোগীচিত্রের সদৃশ হবে।

২। ঔষধের শক্তি নির্বাচন সঠিক হবে।

৩। ঔষধটি উপযুক্ত সময়ের ব্যবধানে বারবার পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে।

কিন্তু এই উপযুক্ত সময়ের ব্যবধান কি এবং কতবারই বা পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে সে সম্বন্ধে সঠিক কোন নির্দেশ ছিল না। তাই আমরা দেখতে পাই তিনি ঔষধের শক্তি ও পুনঃ প্রয়োগের ব্যাপারে বারবার তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। কখনও বলেছেন উচ্চ শক্তিতে বৃদ্ধি হলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন-শক্তিতে নেমে আসতে, কখনও বলেছেন একটা ঔষধ কয়েকবার প্রয়োগের পর বৃদ্ধি দেখা দিলে আংশিক সদৃশ অন্য কোন ঔষধ দু-চার মাত্রা দিয়ে পুনরায় পূর্বের ঔষধে ফিরে যেতে; কখনও বলেছেন দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগের পূর্বে ঔষধসহ শিশিটাকে কয়েকবার Succussion দিয়ে তবে দিতে হবে (Plus System) কিন্তু তবুও তাঁর চির-বাঞ্চিত দ্রুত অথচ নিরুপদ্রব আরোগ্য হচ্ছিল না। তাই একেবারে শেষ পর্যায়ে দেখা গেল তিনি লিখেছেন নির্বাচিত ঔষধ উপযুক্ত শক্তিতে প্রথম মাত্রা প্রয়োগের পর কয়েকবার Succussion দিয়ে ছয়-আট-দশ-বার চামচ জলে এক চামচ নিয়ে সেই দ্রবণ থেকে চা চামচের এক চামচ একমাত্রা হিসাবে দিতে হবে এবং পুনঃ প্রয়োগের সময় উক্ত দ্রবণ থেকেই দিতে হবে। এই প্রক্রিয়াতে তিনি খুব ভাল ফল পেলেন এবং এইভাবেই ঔষধ পুনঃ প্রয়োগ করতে বললেন। কাজেই সরাসরি globuleএ বা সুগার অফ মিল্কে ঔষধ প্রয়োগ করতে তিনি নিষেধ

করলেন। একমাত্র পাতিত জলে অর্থাৎ তরল অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করতে বললেন। ফলে একই ঔষধ দ্বিতীয়বার পুন প্রয়োগের সময় কয়েকটা Succussion দিয়ে তার শক্তিবৃদ্ধি করা সম্ভব হয় এবং মাত্রাও কমানো বাড়ানো যায়। এই প্রক্রিয়ারই সার্থক ফলশ্রুতি হলো পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি। এটা হঠাৎ জন্মলাভ করেনি। হ্যানিম্যানের মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরে অর্গ্যাননের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে বলে এটা তাঁর লেখা নয় এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ ষষ্ঠ সংস্করণে যে যে পরিবর্তন হয়েছে তার কোনটাই হোমিওপ্যাথির নীতি বিরুদ্ধ নয় বরং সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য পূর্ণ। পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ঔষধের শক্তির ক্রমবিকাশ অনুধাবন করলে এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি তাঁর চির-আকাঙ্খিত দ্রুত অথচ নিরুপদ্রব আরোগ্যের একমাত্র হাতিয়ার।

এই হলো পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি প্রচলনের পটভুমি। এবারে দেখা যাক এই শক্তিতে কি প্রক্রিয়ায় ঔষধ তৈরী হয় এবং প্রয়োগ করা হয়।

সব ঔষধেরই প্রথমে তৃতীয় শততমিক শক্তি পর্যন্ত ট্রাইটুরেশন তৈরী করতে হবে। কাজেই ঔষধের পরিমাণগত শক্তি হবে ১/১০,০০০০। এইবার এর একগ্রেণ নিয়ে পাঁচশ ফোঁটা কুড়ি শতাংশ সুরাসারে দ্রবীভুত করতে হবে। এটাই হলো টিনচার। এই টিনচারের এককোঁটা নিয়ে একশ ফোঁটা খাঁটি সুরাসারে মেশাতে হবে এবং একশটি Succussion দিতে হবে। এর এক ফোঁটা দিয়ে পাঁচশ globule-কে সম্পৃক্ত করতে হবে। যে গ্লোবিউল-এর একশটাতে মাত্র একগ্রেণ ওজন হয়) এবং এই সম্পৃক্ত বড়িগুলিকে ব্লটিং কাগজে শুষ্ক করে শিশিতে ভাল কর্ক লাগিয়ে রাখতে হবে। এটাই হলো পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির এক নম্বর শক্তি। শিশির গায়ে ০/১ লিখে রাখতে হবে।

এই ০/১ এর একটি গ্লোবিউল নিয়ে এক ফোঁটা পাতিত জলে দ্রবীভূত করে একশ ফোঁটা খাঁটি সুরাসারের সাথে মেশাতে হবে এবং একশবার Sucussion দিতে হবে। তারপর এর এককোঁটা দিয়ে পাঁচশ গ্লোবিউলকে সম্পৃক্ত করে শুকিয়ে ০/২ লেবেল দিয়ে রাখতে হবে। তাহলে প্রত্যেক শক্তিতে Drug Strength হচ্ছে ১০০×৫০০=১

ফোঁটার পঞ্চাশ হাজার ভাগের এক ভাগ। তাই এর নাম হলো পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি। শততমিক শক্তিতে ঔষধের শক্তি হলো একশ ভাগের এক ভাগ। একটা globule নিয়ে ঔষধের শক্তি-করণ শুরু হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত globule অবস্থাতেই এই প্রক্রিয়ার সমাপ্তি হচ্ছে। তাই এই প্রক্রিয়ার আর এক নাম হলো globule প্রক্রিয়া এবং ঔষধের শক্তি বোঝাতে 'o' এই প্রতীক ব্যবহার করা হয়। 'o' গোলাকৃতি globule-এর প্রতীক।

এবার রোগীকে এই শক্তির ঔষধ কিভাবে প্রয়োগ করা হবে দেখা যাক। নির্বাচিত শক্তির একটিমাত্র বড়ি নিয়ে ৪০/৩০/২০/১৫ বা ৮ টেবিল চামচ জলে দ্রবীভূত করতে হবে। তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা রেকটিফায়েড স্পিরিট দিতে হবে যাতে জলটা কয়েকদিনের মধ্যেই নষ্ট না হয়ে যায়। উক্ত দ্রবণ সহ শিশিকে প্রত্যেকবার ব্যবহারের আগে আট, দশ বা বারো বার Succussion দিতে হবে। তারপর ঐ শিশি থেকে এক টেবিলচামচ একবারে নিয়ে সাত-আট চামচ জলে মিশিয়ে তার থেকে একবারে এক চা-চামচ প্রত্যহ বা একদিন অন্তর (চির-রোগে) এবং দুই থেকে ছয় ঘন্টা অন্তর (তরুণ রোগে) রোগীকে প্রয়োগ করতে হবে। রোগী ভাল অনুভব করলেও এইভাবে প্রত্যেহ বা একদিন অন্তর বা তিনদিন অন্তর বা সপ্তাহে একমাত্রা প্রয়োগ করে যেতে হবে, যতক্ষণ না কোনো বৃদ্ধি ঘটে। বৃদ্ধি (Homoeopathic aggravation) ঘটলে দু-চার দিন ঔষধ বন্ধ রেখে (তরুণ রোগে কয়েক ঘন্টা) পুনরায় পরবর্তী শক্তির ঔষধ আরও অধিক লঘুকরণ করে প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ প্রথম কাপে তৈরী দ্রবণ থেকে এক চামচ নিয়ে আর একটা কাপ বা গ্লাসে একই প্রক্রিয়ায় দ্রবণ তৈরী করে তার থেকে একবারে এক চামচ রোগীকে দিতে হবে। এতেও বৃদ্ধি হলে তৃতীয় কাপ বা গ্লাসে লঘুকৃত করে তার থেকে এক চামচ রোগীকে একবারে প্রয়োগ করতে হবে। প্রত্যেকবার পুনরায় প্রয়োগ করতে হলে ঐ একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে একমাত্র হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি ছাড়া ঔষধ পুনঃ প্রয়োগ করেই যেতে হবে যতক্ষণ বা যতদিন না রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। এটা নিশ্চয়ই নতুন কথা। এতদিন তিনি বলে এসেছিলেন

যতক্ষণ রোগী ভাল থাকবে ততদিন পুনরায় ঔষধ প্রয়োগ যেন না করা হয়। কিন্তু এবার তিনি বললেন ভাল থাকলেও ঔষধ দিতে হবে।এর কারণ হলো এই শক্তির ঔষধের ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাই, দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগের পূর্বেই এর ক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষ হয়ে যায়। এইভাবে প্রয়োগ করতে করতে যদি শেষের দিকে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি দেখা দেয় অথবা পূর্বের চলে যাওয়া লক্ষণগুলি পুনরায় দেখা দেয় তবে কয়েকদিন ঔষধ বন্ধ রেখে, মাত্রা আরও কমিয়ে এবং প্রয়োগকাল আরও বাড়িয়ে প্রয়োগ করতে হবে যতক্ষণ না অবশিষ্ট লক্ষণগুলি দূরীভূত হয়।

সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিসের প্রাথমিক লক্ষণগুলির চিকিৎসা করার সময় যতদিন প্রাথমিক লক্ষণ বর্তমান থাকে ততদিন এইভাবে একবারে কয়েক চামচ প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ দ্রবণ থেকে বেশী পরিমান ঔষধ একবারে প্রয়োগ করতে হবে। কারণ, এখানে বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া প্রাথমিক লক্ষণের অবস্থা দেখে বোঝা যাবে রোগটা কতটা আরোগ্য হলো। যেসব ঔষধের পরিবর্তনশীল ক্রিয়া আছে (Alternating action) সে সব ঔষধে একমাত্রায় ক্রিয়া বোঝা না গেলে শীঘ্রই তার দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করলে ফল বোঝা যাবে। যদি ঔষধ চলাকালীন নতুন লক্ষণ দেখা দেয় বা বর্তমানের লক্ষণগুলি পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে তবে অন্য ঔষধ-নির্বাচন করে ঐ একই নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে।

এই শক্তিতে পরবর্তী শক্তি প্রয়োগে বেশী বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ ০/১ থেকে শুরু করে পরপর ০/২,০/৩,০/৪ এই ভাবে ০/৩০ পর্যন্ত প্রয়োগ করা যায়। কাজেই দুটি শক্তির মধ্যে ব্যবধান খুবই কম। কিন্তু শততমিক শক্তিতে ব্যবধান খুব বেশী হওয়ায় বৃদ্ধিও বেশী হয়, যেমন তিরিশের পর দু'শো, দু'শোর পর এক হাজার ইত্যাদি।

এই শক্তি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য ঃ

ঔষধকে যতটা সম্ভব বেশী শক্তিকৃত করা। কিন্তু একই সঙ্গে তার শক্তির তীব্রতা হ্রাসের জন্য যতটা সম্ভব বেশী পরিমাণ লঘুকরণ করা। ঔষধের ডাইনামিককে নিয়ন্ত্রিত করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে, প্রয়োজনমত পুনঃ প্রয়োগ করা যাবে অথচ বৃদ্ধি ঘটবে না বা ঘটলেও তা

স্বল্পস্থায়ী হবে বা নিয়ন্ত্রিত করা যাবে। হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা আমাদের এ পর্যন্ত ছিল না। পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি সেই অভাব পূরণ করেছে।

এই শক্তির ঔষধ ব্যবহারের সুবিধা ও সুফলঃ

১। হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি যথাসম্ভব কম হয় এবং যেটুকু হয় তাও প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রিত করা যায়। চর্মরোগ, তরুণ রোগ, এবং দুরারোগ্য রোগে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি রোগীকে এত বেশী কষ্ট দেয় বা রোগীর যান্ত্রিক ধ্বংস এমনভাবে ত্বরান্বিত করে যে রোগীর জীবন সংশয় হয়ে ওঠে। কাজেই এইসব ক্ষেত্রে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি এক বিস্ময়কর অবদান।

২। গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধও (যথা লাইকো, ক্যালকেরিয়া ইত্যাদি) প্রয়োজনমত বহুবার এমনকি মাসের পর মাস পুনঃপ্রয়োগ করা যায়।

৩। একই ধাতুগত (Constitutional) ঔষধ যুগপৎ উপশমদায়ী এবং আরোগ্যকারী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। উপশম দেবার জন্য পৃথক ঔষধের দরকার হয় না। ফলে, আরোগ্যসম্ভাবনাহীন রোগীও কিছুদিন পরে আরোগ্যোপযোগী হয়ে ওঠে। সুনির্বাচিত গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ প্রয়োগে কোন ভয়ের কারণ থাকে না। যেমন কোন রোগীতে ফসফরাস দেওয়া দরকার; কিন্তু রোগীর যান্ত্রিক পরিবর্তন এমন স্তরে পৌছেছে যে শততমকি শক্তিতে ফসফরাস দিলে বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এক্ষেত্রে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তিতে কোন বৃদ্ধি হবে না বা হলেও খুব সামান্য হবে এবং তা ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ঔষধের লঘুকরণ ও প্রয়োগকাল বাড়িয়ে দিয়ে।

৪। সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োজনমত পুনঃ প্রয়োগের ফলে দীর্ঘস্থায়ী চিররোগও অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হবে যা অভিজ্ঞতা ছাড়া বিশ্বাস করা কঠিন। দীর্ঘস্থায়ী একজিমা রোগী দু-তিন মাসের মধ্যে আরোগ্য হয়েছে। দশ পনেরো বছরের হাঁপানি রোগী তিন-চার মাসের মধ্যে আরোগ্য হয়েছে। ক্যানসার রোগী ৬/৮ মাসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করেছে। এ ধরণের অসংখ্য আরোগ্যর কথা আমার জনা আছে। অহেতুক নজিরের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই।

৫। ঔষধ নির্বাচন সঠিক হয়েছে কিনা তা দু-চার দিনের মধ্যেই (তরুণ রোগে দু-চার ঘন্টা বা তারও কম সময়ে) বোঝা যায়। অহেতুক দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয় না। সালফার বা থুজা দু'শ শক্তির একমাত্রা প্রয়োগ করে অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ দিন বা তারও বেশী সময় অপেক্ষা করতে হয় তার ক্রিয়া বোঝার জন্য। কিন্তু এই শক্তিতে পরপর কয়েকমাত্রা প্রয়োগ করলেই ঔষধের ক্রিয়া বোঝা যায়। কাজেই রোগীর আরোগ্যের পক্ষে মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট হয় না।

৬। মানসিক রোগের রোগীতে, যেখানে শততমিক শক্তির ঔষধ ন্যূনতম মাত্রায় প্রয়োগ করলেও বৃদ্ধি অনিবার্য এবং রোগীর পক্ষে তা সমূহ ক্ষতিকর সেখানে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তি কোন প্রকার বৃদ্ধি ছাড়াই আরোগ্য ঘটাতে পারে।

৭। একদেশদর্শী রোগে (One side disease) অথবা দুরারোগ্য রোগে বহু রোগীকে আরোগ্যোপযোগী করে তোলা যায়।

৮। দীর্ঘদিনের অবদমিত লক্ষণ পুনঃপ্রকাশের জন্য এই শক্তি সুন্দর কাজ করে। কারণ শততমিক শক্তির দু-এক মাত্রায় যে অবদমিত লক্ষণ প্রকাশিত হতে পারে না এই শক্তিতে পর পর প্রয়োগের ফলে তা প্রকাশ পায় এবং রোগী আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হয়।

৯। সোরা, সিফিলিস, সাইকোসিসের প্রাথমিক স্তরে যেখানে হ্যানিম্যান বেশী পরিমাণে বারবার ঔষধ প্রয়োগ করতে বলেছেন সেখানে এই শক্তি অত্যধিক ফলপ্রসু।

১০। যে সব অবস্থায় উপশমই একমাত্র কাম্য সেখানে আদর্শ উপশম দেবার পক্ষে এই শক্তি অপরিহার্য বলেই মনে করি। কারণ উপশম দিতে যেয়েও যদি রোগীর লক্ষণের বৃদ্ধি ঘটে, তবে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কোনরকম বৃদ্ধি ছাড়াই উপশম একমাত্র এই শক্তির ব্যবহারেই সম্ভব।

এই শক্তির ঔষধ ব্যবহারের অসুবিধাঃ

এই শক্তির ঔষধ সব সময়ই পাতিত জলে প্রয়োগ করতে হবে। কাজেই খুব ভাল মানের পাতিত জল ছাড়া এই ঔষধ দেওয়া যাবে না।

জল যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য খুব ভালমানের রেকটিফায়েড স্পিরিট দরকার। পনেরো দিন বা একমাস যাবত দ্রবণটা যাতে ভাল থাকে তার জন্য ভালমানের কর্ক ও শিশি দরকার। তাছাড়া রোগীর বৃদ্ধি হলেই চিকিৎসককে সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ দেওয়া দরকার। বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কোন সময় ঔষধের লঘুকরণ ও প্রয়োগকাল বৃদ্ধি করতে হতে পারে। কাজেই যেসব রোগী চিকিৎসকের নিকট থেকে অনেক দূরে থাকেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই শক্তি ব্যবহারে কিছুটা অসুবিধা দেখা দেয়। তাছাড়া প্রয়োগ-পদ্ধতির এবং বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের সামান্য তথাকথিত জটিলতাও সাধারণ হোমিওপ্যাথদের এই শক্তির ঔষধ ব্যবহারে নিরুৎসাহী করে তোলে।

কিন্তু রোগীর জীবনের পবিত্র দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত, তাঁদের পক্ষে এই সামান্য অসুবিধার কাছে নতি স্বীকার করা এক মারাত্মক অপরাধ। মানব-কল্যাণে হ্যানিম্যানের এই শেষ, সার্থক এবং বিস্ময়কর অবদানের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হওয়া একান্ত দরকার বলেই মনে করি।

একবারে এক বা একাধিক ঔষধ প্রয়োগ
(Single Medicine or Polypharmacy)

আজকাল হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকদের মধ্যে একবারে তিন চারটি বা তারও বেশী ঔষধ প্রয়োগ করার এক অদ্ভুত প্রবণতা দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, পাঁচ-সাতটা ঔষধের মাদার টিনচার একত্রে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এমনকি শক্তিকৃত ঔষধও তিন চারটি একত্রে মিশিয়ে রোগীকে দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যহ তিন-চারবার বা তারও বেশীবার রোগীকে খাওয়াবার জন্য। হোমিওপ্যাথির মূল নীতি এ নয় তা জেনেও কেন এই অস্বাভাবিক প্রবণতা? আমাদের এই সমস্যার মূলে পৌঁছাতে হবে। শুধু সমালোচনা করে, কঠোর মন্তব্য করে কোন লাভ হবে না বা হচ্ছে না। বরং দিন দিন এই প্রবণতা বাড়ছে বই কমছে না। যদি সদ্য কলেজ থেকে পাশ করা একজন হোমিওপ্যাথ হোমিওপ্যাথির আদর্শ অনুসারে একবারে একটি মাত্র ঔষধ প্রয়োগ করে রোগী আরোগ্য করতে পারেন তবে তিনি কেন একাধিক ঔষধ প্রয়োগ করবেন? কাজেই গলদ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। ব্যবহারিক শিক্ষা না দিয়ে শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা দিলে কখনই হোমিওপ্যাথির উপর আস্থা আসবে না। ফলে, যে কোন উপায়ে হোক রোগীকে উপশম দিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করার চেষ্টাই সবাই করবে এবং সেটাই স্বাভাবিক। চিকিৎসা করতে ব'সে পুরোপুরি নীতি মেনে হোমিওপ্যাথি করতে যেয়ে যদি দেখা যায় একটাও রোগী আরোগ্য হচ্ছে না তবে কি হোমিওপ্যাথিক নীতির উপর আস্থা রেখে চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব? কখনই না। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাই কারও প্রতি কটাক্ষ করা নয়, শুধু সমস্যার কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় বের করার প্রচেষ্টা মাত্র।

অনেকেই যুক্তি দেখান সদৃশ নিয়ম মেনে যদি একাধিক ঔষধে রোগীর সব লক্ষণ কভার করে ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তবে ক্ষতি কি? একবারে একটা ঔষধ যদি কাজ করে তবে একাধিক ঔষধও বা কাজ করবে না কেন? অন্যান্য প্যাথিতে তো পৃথক পৃথক লক্ষণের জন্য পৃথক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। তাতে কি কাজ হয় না? আসলে সদৃশ বিধান মেনে চললেই হলো, একবারে দুটো বা চারটে ঔষধ প্রয়োগ করলেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখতে হবে ধারণাটা ঠিক কিনা?

একাধিক ঔষধ একবারে প্রয়োগ করলে প্রত্যেকটি তার নিজস্ব ক্রিয়া করবে ঠিকই। কিন্তু সেটা কি ধরণের ক্রিয়া, তার পরিণতি কি ইত্যাদি বুঝতে হবে। তিন-চারটি ঔষধের মধ্যে একটিতে হয়ত প্রাথমিক ক্রিয়ায় উদরাময় তৈরীর ক্ষমতা আছে, অন্য আর একটিতে হয়তো কোষ্ঠবদ্ধতা তৈরী হবে। একটিতে হয়ত ক্ষুধা বাড়ার এবং অপরটিতে হয়ত ক্ষুধা কমার লক্ষণ বর্তমান আছে। অথচ প্রত্যেকটি ঔষধই একটি বা দুটি অন্য লক্ষণকে কভার করে। এক্ষেত্রে উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, ক্ষুধাহীনতা, অত্যধিক ক্ষুধা- সব একযোগে যদি শরীর অভ্যন্তরে চলতে থাকে তবে একটি ঔষধ কি অপরটির বিরোধী ক্রিয়া করবে না? তাছাড়া দীর্ঘদিন এমনিভাবে একাধিক ঔষধ প্রয়োগ করতে থাকলে কি শেষ পর্যন্ত একটা ঔষধজ রোগের সৃষ্টি হবে না? তাছাড়া কোন লক্ষণটি কোন ঔষধে কমলো বা বাড়লো সেটাও বা বোঝা যাবে কি করে? দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্বাচন হবে কার ভিত্তিতে? তাছাড়া ক্রমাগত এইভাবে ঔষধ চালাতে থাকলে জীবনীশক্তি তো প্রতিক্রিয়া করার সুযোগই পাবে না। কাজেই আরোগ্য হবে কি করে? আমরা সবাই জানি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রাথমিক ক্রিয়ায় স্বাভাবিক রোগ দূরীভূত হয় এবং জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ায় ঔষধজ রোগ দূরীভুত হয় এবং রোগী সুস্থ হয়। জীবনীশক্তি যদি সে সুযোগই না পায় বা পেলেও একবারে নিশ্চয়ই তিন চার রকমের প্রতিক্রিয়া করতে পারে না, ফলে আরোগ্য সম্ভব হয় না। অন্যান্য প্যাথিতে তিন চারটি ঔষধ একত্রে প্রয়োগে কোন অসুবিধা হয় না। কারণ ঐ সব ক্ষেত্রে ঔষধের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াটাই প্রকাশ পায়। যে ঔষধের যে দেহযন্ত্রের উপর ক্রিয়া আছে, সরাসরি সেখানেই তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এখানে একটি ঔষধের ক্রিয়া অপরটিকে বাধা দিতে পারে না। কারণ সবাই এখানে সমান শক্তিশালী। রোগীর প্রবণতা কম থাক আর বেশী থাক ঔষধ নির্দিষ্ট দেহযন্ত্রের উপর তার স্থূলক্রিয়া করবেই। কিন্তু এইসব প্যাথিতে জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়াকে কোন গুরত্ব দেওয়া হয় না- শুধু ঔষধের প্রাথমিক ক্রিয়াই আরোগ্যকারী ক্রিয়া ব'লে বিবেচিত হয়। কাজেই জীবনীশক্তি প্রতিক্রিয়া করতে পারছে কি না বা পারলে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তা নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন ঘটে না। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে সুক্ষ্ম শীক্ততে (Potentised) ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। কাজেই তার ক্রিয়া রোগীর প্রবণতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। তিন চারটি ঔষধের মধ্যে যেটির বিরুদ্ধে রোগীর প্রবণতা খুব বেশী শুধু সেটির বিরুদ্ধেই লক্ষণ তৈরী হবে। বাকিগুলি আংশিকভাবে বা

একেবারেই কোন লক্ষণ তৈরী করবে না। বরং তিন চারটির মধ্যে যে ঔষধটি তুলনামূলকভাবে সুনির্বাচিত সেটির কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। কারণ সুক্ষ্ম-স্তরে মানুষের দেহযন্ত্র এক সময়ে মাত্র একটি উদ্দীপনায় যথাযথভাবে সাড়া দিতে পারে। বিভিন্ন উদ্দীপনার মধ্যে যেটির শক্তি অধিক শুধু সেইটির বিরুদ্ধেই সমভাবে এবং বিপরীত মুখে জীবনীশক্তি সাড়ার সৃষ্টি করে। কাজেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল শক্তির ঔষধগুলি প্রথমটির প্রাথমিক ক্রিয়ায় অহেতুক বাধার সৃষ্টি করে।

তাছাড়া হোমিওপ্যাথিতে বিভিন্ন লক্ষণকে পৃথক পৃথক রোগ লক্ষণ বলে মনে করা হয় না। একই রোগাবস্থার অসংখ্য লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। তার মধ্য থেকে আমরা রোগীর স্বাতন্ত্র্য খুঁজে বের করি। একে বলে ব্যস্টিবাদ (Individuality)। একজন ব্যক্তি যেমন কতকগুলি দেহগত ও মনোগত প্রকাশের একক তেমনি একটি রোগীও একটা একক। একজন বিশেষ রোগী একটা বিশেষ চিত্র উপস্থাপিত করে, যে চিত্রের সদৃশ অপর একটি চিত্র একটিমাত্র বিশেষ ঔষধেই পাওয়া সম্ভব। ভালভাবে প্রুভিংকৃত যে কোন অ্যান্টি-মায়াজমেটিক ঔষধ একটা রোগীর পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে। কাজেই একটা রোগীর পূর্ণ চিত্র সহ সব লক্ষণ যদি কোন একটা বিশেষ ঔষধে পাওয়া যায় তবে একাধিক ঔষধ দেবার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তাছাড়া রোগীর সামগ্রিক চিত্র ও কারণ মিলিয়ে ঔষধ নির্বাচন করলে যে ঔষধ ভেতর থেকে বাইরে ডাঃ হেরিং-এর নীতি অনুসারে রোগটিকে বিতাড়িত করতে সক্ষম সেখানে যদি আরও দু-চারটি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তবে তারা কিছু কিছু লক্ষণের সাময়িক উপশম ঘটাতে সাহায্য করবে মাত্র- রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করার মত গভীরতা বা ক্ষমতা তাদের নেই। কাজেই ফল এই হবে যে কয়েকটি লক্ষণ ক্রমাগত উপশম দেবার ফলে চাপা পড়ে যাবে এবং রোগী আরোগ্যের পথে বাধার সৃষ্টি হবে। দীর্ঘদিন এই চাপা দেওয়া অব্যাহত থাকলে রোগী দুরারোগ্য হয়ে উঠবে এবং একের পর এক জটিলতার সৃষ্টি করে চলবে। ফলে আরোগ্য-যোগ্য রোগী দুর্ভাগ্যজনকভাবে আরোগ্যের বাইরে চলে যাবে। তাছাড়া একটা মাত্র গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ সুক্ষ্মমাত্রায় একবার মাত্র প্রয়োগের পর যেখানে মাসের পর মাস তার ক্রিয়া চলতে দেখা যায় সেখানে কয়েকটা ঔষধ একত্রে মুড়ি-মুড়কির মত প্রয়োগ করলে তার ফল কি ভয়াবহ ও বিষময় হবে না? অনেকে দাবী করেন তাঁরা নিউমোনিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি তরুণ রোগে একবারে তিন চারটি ঔষধ প্রয়োগ করে অনেক রোগী আরোগ্য

করেছেন এবং করছেন এবং তা তাঁরা যে কোন রোগীতে প্রমাণ করেও দেখাতে পারেন। খুব ভাল কথা। আমি তা অস্বীকারও করছি না। কিন্তু তাঁদেরকে বিনয়ের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তরুণ রোগে এভাবে রোগীর ভাল হওয়া খুবই সম্ভব। তবে এটা আরোগ্য নয়, Recovery মাত্র। তরুণ রোগে নীতিহীনভাবে ঔষধ প্রয়োগ করেও কোন রকমে রোগের মেয়াদটা কাটিয়ে দিতে পারলেই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। এটা তরুণ রোগের ধর্ম। কিন্তু চির-রোগে তা কখনও সম্ভব নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

হ্যানিম্যান নিজেই এই প্রসঙ্গে অর্গ্যাননে লিখেছেন গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা যেমন একটা মাত্র পেঁচার ডাকে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তেমনি একট গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ যখন কাজ করছে তখন যদি অন্য আরও কয়েকটি ঔষধ একত্রে দেওয়া যায় তবে গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধের কাজ অবশ্যই বাধা পাবে এবং ব্যাহত হবে। বার বার এমনি চলতে থাকলে সুনির্বাচিত ঔষধ তার কাজ করতে পারবে না। ঔষধের কাজে বাধা-সৃষ্টি রূপ (Obstacle in the way of cure) কারণ হিসাবে কাজ করবে। ফলে আরোগ্য সম্ভব হবে না।

একথা অবশ্যই স্বীকার করবো যে একটা মাত্র ঔষধ সুক্ষ্ম শক্তিতে ন্যূনতম মাত্রায় প্রয়োগ করে আরোগ্য করা বড় কঠিন কাজ। কিন্তু কঠিন বলেই কি রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর সহজ পথ অনুসরণ করা উচিত?

হ্যানিম্যানের নির্দেশমত রোগী-লিপি তৈরী করে ঠিকমত লক্ষণের মূল্যায়ণ করে, সঠিকভাবে ধারক, বাহক ও উত্তেজক কারণের অনুসন্ধান করে, লক্ষণসমষ্টির সামগ্রিক চিত্র মিলিয়ে ঔষধ নির্বাচন করতে হবে- যে ঔষধে মায়াজম ও অন্যান্য কারণ সহ রোগীর চিত্র হুবহু মিলে যাবে। এই নির্বাচিত ঔষধ রোগীর প্রবণতা অনুসারে ন্যূনতম মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। তার পর ধৈর্য্য ধরে তার ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনমত দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্ধারন করতে হবে। এই সঙ্গে আরোগ্যের পথে কোন বাধা থাকলে, কোন বাহক কারণ বর্তমান থাকলে সেগুলি দূর করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলির সমাধান করতে হবে-যেমন, উপযুক্ত পথ্য, বিশ্রাম ইত্যাদি। তবেই সম্ভব হবে বাঞ্চিত আরোগ্য যা বর্তমান যুগে দূর্লভ হয়ে উঠেছে।

রোগ প্রতিরোধতত্ত্ব ও হোমিওপ্যাথি
(Immunology & Homoeopathy)

বর্তমান যুগে রোগ প্রতিরোধ তত্ত্ব বিষয়টি আমাদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমি মনে করি। কারণ, মহামারির প্রাদুর্ভাব এখনও আমাদের দেশে প্রবলভাবে বর্তমান। চিকিৎসক হিসাবে আমাদের পবিত্র কর্তব্য হলো এইসব মহামারি রোগকে যতদুর সম্ভব প্রতিরোধ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। প্রচলিত রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণরূপে কুফল মুক্ত নয়। কারণ আমরা প্রায়ই এমন বহু রোগীর সম্মুখীন হচ্ছি যাঁরা বসন্ত বা অন্য কোন রোগ প্রতিরোধক টিকা নেবার কুফলে ভুগছেন। কিন্তু আমরা যতদিন পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত ভাল কোন বিকল্প ব্যবস্থা করতে না পারছি, ততদিন পর্যন্ত জনসাধারণকে. প্রচলিত রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ না করতে উপদেশও দিতে পারি না। তাছাড়া বসন্তের টিকা নেওয়া আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক হয়েছে। কাজেই আমরা এর বিরোধিতা করতে পারি না। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতাদর্শ অনুসারে আমরা বিশ্বাস করি যে পুনঃপুনঃ টিকাদানের ফলে হ্যানিম্যানোক্ত সাইকোসিস (Sycosis) এর অনুরূপ একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যার পরিণতিতে কর্কট (cancer) রোগ, বাতজ সন্ধি প্রদাহ (Rheumatoid arthritis) প্রভৃতি দুর্দম্য ও দুরারোগ্য চিররোগের সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই সত্যিই যদি এ সমস্যা সমাধানের বাসনা আমাদের থাকে তাহলে মহামারি রোগ প্রতিরোধের জন্য যথাযোগ্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এর জন্য দরকার বিস্তারিত গবেষণা ও সঠিক তথ্য নির্ণয়। এই গবেষণা যদি ফলপ্রসু হয় তাহলে সরকারের কাছে আমরা যথাযথভাবে তা সুপারিশ করতে পারবো। আমাদের গবেষণালব্ধ সেই রোগ প্রতিরোধক ঔষধ হবে স্বল্প মূল্যের, সহজলভ্য ও সার্বজনিন টিকারূপে পরিগণিত। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রয়োগ পদ্ধতি খুব সহজ এবং এর অনিষ্টকর কোন কুফল না থাকায় জনসাধারণও এটাকে সোৎসাহে এবং সকৃতজ্ঞচিত্রে গ্রহণ করবেন।

রোগ প্রতিরোধ তত্ত্বে হোমিওপ্যাথির ভুমিকা নিয়ে আলোচনার পূর্বে ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ শক্তি কি এবং তার ক্রিয়া প্রকাশের মধ্যে যে সব কার্য-কারণ নিহিত আছে তার উপর সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক।

রোগ প্রতিরোধ শক্তি (Immunity) হলো রোগ সংক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের শরীর অভ্যন্তরস্থ এক প্রতিরক্ষা কৌশল (Defensive Mechanism)। এই রোগ প্রতিরোধ শক্তি দু রকমের হতে পারে- বংশগত অথবা অর্জিত (Inherited or acquired)। বংশগত প্রতিরোধশক্তি (Inherited Immunity) আমরা লাভ করি বংশ পরম্পরাগত উত্তরাধিকার সূত্রে (Genetic), মাতৃগর্ভে থাকাকালীণ মায়ের গর্ভকুসুমে প্রবাহিত রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার মাধ্যমে এবং জন্মের পর মাতৃদুগ্ধ পানের মধ্য দিয়ে। অর্জিত প্রতিরোধ শক্তি (Acquired Immunity) আবার স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম (Natural and artificial) হতে পারে। স্বাভাবিক অর্জিত রোগ প্রতিরোধ শক্তি লাভ করি আমাদের দেহে পুনঃ পুনঃ ন্যূনতম রোগ সংক্রমণের মধ্য দিয়ে। কৃত্রিম অর্জিত রোগ প্রতিরোধ শক্তি আবার দুরকমের হতে পারে- সক্রিয় (active) এবং নিষ্ক্রিয় (Passive)। সক্রিয় কৃত্রিম রোগ প্রতিরোধ শক্তি আমরা লাভ করি যখন কোন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস অথবা তাদের দ্বারা উৎপন্ন টকসিন, টকসয়েড প্রভৃতি অথবা কোন হ্যাপটেন (Hapten) আমাদের দেহে অনুপ্রবেশ করান হয়। আর নিষ্ক্রিয় কৃত্রিম রোগ প্রতিরোধ শক্তি (Passive Immunity) লাভ করা যায় বাইরে থেকে জীবাণু বিধ্বংসী এন্টিবডি-যুক্ত ইমিউন সিরাম আমাদের দেহে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে। রোগ জীবাণু বা তাদের থেকে উৎপন্ন রোগবিষ আমাদের দেহে প্রোটিন অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করে এবং এই অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় আমাদের দেহাভ্যন্তরে এক প্রকার জীবাণু বিধ্বংসী প্রোটিন অ্যান্টবডি তৈরী হয়।

হ্যাপটেন কোন প্রোটিন নয় এবং প্রকৃতিতে অ্যান্টিজেনের মতও নয়। কিন্তু যখন আমাদের রক্তে অণুপ্রবিষ্ট হয় তখন দেহাভ্যন্তরের প্রোটিনকে উজ্জীবিত করে এ্যান্টিজেনের মত কাজ করায় যাদের বিরুদ্ধে আবার রোগ বিধ্বংসী প্রোটিন অ্যান্টিবডি তৈরী হয়। প্রোটিন-এ্যান্টিজেন ছাড়া যে কোন পদার্থই হ্যাপটেন ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারে যেমন ভেষজ। কাজেই হোমিওপ্যাথিক ভেষজও হলো এক প্রকার হ্যাপটেন যা কিনা আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ প্রোটিনকে উজ্জীবিত করে রোগ বিধ্বংসী প্রোটিন

এন্টিবডি তৈরী করে। একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে এন্টিজেন বা হ্যাপটেনের বিরুদ্ধে যখন একবার আমাদের শরীরে প্রতিক্রিয়া শুরু হয় তখন যদি এই এন্টিজেন বা হ্যাপটেন আর পুনঃপ্রয়োগ নাও করা হয়- বা তাদের অপসারিত করা হয়- তবুও প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ কিছু সময়ের জন্য আমাদের দেহে প্রোটিন এ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়েই চলবে।

"ন্যুনতম সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করে কিন্তু অধিকতম সংক্রমণ রোগ সৃষ্টি করে"-এটাই হলো রোগ প্রতিরোধ তত্ত্বের মূল কথা এবং ভিত্তি স্বরূপ। এই মতবাদ হোমিওপ্যাথির সুক্ষ্মতম মাত্রার মতবাদকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। আমাদের দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির পক্ষে সামান্যতম উত্তেজক কারণই যথেষ্ট যা আবার রোগ সংক্রমণ প্রতিহত করতে বা রোগ আরোগ্য করার পক্ষে যথেষ্ট। দেহে একবার কোন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হলে প্রকৃতিগত স্বাভাবিক গতিতে রোগবিধ্বংসী এন্টিবডি সৃষ্টি হয়ে চলে এবং দেহের প্রতিরক্ষা কৌশলের অন্তর্গত সব কিছুই কিছু সময়ের জন্য উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

অতঃপর প্রতিরোধ ব্যবস্থার কার্যকৌশল সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাক। বহুবিধ ঘটনার সমন্বয়ে এই কার্যক্রম সম্পাদিত হয়, যথাঃ-

ক) স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা পদ্ধতিঃ যেমন অশ্রু, নাসিকানিসৃত স্রাব, হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড, অন্ত্রনিসৃত স্রাব, তরল মল, স্বাভাবিক আন্ত্রিক জীবানুসমূহ, চর্ম, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, ডোডারলিন জীবাণু প্রভৃতি।

খ) বিভিন্ন প্রকার রোগ বিধ্বংসী এন্টিবডিঃ এগুলি আবার সুনির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট (Specific and Non-Specific) হতে পারে। রক্তে বিদ্যমান নানা প্রকার Immunoglobulin এবং antitoxic পদার্থগুলি নির্দিষ্ট এন্টিবডি হিসাবে কাজ করে। ইনটারফেরণ, প্রপারডিন, ম্যাগনেসিয়াম আয়ণ, কমপ্লিমেন্ট, অপসোনিন, এ্যাগলুটিনিন, প্রেসিপিটিন, সাইটোলাইসিন, এ্যামবোসেপটর প্রভৃতি অনির্দিষ্ট এন্টিবডির অন্তর্ভূক্ত।

গ) রোগ প্রতিরোধে সাহায্যকারী দেহকোষ সমূহঃ ফ্যাগোসাইটস, ক্ষুদ্র লিমফোসাইট সমূহ, বৃহৎ মনোসাইট সমূহ, ইমিউনোসাইট সমূহ

এবং রক্তরস প্লাজমা-কোষ সমূহ প্রভৃতি দেহের প্রতিরক্ষা কৌশলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

ঘ) পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক কারণাবলিঃ যেমন, পার্বত্য এলায়কায় যক্ষ্মা রোগ সচরাচর দেখা যায় না।

এরপর এ্যান্টিবডি তৈরী হওয়ার কারণ ও ঘটনাবলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

তিনটি ঘটনাবলির উপর এ্যান্টিবডি প্রস্তুতি নির্ভর করে। যথা-

১। বংশগত ঘটনাবলি (Genetic factor) :

২। কোষজাত ঘটনাবলি (Cellular factor) :

৩। দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন প্রকার রসজাত ঘটনাবলি (Humoral factor) :

বংশগত ঘটনা (Genetic factor) : (Gene) জীন্ (মানুষের বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট বহনকারী দেহ-কোষের উপাদান) যুগল ক্রমোজমের একটিতে অবস্থান করে। এদের মধ্যে যারা বিরামশীল (Recessive) তারা সদৃশ প্রকৃতির জীবনোটাইপের (Genotype) উপর কাজ করে। আর যারা প্রকট (dominant) তারা সদৃশ ও অসৃদশ উভয় প্রকার জিনোটাইপের উপরই কাজ করে বিরামশীল জীন 'X' যৌন (Sex) ক্রমোজোমের সাথে সংযুক্ত থাকলে তাকে x সন্নিবিদ্ধ (x linked) জিন্ বলে। এই প্রকার জীন্ প্রভাবিত মহিলারা হিমোফিলিয়া, সিউডোহাইপারট্রফিক মাসকুলার ডিসট্রফি প্রভৃতি রোগ ছড়ান এবং শুধুমাত্র পুরুষেরা এই রোগের শিকার হন। প্রকট (dominant) জীন 'Y' যৌন ক্রমোজমের সাথে সংযুক্ত থাকলে তাকে 'Y' সন্নিবিদ্ধ জীন্ বলে। এই প্রকার জীন প্রভাবিত পুরুষেরা শুধু স্ত্রী শিশুদের দেহেই রোগ সংক্রমিত করেন কিন্তু মহিলারা উভয় প্রকার শিশুদের দেহেই রোগ সংক্রমণ ঘটান-যেমন হিমোলিটিক এ্যানিমিয়া, সিকল-সেল এ্যানিমিয়া ইত্যাদি।

যদি কোন শিশুর জন্মের আগে এই বংশগত ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে তাহলে হোমিওপ্যাথিক ধাতুগত ভেসজ দ্বারা শিশুর উত্তরাধিকার সুদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সর্বাধুনিক "amniocentasis test" দ্বারা এই

প্রকার দোষ নির্ধারণ সম্ভব হতে পারে। এই পরীক্ষায় জরায়ুস্থিত ভ্রূণের জিনোটাইপ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় এবং গর্ভকালীন মায়ের উপযুক্ত ধাতুগত চিকিৎসায় ভ্রুণের দোষ সংশোধিত হলে স্বাভাবিক সুস্থ শিশুর জন্ম হতে পারে। পূর্বে উল্লিখিত রোগ ছাড়াও জীনঘটিত দোষে আরও বহুবিধ রোগের সৃষ্টি হতে পারে, যথা-মঙ্গোলিজম (Mongolism) ইত্যাদি। দীর্ঘদিনের উপযুক্ত ধাতুগত (Constitutional) হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় জীন্‌ঘটিত দোষ বহুল পরিমাণে সংশোধিত হতে পারে। বলা বাহুল্য যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রমাণ করার জন্য ব্যাপক গবেষণারও প্রয়োজন সমধিক।

কোষজাত ঘটনাবলী বা Cellular Factor:

রোগ প্রতিরোধ শক্তির ক্রিয়া প্রকাশের জন্য যে সব কোষ ক্রিয়াশীল তাদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফ্যাগোসাইটস রোগ জীবাণু ধ্বংস করে এবং শোনিতস্থ বিভিন্ন এ্যান্টিবডিও এই কাজে সাহায্য করে। প্রধান রোগ-প্রতিরোধ-ধর্মী কোষ হিষ্টিওসাইটস (hystiocytes) R.E. বা রেটিকিউলো এন্ডোথেলিয়ামের কোষ প্রজনন ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। প্লীহা, অস্থিমজ্জা ইত্যাদির R.E. System থেকে উৎপন্ন হয়ে এইসব হিষ্টিওসাইটস উভ্রুক গ্রন্থিতে (Thymus gland) পৌছায় এবং সেখানে তারা ইমিউনোসাইটস রূপে চিহ্নিত হয়। এই চিহ্নিত ইমিউনোসাইটস-এর কিছু অংশ পরবর্তীকালে লসিকাগুল্ম (lymph glands), প্লীহা প্রভৃতিতে যেয়ে জমা হয় এবং "থাইমাস নির্ভর কোষ" (Thymus dependant Cells) নামে আখ্যাত হয় এবং কৌষিক এ্যান্টিবডি তৈরীর প্রধান হোতা হিসাবে কাজ করে। আর কিছু অংশ টনসিল, অন্ত্রের Pyer's Patches, উপাঙ্গ (appendix) প্রভৃতিতে জমা হয় এবং "অন্ত্র-সংশ্লিষ্ট-কোষ" (gutassociated Cells) নামে আখ্যায়িত হয়। এইগুলি শরীরস্থ রসজাত (humoral) এ্যান্টিবডি তৈরীর প্রধান হোতা হিসাবে কাজ করে।

এই অন্ত্র সংশ্লিষ্ট কোষগুলি থেকে 'প্লাজমা কোষ' (Plasma Cells) তৈরী হয় যা শোনিতধারায় প্রবাহিত হয়ে হিউমোরাল ইমিউনোগ্লোবিউলিন উৎপন্ন করে। এই প্লাজমা কোষগুলি শ্বেতকণিকা

লিমফোসাইটস-এর কোষ-উপাদান সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত R.N.A. বা রাইবো নিউক্লিক এ্যাডিস থেকে উদ্ভূত হয়। থাইমাসের অবর্তমানে অন্ত্র সংশ্লিষ্ট কোষগুলোই ইমিউনোসাইটস ও প্লাজমা কোষগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। ইমিউনোসাইটস-এর কিছু অংশ "Immunological memory Cells" হিসাবে থাকে যারা রোগ জীবাণু এ্যান্টিজেনকে সহজেই চিনে ফেলে এবং ভবিষ্যতের সদৃশ কোন রোগ সংক্রমণকে প্রতিহত করতে সাহায্য করে।

এইসব রোগ প্রতিরোধী কোষ ছাড়াও রোগ প্রতিরোধ শক্তির আর একটি বিশেষ কোষগত কারণ হলো ইনটারফেরণ (interferon) নামক একপ্রকার কোষ অভ্যন্তরস্থ এ্যান্টিবডি যা প্রকৃতিতে ভাইরাস (Virus) বিরোধী। এই কোষবন্দী এ্যান্ডিবডি কেবলমাত্র তখনই তৈরী হয় যখন দেহের মধ্যে সজীব কোন রোগ জীবানূর (living organisms) অনুপ্রবেশ ঘটে। এজন্য টকসিন, টকসয়েড প্রভৃতি দ্বারা সচরাচর প্রচলিত প্রতিষেধক ব্যবস্থা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সক্ষম হয় না।

হিউমোরাল কারণাবলী (Humoral Facor):

এগুলির মধ্যে রয়েছে ১। ইমিউনোগ্লোবিউলিণ (Immunoglobulin) ২। এ্যাগ্লুটিনিন (agglutinin) ৩। প্রেসিপিটিন (Precipitin) ৪। অপসোনিন (Opsonin) ৫। নিউট্রালাইজিং এ্যান্টিবডি (Neutralising antibody) ৬। এ্যাম্বোসেপটর (anboceptor) ৭। ম্যাগনেসিয়াম আয়ণ সহ অনুপুরক (Complement with Magnesium Ions) ৮। প্রপারডিন (Properdin) ৯। সাইটোলাইসিন (Cytolysin) ইত্যাদি।

বিভিন্ন নির্দিষ্ট ইমিউনোগ্লোবিউলিন নির্দিষ্ট এ্যান্টিজেনের সাথে মিলিত হয়ে এ্যান্টিজেনগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে এবং এইভাবেই ডিফথিরিয়া, টিটেনাস প্রভৃতির রোগ আক্রমণ প্রতিহত হয়। এ্যাগ্লুটিনিন রোগজীবাণু ও এ্যান্টিবডিকে একত্রে সংযুক্ত করে।

প্রেসিপিটিন রোগ সংক্রামক পদার্থগুলিকে দ্রুত থিতিয়ে ফেলতে সাহায্য করে।

অপসোনিন রোগজীবানুগুলোকে ফ্যাগোসাইটিস দ্বারা উদরস্থ হওয়ার উপযোগী করে তোলে।

নিষ্ক্রিয়কারী এ্যান্টিবডিগুলি বিষক্রিয় বস্তুগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে।

অবরোধক এ্যান্টিবডিগুলি জীবানুসমূহকে অবরোধ ক'রে তাদের বিস্তার ব্যাহত করে।

সাইটোলাইসিন কোষের রোগদুষ্টি ধীরে ধীরে অবদমন করে।

কমপ্লিমেন্ট বা অনুপুরক বস্তুসমূহ এ্যান্টিজেন-এ্যান্টিবডি সংযুক্তি, রোগ জীবাণুর অবদমন, শোনিতাবাহী ধমনীগুলোর প্রবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, কোমোট্যাকসিস ও ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।

এ্যামবোসেপটর এ্যান্টিজেন ও কমপ্লিমেন্ট উভয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং এ্যান্টিবডি প্রযুক্ত কোষগুলোর প্রতিবিষকে ধ্বংস করে।

প্রপারডিন সার্বিক রোগ প্রতিরোধ শক্তি প্রদান করে। ম্যাকরোগ্লোবিউলিন, কমপ্লিমেন্ট এবং ম্যাগনেসিয়াম আয়ণ সহযোগে প্রপারডিন গঠিত হয় এবং ইহা এন্টিজেনের চেয়ে হ্যাপটেন দ্বারাই বেশী উজ্জীবিত হয়। প্রচলিত রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থার চেয়ে ভেষজ, ভাল খাদ্য এবং স্বাস্থ্যের অন্যান্য উপাদানগুলোই প্রপারডিন ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত করতে অধিকতর কার্যকরী হয়।

এখন রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধিতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ভূমিকা কি সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাক। এই প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্ন হ'লো শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রোগ প্রতিরোধী এ্যান্টিবডি প্রস্তুত করতে পারে কি না? এর উত্তরে আমি দৃঢ়ভাবে জানাতে চাই যে হোমিও-ভেষজের এই ক্ষমতা অবশ্যই আছে। তা না থাকলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দ্বারা রোগ আরোগ্য কখনই সম্ভব হতো না। আমরা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়ে প্রচুর ডিফথিরিয়া, হুপিং কাশি, টাইফয়েড, বিকোলাই প্রভৃতি রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করছি। এটা সম্ভব হচ্ছে তার কারণ আমাদের হোমিওপ্যাথিক ঔষধে এইসব রোগের এন্টিজেনের বিরুদ্ধে এ্যান্টিবডি তৈরী হয় যা রোগজীবাণু ও তার বিষক্রিয়াকে প্রতিহত করে। অর্গাননের ১৪৮ সূত্রটি পর্যালোচনা করা যাক। এই সূত্রে কি করে হোমিওপ্যাথিতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। এই সূত্রে বলা হয়েছে যে সদৃশ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ

করলে শরীরে সেই প্রকারের সদৃশ ও অধিকতর শক্তিশালী রোগ সৃষ্টি হয় যা কিনা সদৃশ নীতির বলে প্রাকৃতিক রোগকে বিতাড়িত করে এবং জীবনীশক্তি ভেষজ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রে নিরাময় সম্পন্ন করে। এই ঘটনা অবশ্যই বাস্তব সত্য। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ এই নীতি প্রকৃতির আরোগ্য নীতির উপর ভিত্তি ক'রেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে না পারলে বিজ্ঞান জগতে হয়ত গৃহীত নাও হতে পারে এবং জনসাধারণও এর যথার্থতা উপলব্ধী নাও করতে পারেন। দেখা যাক ঐভাবে এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় কিনা। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ (হ্যাপটেন) জীবনীশক্তির মাধ্যমে দেহজাত প্রোটিনকে উজ্জীবিত ক'রে এন্টিজেনের ভুমিকা গ্রহণ করে এবং এই সময়ে দেহের মধ্যে একটা বলবত্তর সদৃশ রোগ প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই ঐ হ্যাপটেনের বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরী হতে শুরু হয়ে যায়। এখন ভেষজ হ্যাপটেন-প্রসূত এ্যান্টিবডি, রোগজীবাণু-এন্টিজেন প্ররোচিত এ্যান্টিবডির সাথে মিলে একযোগে প্রাকৃতিক রোগের জীবাণুকে প্রতিহত করে। ফলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে রোগীর দেহাভ্যন্তরে সদৃশ ও অধিকতর শক্তিশালী কোন রোগ সৃষ্টি হয় না- শুধুমাত্র অনুরূপ একটা প্রবণতা বা আসন্ন রোগ সংকেত সৃষ্টি করে- যার উদ্দেশ্য হলো এন্টিবডি সৃষ্টি-চক্রকে উজ্জীবিত করা। কিন্তু অপ্রয়োজনে দীর্ঘকাল ধরে বার বার অধিক মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করা হলে রোগী আরোগ্য লাভের পরিবর্তে ভীষণভাবে ভেষজ-ক্রিয়ার কুফল ভোগ করবে, এমনকি সাংঘাতিক এক ভেষজসৃষ্ট রোগেও ভুগতে পারে।

একইভাবে সম্ভবতঃ আমরা "হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধির"ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে পারি। হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধিতে রোগীর বর্তমান লক্ষণাবলীর বৃদ্ধি ঘটলেও রোগী সার্বিকভাবে স্বচ্ছন্দতর অনুভব করে। এটা কি করে সম্ভব হয়? লক্ষণাবলীর বৃদ্ধি ঘটলে রোগীর অস্বাচ্ছন্দ্য ভাবেরও বৃদ্ধি ঘটাই স্বাভাবিক- কিন্তু সবক্ষেত্রে তা সত্য নাও হতে পারে। মনে করুণ কোন একজন লোক প্রচুর পরিমাণে খাওয়ার পর পেটের মধ্যে একটা অস্বস্তি, গা বমি বমি, পাকস্থলীতে একটা ব্যথা ইত্যাদি অনুভব করছে। সে তখন চেষ্টা করবে গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে ফেলতে। কোন প্রকারে সে যদি একটু বমি করে ফেলতে পারে বা তার একটু বাহ্যে হয়

তবে সে বেশ কিছুটা স্বস্তি অনুভব করে এবং একটু আরামে ঘুমুতে পারে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে স্বাভাবিক বোধ করে। এটা কি করে সম্ভব হয়? বমি ও বাহ্যে তো শরীরকে দূর্বল করে ফেলে বলেই আমরা জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে বমি ও বাহ্যে রোগীর পক্ষে উপকারী। কারণ অপাচিত এবং উত্তেজক ভুক্তদ্রব্য বমি ও বাহ্যের মাধ্যমে বের হয়ে যাওয়ার ফলে রোগীর অস্বস্তির কারণ দূরিভূত হয়। কিন্তু কলেরা রোগীর ক্ষেত্রে অনুরূপ ভেদবমি মৃতবৎ অবস্থার সৃষ্টি করে। কারণ কলেরার জীবাণু কোমা ভিব্রিও-র টকসিনের ক্রিয়া প্রকাশের ফলেই এই রোগলক্ষণগুলি দেখা দেয়। সুতরাং জীবনীশক্তিকে দূর্বল করে ফেলতে কেবলমাত্র লক্ষণই কারণ নয়- বরং পশ্চাদপটে যে বিষক্রিয়া থাকে সেটাই মূল কারণ। হোমিওপ্যাথিক ভেষজের কোন বিষক্রিয়া নেই। কাজেই সদৃশ হোমিও ঔষধ প্রয়োগের পর রোগীর বর্তমান লক্ষণগুলির সামান্য বৃদ্ধি ঘটলেও রোগীর পক্ষে তা অনিষ্টকর না হয়ে বরং ইষ্টকর হয় যেহেতু এখানে ঔষধ-সৃষ্টি লক্ষণাবলী জীবন হানিকর না হয়ে জীবন রক্ষাকর হিসাবে দেখা দেয়। হোমিও ভেষজের সুক্ষ ও শক্তিকৃত গুণের জন্য এটা সম্ভপর হয়। ঠিক এই ভাবেই নাক দিয়ে রক্তস্রাব (Epistaxis) অনেক উচ্চ রক্ত-চাপের রোগীর জীবন রক্ষা করে থাকে। যদি ঐ Epistaxis না দেখা দিত তাহলে ঐ সব রোগীদের মস্তিস্কে, রক্তক্ষরণ (Cerebral haemorrhage) অথবা মস্তিস্ক-প্রদাহ (Hypertensive encephalopathy)- জনিত এক সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারতো- যদিও আমরা জানি রক্ত হলো আমাদের দেহের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জীবন-রক্ষক তরল পদার্থ এবং এর ক্ষয় সবার পক্ষেই ক্ষতিকর।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠতে পারে আমরা কি প্রমাণ করতে পারি যে হোমিওপ্যাথিক ভেষজ প্রয়োগের ফলে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে বা Immunity সংঘটিত হয়েছে? এর উত্তরেও আমার দৃঢ় অভিমত যে আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি যথা Fluorescent antibody labelled test, Complement fixing antibody test, Radio-active Iodine test প্রভৃতির মাধ্যমে এই ঘটনা যথাযথভাবে প্রমাণ করা সম্ভব এবং এটাই এখন আমাদের করতে হবে। ভাগে ভাগে মানুষের উপর আমাদের হোমিওপ্যাথিক নোসোডগুলি প্রয়োগ করতে হবে এবং দু-একটা

লক্ষণ প্রকাশের মাধ্যমে যখনই তার ক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে বোঝা যাবে তখনই তার ফলাফল এই সব ল্যাবরেটরী কলাকৌশলের সাহায্যে পরীক্ষা করতে হবে।

তৃতীয় প্রশ্ন হলো কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট মহামারী রোগ-প্রবণতা থেকে মুক্ত কি না অথবা সেই রোগে তার অতি-প্রবণতা রয়েছে কিনা তা কি করে পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাবে? কোন মহামারী রোগের সদৃশ কোন শীক্তকৃত ঔষধ ঘনঘন কয়েকমাত্রা প্রয়োগ ক'রে এটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। যদি দেখা যায় প্রথম, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় মাত্রা প্রয়োগের পর ঐ ঔষধ সেই ব্যক্তির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করতে শুরু করেছে তাহলে বুঝতে হবে ঐ ঔষধ তথা সদৃশ রোগের প্রতি সেই ব্যক্তির খুবই প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু যদি দেখা যায় ঐ প্রকার আট-দশ বা বার মাত্রা প্রয়োগ করেও ঐ ব্যক্তির উপর ঐ ঔষধের কোন ক্রিয়া প্রকাশ পেল না তাহলে বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তি ঐ ঔষধ- প্রবণতা তথা সদৃশ রোগ-প্রবণতা থেকে কম বেশী মুক্ত। অবশ্য এই সিদ্ধান্তে আসার জন্য চাই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা- নিরীক্ষা এবং তথ্য সমৃদ্ধ পরিসংখ্যান।

চতুর্থ প্রশ্ন হলো শক্তিকৃত ভেষজের মাধ্যমে সংঘটিত রোগ প্রতিরোধ শক্তি কতদিন স্থায়ী হবে? এটা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হবে। কারণ এই জগতে কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সহিত সম্পূর্ণরূপে এক নয়। এ্যালোপ্যাথিক ভেষজের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে এক মাত্রা ঔষধের বিপাক (metabolised) হতে কোন মানুষের লাগে ৮ ঘন্টা, আর একজনের লাগে ২ ঘন্টা আবার অন্য এক জনের হয়ত লাগে চব্বিশ ঘন্টা। এই যদি ঘটে তাহলে এটা সুনিশ্চিত যে ঔষধের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও তাদের স্থায়ীকাল মানুষে মানুষে কমবেশী ভিন্ন হবে। এটা আবার নির্ভর করে মানুষের পারিপার্শ্বিক কারণ ও তার সাধারণ স্বাস্থ্যের ওপর। কোন বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে ব্যক্তি বিশেষের প্রতিরোধ শক্তি কম আছে না পরিমাণমত আছে তা পূর্বোক্ত তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার দ্বারাই সহজে নিরুপণ করা যাবে।

পঞ্চম প্রশ্ন হলো কোন ব্যক্তিকে কোন সম্ভাব্য রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে হোমিওপ্যাথিক ভেষজের শক্তি ও মাত্রা কি হবে? এটি

আমাদের গুরুতর সমস্যাবলীর অন্যতম। আমার মনে হয় মধ্য শক্তিতে পুনঃ পুনঃ ভেষজ প্রয়োগই প্রকৃষ্ট পন্থা। আমাদের উদ্দেশ্য হলো ঔষধ প্রয়োগে শরীরের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা। অধিক উচ্চ অথবা অধিক নিম্ন শক্তি প্রয়োগে অকারণ বৃদ্ধি ঘটতে পারে। অতএব মধ্য শক্তি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথোপযুক্ত হবে বলেই আমি মনে করি। ভেষজ প্রুভিংয়ের সময় যেমন করা হয় তেমনি এই ব্যাপারেও ঔষধ প্রয়োগ ক'রে যতক্ষণ অস্বাচ্ছন্দ্য, গা ম্যাজম্যাজানি, অবসাদ ইত্যাদি দেখা না যাবে ততক্ষণ ভেষজ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ কতে হবে। কিন্তু উক্ত লক্ষণাবলী দেখা দিলেই ভেষজ প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। কারণ তখনই প্রতিক্রিয়াচক্র শুরু হয়ে যাবে এবং এ্যান্টিবডি প্রস্তুত হতে থাকবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটানা তা চলতে থাকবে। ঔষধের মাত্রার পুনঃ প্রয়োগের সময় অতি অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে যেন ঔষধের শক্তির পরিবর্তন না করে দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ না করা হয়। পরবর্তী প্রত্যেক মাত্রাকে অপেক্ষাকৃত অধিক তরল করে এবং আলোড়নের (Succussion) মাধ্যমে কিছুটা শক্তি বৃদ্ধি করে প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য একমাত্র তরল আকারেই ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। আমার মত ও অভিজ্ঞতায় পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির ঔষধ প্রয়োগই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ এই পদ্ধতিতে অবাঞ্ছনীয় বৃদ্ধি পরিহার করা যায় এবং নিরাপদে একই দিনে দুই বা ততোধিক মাত্রা প্রয়োগ করা যায়- বিশেষভাবে যখন গুরুতর কোন মহামারীর বিরুদ্ধে মানবদেহে অতি দ্রুত রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। ০/১০ থেকে ০/১৫ শক্তির মধ্যে যে কোন শক্তি নির্বাচনই শ্রেয়ঃ। এরূপ শক্তিসম্পন্ন ঔষধের একটিমাত্র অনুবটিকা নিয়ে ৩০ বা ৬০ মিলিলিটার জলে গুলতে হবে এবং শিশিটাকে প্রতিবার ৮/১০/১২ বার আলোড়ন (succussion) দিয়ে তার থেকে চা চামচের এক চামচ নিয়ে আবার ৮ থেকে ১০ চামচ জলে মেশাতে হবে। এই মিশ্রণ থেকে একবারে এক বা দুই চামচ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াতে হবে। প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এই প্রথায় ২৪ ঘন্টায় দুই, তিন বা প্রয়োজনবোধে আরও অধিকবার ঔষধ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ ও শেষ প্রশ্ন হলো হোমিওপ্যাথিতে রোগ প্রতিরোধের জন্য কোন প্রকারের ভেষজ সবচেয়ে ভাল? আমার মনে হয়, যে রোগ প্রতিরোধ

করার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে সেই রোগজ পদার্থ থেকে তৈরী নোসোড ঔষধই এই উদ্দেশ্য সাধনে সবচেয়ে কার্যকরী। কারণ নোসোডগুলিতে নির্দিষ্ট রোগ উৎপাদিকা শক্তির সিম্পল সাবসস্ট্যান্স (Simple Substance) বা ডাইনামিস বর্তমান থাকে এবং সেহেতু কোষগত (Cellular) এবং দেহস্থিত রসগত (Humoral) উভয়বিদ এ্যান্টিবডিই বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। হোমিওপ্যাথিতে বহু নোসোড আছে। যথা- হামের জন্য মরবিলিনাম, ডিফথিরিয়ার জন্য ডিফথেরিনাম, হুপিংকাশির জন্য পার্টুসিন, কর্ণমূল প্রদাহের (Mumps) জন্য প্যারটিডিনাম, টাইফয়েডের জন্য টাইফয়েডিনাম, বসন্তের জন্য ভেরিওলিনাম, সেপসিসের জন্য পাইরোজেন, যক্ষার জন্য টিউবারকিউলিনাম বা ব্যাসিলিনাম, গণোরিয়ার জন্য মেডোরিনাম, সোরার জন্য সোরিনাম, জলাতঙ্কের জন্য লাইসিন প্রভৃতি। কিন্তু যে সকল রোগের নির্দিষ্ট নোসোড পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে যে হোমিও ভেষজ যে রোগের লক্ষণ সমষ্টির সদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন করতে সক্ষম তাহাই ঐ রোগের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে। সদৃশ লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে এমন যে কোন ঔষধ দেহের মধ্যে এ্যান্টিবডি উৎপন্ন করবে যা আমাদের দেহে তৎপরাগত সদৃশ দূর্বলতর রোগ জীবানু-এন্টিজেনের আক্রমণকে প্রতিহত করবে। হ্যানিম্যানের পর্যবেক্ষিত এবং অর্গাননে উল্লিখিত জীবন্ত মানবদেহে যুগপৎ দুটি সদৃশ রোগের আক্রমণের ফলাফলের নিয়ম" অনুসারেই ইহা ঘটে থাকে। তা যদি না হতো তবে ম্যালেড্রিনাম, ভ্যাকসিনিনাম, থুজা প্রভৃতি দিয়ে 'গুটি বসন্ত' প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো না- যা কিনা পৃথিবীর বহু সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথরাও দৃঢ়তার সাথে দাবী করেছেন।

আমার বক্তব্য অনেকের কাছেই যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিসংখ্যানগত তথ্য ছাড়া গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে, কিন্তু বর্তমান ভারতে হোমিওপ্যাথির এই অগ্রগতির যুগে এবং অন্য চিকিৎসা পদ্ধতির বহুমুখি গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সকলের সমবেত চেষ্টা ও পরস্পরের মত বিনিময়ের মাধ্যমে এইসব গুরুত্ব সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং তথ্যবহুল পরিসংখ্যান দ্বারা এই বিজ্ঞানকে পূর্ণতায় পরিণত করা যে অত্যাবশ্যক সে বিষয়ে আশা করি কারও দ্বিমত নেই।

রোগ জীবাণু ও হোমিওপ্যাথি

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রোগজীবাণু মারতে পারে কি? কয়েকদিন আগে একটি Bacillary Dysentery-র রোগী দেখতে যেয়ে আমাকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ইতিপূর্বে রহুবার বহুক্ষেত্রে ছাত্র তথা চিকিৎসক বন্ধুগণ এই প্রশ্ন আমাকে করেছেন। কিন্তু এই দিনের মত এমন অসোয়াস্তিকর পরিস্থিতিতে কখনও পড়ি নাই। রোগী একজন উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে বেশ ভালই জ্ঞান আছে। তাঁর ঘরে ঢোকা মাত্র তিনি প্রথমেই আমাকে এই প্রশ্ন করেন এবং বলেন যদি আমি তাঁকে বোঝাতে পারি যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ জীবাণু মারতে পারে তবেই তিনি আমার দেওয়া ঔষধ খাবেন- অন্যথায় নয়। তার কারণস্বরূপ তিনি বলেন-Bacillary Dysentery জীবাণু দ্বারা হয় এবং তিনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা জীবাণু ধ্বংস হতে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কখনও দেখেননি বা কারও কাছে কখনও শোনেননি। প্রচলিত Bacillary Dysentery-র Allopathic ঔষধের কোনটিই তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না- প্রচন্ড allergic reaction হচ্ছিল বলেই তাঁর পুত্র বাধ্য হয়ে হোমিওপ্যাথি করার মনস্থ করেন। কিন্তু রোগীর ঐ এক শর্ত। এ ধরণের শর্তাধীনে কখনও রোগী চিকিৎসা করি নাই। তবু ভদ্রলোকের পুত্রের সানুনয় অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে তাই করতে হ'লো। রোগী ভদ্রলোককে আমি বললাম হোমিওপ্যাথিক ঔষধে রোগজীবাণু অবশ্যই মরে কিন্তু তা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বা Test tube -এর মধ্যে দেখা যায় না। কারণ এই ধ্বংসলীলা ঘটে জীবিত মানুষের দেহের অভ্যন্তরে। হোমিওপ্যাথি সরাসরি রোগ জীবাণু ধ্বংস করার জন্য ব্যবহৃত হয় না- অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার জন্যই এর প্রয়োগ। রোগজীবাণু সব সময়ই আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে- কিন্তু আমরা রোগাক্রান্ত হই না। কারণ আমাদের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে আমাদের নীরোগ রাখে। কোন কারণে এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে রোগজীবাণু রোগ সৃষ্টির উপযোগী পরিবেশ পায় এবং একমাত্র তখনই আমরা রোগজীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হই। একটা রোগজীবাণুর চেয়ে

একজন সুস্থ, সবল, জীবন্ত মানুষের শক্তি অনেক বেশী। তা যদি না হতো তবে পৃথিবী এতদিনে জনমানবশূন্য শ্মশানে পরিণত হ'তো। জন্মগত কারণে বা অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের জন্য দেহের অভ্যন্তরে রোগসৃষ্টির উপযোগী পরিবেশে সৃষ্টি হয়- ফলে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যায় কমে এবং তারই ফলস্বরূপ দেখা দেয় রোগ। কোন মানুষ যখন রোগজীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়- তখন বুঝতে হবে তার ঐ বিশেষ জীবাণুবিরোধী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থায় তাকে সুস্থ করে তোলার দুরকম পদ্ধতি বা প্রচেষ্টা প্রচলিত আছে।

১। রোগজীবাণু সরাসরি ধ্বংস করতে পারে এমন ঔষধ প্রয়োগ করা।

২। রোগজীবাণুর বেঁচে থাকার বা ক্ষতি করার প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সেই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা। যে কারণে রোগজীবাণু প্রাধান্য লাভ করে রোগ সৃষ্টি করে সেই কারণ দূরীভূত হলে এবং জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধির ও শক্তিবৃদ্ধির প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে স্বভাবতঃই জীবনী শক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার দ্বারা ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং রোগী আরোগ্য লাভ করবে।

হোমিওপ্যাথি এই দ্বিতীয় বা শেষোক্ত পন্থায় জীবাণু ধ্বংস করে- সরাসরি জীবাণু মারে না।

রোগী ভদ্রলোক এবারে জিজ্ঞাসা করলেন যদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সরাসরি জীবাণু মারতে না পারে তবে রোগ প্রতিরোধ শক্তিই বা বাড়াবে কি করে?

এর উত্তরে আমি তাঁকে বললাম হোমিওপ্যাথিক ঔষধে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন পদার্থ থাকে না এটা ঠিক। কিন্তু ঔষধের অন্তর্নিহিত শক্তি (Dynamis) এর মধ্যে থাকে। এটা প্রমাণ করা খুবই সহজ। যে কোন শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কোন সুস্থ লোককে কয়েক মাত্রা খাওয়ালে তার মধ্যে অবশ্যই নানারকম লক্ষণ প্রকাশ পাবে। ঔষধের মধ্যে যদি কিছুই না থাকতো তবে এই পরিবর্তনগুলি কখনই দেখা দিত না। এইভাবে দীর্ঘদিন একই ঔষধ প্রয়োগ করলে যান্ত্রিক পরিবর্তনও দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু উক্ত ঔষধ যে কোন শক্তিতে মাত্র এক মাত্রা প্রয়োগ

করলে কোন যান্ত্রিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়- যেটা সম্ভব ঔষধ Physiological dose এ প্রয়োগ করলে। ঔষধের এই অন্তর্নিহিত শক্তি সরাসরি দেহ-যন্ত্রের উপর কার করে না- করে অপর একটি Dynamis - এর উপর যাকে হোমিওপ্যাথিতে আমরা বলি জীবনীশক্তি। মাতৃগর্ভে একটিমাত্র ভ্রুণ হতে একটা পূর্ণাবয়ব মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে এই জীবনীশক্তিরই চেতনায়। প্রতিটি দেহকোষে এই জীবনীশক্তি আছে। কাজেই একটা দেহকোষকেও দু'ভাবে আক্রমণ করা যায়। সরাসরি দেহকোষের উপর আক্রমণ চালিয়ে অথবা জীবনীশক্তিকে আক্রমণ করে পরোক্ষাভাবে দেহকোষকে আক্রান্ত করে। হোমিওপ্যাথি এই পরোক্ষ উপায়ে মানবদেহে সর্বপ্রকার পরিবর্তন আনতে পারে। রোগজীবাণুর ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। জীবাণুর আকৃতি বা স্থূলশক্তির দ্বারা রোগ হয় না। এদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি (Dynamis) থাকে তাই-ই রোগ সৃষ্টি করে। এই Dynamis-এর প্রভাবেই একটিমাত্র জীবাণু অসংখ্য জীবাণুতে পরিণত হতে পারে এবং তাদের দেহ-নিঃসৃত Toxins-এর দ্বারা অশেষ ক্ষতিসাধন করতে পারে।

কাজেই পূর্বে বর্ণিত উপায়ে সরাসরি জীবাণু ধ্বংস করা চলে। অথবা ঔষধের Dynamis দ্বারা মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ Dynamis কে উত্তেজিত করে জীবাণু Dynamis-কে নিষ্ক্রিয় তথা জয় করে পরোক্ষভাবে জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব।

সরাসরি জীবাণু ধ্বংস করার চেষ্টায় বিপদের সম্ভাবনা আছে। কারণ দেখা গেছে একজন রোগীকে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করার ফলে তার জীবনীশক্তি তথা স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই ভেঙ্গে পড়তে পারে। ফলে জীবাণুশুন্য হ'য়েও লোকটির মৃত্যু হতে পারে। একে বলে "Sterile death"। তাছাড়া রোগজীবাণুরাও সরাসরি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাই আজ যে ঔষধে যে জীবাণু সহজেই ধ্বংস হয়- কিছুদিন পরে সেই একই ব্যক্তির শরীরে একই ঔষধ সেই জীবাণু মারতে পারে না। রোগজীবাণুরা Drug resistant হয়ে ওঠে। কিন্তু পরোক্ষ উপায়ে জীবাণু ধ্বংস হ'লে এই ধরণের কোনই বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ এই উপায়ে জীবনীশক্তিকেই উজ্জীবিত করা

হয়-ফলে তার স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং রোগজীবাণু যে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই গড়ে তুলুক না কেন জীবনীশক্তি তার যথোপযুক্ত মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়- প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে।

রোগী ভদ্রলোক মনোযোগ সহকারে আমার বক্তব্য শুনলেন, আশান্বিত হলেন, ঔষধ খেতে রাজী হলেন এবং খেলেন। তাঁতে যা বলেছিলাম সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে তাই বর্ণিত হলো। আমার চিকিৎসক বন্ধুরাও অনুরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন এই ভেবে এই প্রবন্ধ লেখা। আমি নিজে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেটুকু বুঝি সেইটুকুই বোঝাবার চেষ্টা করলাম। পাঠকদের নিকট থেকে আরও ভাল ব্যাখ্যা পেলে খুশী হবো।

হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্র ও সীমা
(The Scope and limitation of Homoeopathy)

"হোমিওপ্যাথিতে সব রোগই আরোগ্য হয়", বা "হোমিওপ্যাথিতে কিছুই আরোগ্য হয় না"- এই দু'টি বিবৃতির কোনোটাই সত্য নয়।

হোমিওপ্যাথিতে অনেক রোগই আরোগ্য হয়। তবে সব রোগ সব অবস্থায় আরোগ্য হয় না- এটাই হ'লো অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য।

হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্র জানতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে হোমিওপ্যাথি কি? হোমিওপ্যাথি হলো সদৃশ-বিধান মতে চিকিৎসা। কিন্তু কিসের সদৃশ্য তথাকথিত বিশেষ কোনো রোগের? না তা নয়। কারণ, ড্রাগপ্রুভিং- এর ক্ষেত্রে শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধে তথাকথিত কোনো বিশেষ রোগ সৃষ্টি হয়নি, বরং তৈরী হয়েছে সেই সব রোগের পূর্বাবস্থা। অর্থাৎ রোগের ডাইনামিক প্যাথলজির সৃষ্টি হ'য়েছে প্রুভারের মধ্যে এবং মেটেরিয়া-মেডিকায় সেই ডাইনামিক প্যাথলজির লক্ষণসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঔষধ প্রুভারের উপর কোনো গঠনগত পরিবর্তন করার আগেই প্রুভিং বন্ধ করে দেওয়া হ'য়েছে। কাজেই প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন- এ যে সব রোগের কথা আমরা পড়ি, সেইসব রোগের একেবারে গোড়ার দিকের লক্ষণগুলি আমরা ড্রাগ-প্রুভিং এ পাই। ডাইনামিক প্যাথলজির এই লক্ষনগুলি থেকে অবশ্য বোঝা যায়, কোন ঔষধ কি ধরণের গঠনগত পরিবর্তন আনতে পারে এবং কি ধরণের বিশেষ রোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ডাইনামিক প্যাথলজি যে ধরণের বিশেষ রোগ নির্দেশ করে সেই রোগ ছাড়াও যদি অন্য রোগে এই ধরণের লক্ষণ থাকে তবে ঐ একই ঔষধ দেওয়া চলে এবং আরোগ্য হয়। এইটুকু ঠিকমত বুঝতে পারলে হোমিওপ্যাথিতে থেরাপিউটিকস (রোগ-চিকিৎসা-বিদ্যা) পড়ার অসারতা উপলব্ধি করা যায়। টিউবারকুলিনাম-এর ডাইনামিক প্যাথলজির লক্ষণগুলি যক্ষা, ক্যান্সার, মধুমেহ, হাঁপানী, রক্তহীনতা ইত্যাদি থেকে শুরু ক'রে টনসিল প্রদাহ (Tonsillitis), ইনফ্লুয়েঞ্জা বদহজম এমনকি চর্ম্মরোগেও পাওয়া যেতে পারে। কাজেই (থেরাপিউটিকস (Therapeutics)-রোগচিকিৎসা-বিদ্যা)

এ যে সব রোগে টিউবারকুলিনাম ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে তা ছাড়াও বহু প্রকার রোগে টিউবারকুলিনাম ব্যবহার করা যায়। যে কোনো রোগের শেষ অবস্থায় ডাইনামিক প্যাথলজিজনিত লক্ষণের অভাব দেখা যায়। এই সব ক্ষেত্রে শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। কারণ, রোগীর যকৃত, প্লীহা, ফুসফুস, হৃৎপিন্ড ইত্যাদির অবস্থা দেখে আমরা ঔষধ নির্বাচন করতে পারি না। অথচ, এইসব ক্ষেত্রে সেটাই করার দরকার হয়ে পড়ে। শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধে যকৃৎ, হৃৎপিন্ড, ইত্যাদি সরাসরি উত্তেজিত হয় না। জীবনীশক্তি উজ্জীবিত হওয়ার ফলেই যকৃত, হৃৎপিন্ড ইত্যাদি ভালভাবে কাজ করে এবং রোগী ভাল অনুভব করে। চেলিডোনিয়াম বা কারডুয়াস মাদার টিনচার দিয়ে যকৃৎ বা পিত্তথলির কাজ করার ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা অবশ্যই হোমিওপ্যাথি নয়। কিন্তু শক্তিকৃত চেলিডোনিয়াম বা কারডুয়াস দেবার মত লক্ষণ না পাওয়া গেলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কি করবে? আমার মতে যাঁরা ঔষধের স্থূল ক্রিয়াকে থেরাপিউটিকস (রোগচিকিৎসা-বিদ্যা) উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন তাঁদের হাতেই রোগীকে সাময়িকভাবে ছেড়ে দেওয়া ভাল। কারণ কয়েক ফোঁটা চেলিডোনিয়াম মাদার টিনচারে না হবে স্থূলক্রিয়া না হবে তার সুক্ষ্মক্রিয়া (Dynamic action)। আমরা যা করবো সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত যে কি করতে যাচ্ছি এবং কোন উদ্দেশ্যে।

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে অর্গ্যানিক প্যাথলজি খুব বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে ডাইনামিক (স্থূলশক্তি) ঔষধে তাকে ভাল করা সম্ভব নাও হতে পারে। বরং এ অবস্থায় ডাইনামিক (সুক্ষ্মশক্তি) ঔষধ প্রয়োগে রোগীর আক্রান্ত দেহযন্ত্র সমূহের আরও বেশী ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার এবং রোগীর মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

তাছাড়া যে সব রোগে ডাইনামিক স্তরে বৈকল্য ছাড়াই কোন গঠনগত পরিবর্তন দেখা দেয় সেখানে তো হোমিওপ্যাথির প্রাথমিক স্তরে কিছুই করার নেই। যেমন- দুর্ঘটনাজনিত রক্তপাত, হাড় ভেঙ্গে যাওয়া, জলে ডুবে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হওয়া, বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়া ইত্যাদি। লাঠি দিয়ে মেরে কেউ মাথা ফাটিয়ে দিলে শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কি ক্ষতস্থানের রক্ত বন্ধ করতে বা ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাতে পারবে? ছোরা দিয়ে আঘাত

করার ফলে যকৃত ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা অন্ত্রে ছিদ্র হলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কি করতে পারে? কিছুই না। অস্ত্রোপচার দ্বারা ক্ষতস্থান ঠিকমত সারিয়ে তোলার পর যন্ত্রণা কমানো, ভাল ঝুম হওয়া, দ্রুত আরোগ্য ইত্যাদির জন্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া যাবে। নাইট্রিক অ্যাসিড শরীরের কোনো অংশে পড়লে পুড়ে যাবে। সুক্ষ্ম শক্তির ঔষধ এখানে নাইট্রিক অ্যাসিডের স্থুলক্রিয়া দূর করতে পারবে না। সেইরূপ কেউ আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে বিষ পান ক'রে থাকলে সেই বিষের স্থুল-বিষঘ্ন দিতে হবে এবং সেই বিষ যথাসম্ভব দ্রুত শরীর থেকে বের করে দিতে হবে। সুক্ষ্মশক্তির ঔষধ দিয়ে কিছু করা যাবে না।

কাজেই দেখা গেল, দূর্ঘটনাজনিত অবস্থায় হোমিওপ্যাথির ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতিগত স্বাভাবিক রোগই হলো হোমিওপ্যাথির উপযুক্ত ক্ষেত্র। প্রাকৃতিক রোগ হ'লো- কোনো রোগশক্তির সুক্ষ্ম ক্রিয়া দ্বারা জীবনীশক্তির সুক্ষ্মস্তরে বৈকল্য। এর ফলস্বরূপ প্রথমে কিছু ক্রিয়াগত লক্ষণ দেখা দেবে এবং পরে বিভিন্ন কলা অথবা দেহযন্ত্র আক্রান্ত হবে। যেসব ক্ষেত্রে রোগ এই নিয়মে শুরু ও শেষ হয় সেইসব ক্ষেত্রেই হোমিওপ্যাথি একমাত্র চিকিৎসা ব্যবস্থা যা আনুসঙ্গিক উপসর্গ ছাড়াই রোগীকে সম্পুর্ণ আরোগ্য করতে সক্ষম। প্রাথমিক পর্যায়ে এটাই হ'লো হোমিওপ্যাথির উপযুক্ত ক্ষেত্র। উপশম দেবার জন্য, অস্ত্রোপচারের পূর্বে ও পরে, দুর্ঘটনাজনিত অবস্থার পরবর্তী পর্যায়ে এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয়স্তরে শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কমবেশী সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য হোমিওপ্যাথির জন্ম নয়, সেগুলি হোমিওপ্যাথির প্রধান ক্ষেত্রও নয়।

হোমিওপ্যাথির প্রকৃত ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকলে অসম্ভবকে সম্ভব করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা হাস্যাস্পদ হবো না, অজ্ঞানতাবশতঃ মৃত্যুর কারণও হবো না আবার আরোগ্য যোগ্য ক্ষেত্রে আশু উপশমদায়ক ঔষধ প্রয়োগ করতে বা অসদৃশ চিকিৎসার স্মরণাপন্ন হতে বাধ্য হবো না। যে কোন বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা থাকা উচিত। অন্যথায় যা আমার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়, তাই করার চেষ্টা করবো। অথচ, যা সম্ভব তা ঠিকমত করতে পারবো না।

হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্র জানবার পর আমাদের জানতে হবে উপযুক্ত ক্ষেত্রেও কখন এবং কেন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আরোগ্য করতে পারে না।

আমরা জানি, যে কোন প্রকৃত স্বাভাবিক রোগের কারণ তিনটি- যথাঃ উত্তেজক (Exciting), ধারক (Fundamental) এবং বাহক (Maintaining) ঔষধ নির্বাচনে এই তিন প্রকার কারণের দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। উত্তেজক ও বাহক কারণের কুফল দূর করতে পারে এবং ধারক কারণকে দূরীভুত করতে পারে এমন ঔষধ, লক্ষণ সমষ্টির চিত্র মিলিয়ে দিলেও রোগী আরোগ্য হবে না, যদি না উত্তেজক এবং বাহক করণগুলি দূর করা হয়। যেমন, কোনো রোগী হয়ত অত্যধিক রাত্রি-জাগরণ, মদ্যপান প্রভৃতি করে। এই ভাবে দীর্ঘদিন চলতে থাকলে তার অনিদ্রা, ক্ষুধামন্দা, বদহজম বা ডিসপেপসিয়া, কোষ্টবদ্ধতা ইত্যাদি হতে পারে। এইগুলি থেকে উপশম পাওয়ার জন্য সে হয়ত নিয়মিত ঘুমের বড়ি, পার্গেটিভ ইত্যাদি ব্যবহার করে। এই রোগীর লক্ষণসমষ্টি ধরা যাক, নাক্সভুমিকাকে নির্দেশ করলো। যেহেতু নাক্সভুমিকাতে এইসব কারণ এবং লক্ষণসমষ্টির সবই মিলে গেল, তাই তাকে নাক্সভুমিকা দেওয়া হলো এবং সে যথেষ্ট ফল পেল। কিন্তু রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান প্রভৃতি উত্তেজক কারণ বর্তমান থাকলে বা সাময়িক উপশমের জন্য অসদৃশ চিকিৎসারূপ বাহক কারণ বর্তমান থাকলে নাক্সভুমিকা কোনো দিনই তাকে আরোগ্য করতে পারবে না। এখানে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। দীর্ঘদিন ভোগার ফলে এবং অসদৃশ চিকিৎসায় সাময়িক উপশম দেবার ফলে যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গঠনগত বৈকল্য দেখা দেয় তবে সুনির্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়েও তাকে আরোগ্য করা যাবে না। যেমন যক্ষ্মা রোগে ফুসফুসে বড় বড় শূন্যস্থান (Cavity) তৈরী হলে বা সিরোসিস রোগে যকৃতে খুব বেশী বর্ধিততন্তু তৈরী হলে সুনির্বাচিত ঔষধও আরোগ্য তো করবেই না, বরং প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে আরও বেশী গঠনগত বিপর্যয় করাবে এবং রোগী শ্রীঘ্রই মারা যাবে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণভিত্তিক উপশম দেওয়ার মধ্যে হোমিওপ্যাথির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

দীর্ঘদিন প্রবল ক্ষমতাশালী অসদৃশ ঔষধ স্থুলমাত্রায় দিতে থাকলে অথবা শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ উপশম দেবার উদ্দেশ্যে অহেতুক

বারবার প্রয়োগ করলে রোগীর শরীর অভ্যন্তরে একটা ঔষধজ রোগের সৃষ্টি হবে (Artificial or drug disease)। এ অবস্থায় সুনির্বাচিত ঔষধ দিয়েও আরোগ্য করা সম্ভব নাও হতে পারে। কাজেই এখানেও হোমিওপ্যাথির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

যদি কোনও রোগীতে রোগীর স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক লক্ষণ না পাওয়া যায় তবে শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কোনোই ফল পাওয়া যাবে না। যেমন পিত্তথলি বা বৃক্কের কলিক, স্টেটাস অ্যাসমাটিকাস, স্টেটাস এপিলেপটিকাস, কোমা, করনারি থ্রম্বোসিস, সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, রক্তক্ষরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণ যে সব লক্ষণ পাওয়া যায়, সবই রোগের সাধারণ লক্ষণ। রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে অথবা অচেতন থাকে। কাজেই তার স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক লক্ষণ কিছু নাও পাওয়া যেতে পারে। স্বভাবতঃই ঔষধের নির্বাচন সঠিক হয় না-ফলে রোগীর কোনোই উপকার হয় না। উপশম দিতে গেলেও স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক লক্ষণের প্রয়োজন। কাজেই স্বাতন্ত্রীকরণ না ক'রতে পারলে হোমিওপ্যাথির ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।

কোনো রোগীর যদি একটি অতি মূল্যবান দেহযন্ত্র অস্ত্রোপচার দ্বারা অপসারণ করা হয়ে থাকে, তবে সেইসব রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করা অসম্ভব- শুধু উপশম দেওয়া যেতে পারে মাত্র। এখানেও হোমিওপ্যাথির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

ইডিওসিনক্রেটিক (Idiosyncratic) রোগীদের যে ঔষধই দেওয়া যাক, সেই ঔষধেরই লক্ষণ তারা প্রকাশ করে। কাজেই এদের আরোগ্য করা অতীব দূরূহ।

দুর্ঘটনা, বিষক্রিয়া এবং প্রাথমিক পর্যায়ে অস্ত্রোপচার যোগ্য যে কোনো রোগীতেও হোমিওপ্যাথির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ- একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখানে প্রয়োজনবোধে অসদৃশ চিকিৎসার সাহায্য অবশ্যই নিতে হবে। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগ নেই- শুধু কোন দুর্ঘটনার ফলে আকস্মিক জীবনীশক্তি-হ্রাস (Inhibition) হয়েছে বুঝতে হবে। এসব ক্ষেত্রে স্থূলমাত্রায় ঔষধ দিয়ে হৃৎপিন্ড, স্নায়ু ইত্যাদির কাজ বহাল রাখলে তবেই রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা থাকে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ঔষধে আরোগ্যযোগ্য অনেক রোগও ভবিষ্যতে অস্ত্রোপচারোপযোগী হয়ে উঠতে পারে। তখন শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রোগীকে বাঁচাতে পারবে না। যেমন, পেপটিক আলসারে ছিদ্রালতা। যতক্ষণ আলসারে ছিদ্র সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে অবশ্যই বর্তমান থাকে। কিন্তু ছিদ্র সৃষ্টির পর অস্ত্রোপচার না করলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ঠিক একই অবস্থা ঘটে অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে গেলে, কোনো যান্ত্রিক কারণে অন্ত্রের ধ্বংস দেখা দিলে এবং এই রকম আরও অনেক ক্ষেত্রে।

প্রলম্বিত প্রসব (Delayed labour) এ হোমিওপ্যাথির ভুমিকা খুবই ভাল। আমাদের যথেষ্ট ঔষধ আছে যা দ্রুত এবং নিরাপদে প্রসব করাতে সক্ষম। কিন্তু যদি মায়ের পেলভিস শিশুর মাথার তুলনায় ছোট হয় (Cephalopelvic disproportion) এবং এ কারণে প্রসব না হয় সেখানে সুনির্বাচিত হোমিও ঔষধেও কিছুই হবে না। তখন অস্ত্রোপচার অপরিহার্য।

কোন গঠনগত কারণ না থাকলে বন্ধ্যাত্ব হোমিওপ্যাথিতে ভালভাবেই নিরাময় হয়। কিন্তু যদি ডিম্ববাহী নালী দুটিই বন্ধ থাকে বা জরায়ুর ফিক্সড রেট্রোভারশান বা পশ্চাদস্থিতি থাকে, তবে অস্ত্রোপচার অপরিহার্য। জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে হোমিওপ্যাথি ভালই কাজ করে কিন্তু জরায়ু যদি সম্পূর্ণভাবে বাইরে বেরিয়ে আসে (Complete Procedentia) তবে অস্ত্রোপচার অপরিহার্য। হোমিওপ্যাথির ভুমিকা এখানেও সীমাবদ্ধ।

পিত্ত বা বৃক্কের পাথুরিতে হোমিওপ্যাথির ভুমিকা বেশ ভাল। অনেক ক্ষেত্রেই শুধু ঔষধে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু যদি পাথরগুলি খুব বড় আকারের হয়, অথবা পিত্তথলি নিষ্ক্রিয় (Non-Functionig gall Bladder) থাকে তবে ঔষধে আরোগ্য হওয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অসম্ভব।

দীর্ঘদিন ধরে কোন বিশেষ ঔষধ স্থুলমাত্রায় ব্যবহার করলে এমন একটা অভ্যাস (Drug habit) দাঁড়িয়ে যায় যে, সেই অভ্যাস ছাড়ানো কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন হাঁপানীর আক্রমণ

কমাবার জন্য কোনো অ্যান্টিস্প্যাসমোডিক, ঘুমের বড়ি, মধুমেহর জন্য ইনসুলিন, রক্তাচাপের জন্য কোনো প্রচলিত ঔষধ, বাতের জন্য কর্টিসোন জাতীয় ঔষধের ব্যবহার। এ সব ক্ষেত্রে হঠাৎ এইসব ঔষধ বন্ধ করে দিলে রোগীর মধ্যে অত্যন্ত তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়- এবং রোগীর পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব নাও হতে পারে। ধীরে ধীরে এইসব ঔষধ বন্ধ করলে অনেক ক্ষেত্রে এইসব রোগীকে হোমিওপ্যাথির আওতায় আনতে পারা যায় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কোনোদিনই তা সম্ভব নাও হতে পারে।

দেহধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুর অভাবে যে সব রোগ দেখা দেয় সেখানেও হোমিওপ্যাথির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যেমন, অপুষ্টিজনিত রিকেট, স্কার্ভি, বেরি বেরি, রক্তহীনতা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে কোন রোগ নেই- শুধু পুষ্টির অভাবই এগুলির কারণ। কাজেই উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় ভিটামিনযুক্ত খাবার না দিলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেই অভাবে পূরণ ক'রবে না।

পরিশেষে, হ্যানিম্যান, কেন্ট প্রভৃতি মহামানবদের উক্তি উল্লেখ ক'রে শেষ করছি। তাঁরা বলেছেন- "Homoeopathy can cure only curable cases"। কাজেই আরোগ্যসম্ভাবনাহীন রোগে শুধু হোমিওপ্যাথি কেন যে কোনো প্যাথিরই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মৃত্যুর কোনো ঔষধ নেই।

তবে, এখানে একটা কথা মনে রাখা একান্ত দরকার। কোনটা আরোগ্যযোগ্য আর কোনটা নয় এটা সঠিকভাবে বলা এক প্রকার অসম্ভব বলেই মনে হয়। কারণ আজ যে রোগী আরোগ্যসম্ভাবনাহীন বলে মনে হচ্ছে কিছুদিন পরে হয়ত সে সেই দশা অতিক্রম করে আরোগ্যযোগ্য অবস্থায় আসতে পারে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় এমন অনেক রোগী দেখেছি যেখানে প্র্যাকটিশ অব মেডিসিন ও প্যাথলজির জ্ঞানবুদ্ধিমত রোগীকে আরোগ্য সম্ভাবনাহীন বলেই দৃঢ়ভাবে মত ব্যক্ত করেছি কিন্তু কিছুদিন পরে দেখেছি আমারই হাতে সেই রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করছে। কাজেই আপতদৃষ্টিতে আরোগ্যের সম্ভাবনা নেই মনে হলেই আরোগ্যের আশা ছেড়ে দিয়ে শুধু উপশম দেবার চেষ্টা করা উচিত নয়। কেন্টের অবজার্ভেশনগুলি অনুধাবন করে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে ঔষধ নির্বাচন

করতে হবে যাতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় এবং সম্ভাবনা থাকলে রোগী যেন আরোগ্যের পথে এগিয়ে যেতে পারে। পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তিতে ঔষধ ব্যবহার করলে এই সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট ফল পাওয়া যাবে। কারণ এই শক্তিতে গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধও রোগের যে কোন দশায় ব্যবহার করা যায় এবং একই ঔষধে উপশম ও আরোগ্য উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। এই শক্তিতে ঔষধ ব্যবহার করে চোখের ক্যানসার রোগী কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই আরোগ্য লাভ করেছে, অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার রোগীও আজ আট-দশ-বছর ভাল আছে, যকৃতের ক্যানসারের রোগীও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছে। বলাই বাহুল্য যে, এদের কোনটির ক্ষেত্রেই আমি রোগ-আরোগ্যের কোনো আশাই করিনি বরং রোগীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার আশা খুব কমই ছিল।

তাই সব পাঠককে অনুরোধ করবো, অন্য চিকিৎসাসাস্ত্রে আরোগ্য সম্ভাবনাহীন বলে ঘোষিত হয়েছে বলেই কোনো রোগীর আরোগ্যের আশা একেবারে ত্যাগ না করে বরং পঞ্চাশ-সহস্রতমিক শক্তির ঔষধ ব্যবহার করে ঐসব আরোগ্যসম্ভাবনাহীন রোগীদের আরোগ্যযোগ্য অবস্থায় এনে আরোগ্য করতে পারেন কি না সেই চেষ্টা করে দেখুন। হোমিওপ্যাথির সীমাবদ্ধতার তালিকা দীর্ঘতর না করে ক্ষুদ্রতর করার চেষ্টায় ব্রতী হোন।

হোমিওপ্যাথিতে প্যাথলজি ও মেডিসিনের স্থান
(The Scope of Pathology and Medicine in Homoeopathy)

হোমিওপ্যাথি শিক্ষাক্রমে মেডিসিন, প্যাথলজি, অ্যানাটমি, শারীরবিদ্যা, শল্যবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে পশ্চিবঙ্গে হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শুরু থেকেই। কিন্তু, হোমিওপ্যাথিতে এইসব বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন কি এবং কতটুকু সে সম্বন্ধে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণা থাকা একান্ত দরকার না হ'লে সদ্য পাশ ক'রে চিকিৎসকেরা বুঝতেই পারবেন না উক্ত বিষয় সমূহের জ্ঞান তিনি কিভাবে কাজে লাগাবেন। তাই আমরা দেখতে পাই, তাদের মধ্যে কেউ কেউ রোগ নির্ণয়ে পারদর্শী হলেও রোগ আরোগ্য করতে একেবারেই অক্ষম। অপরদিকে কেউ কেউ হয়তো মেটিরিয়ায় যথেষ্ট জ্ঞান থাকায় ঔষধ নির্বাচন ভালই করেন, কিন্তু রোগ নির্ণয়ে মোটেই সক্ষম হন না। উভয় দিকেরই ফল খারাপ। রোগী শুধু রোগ নির্ণয়ের জন্য হোমিওপ্যাথের কাছে আসেন না, আবার শুধু উপশমের জন্যও আসেন না। আসেন আরোগ্য (Cure) লাভের আশায়। এই আরোগ্য করতে হ'লে রোগ নির্ণয়, নিদান, পথ্য, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উপদেশ, ঔষধ প্রয়োগ, সবই ঠিকমত হওয়া চাই। আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে মূলতঃ আমরা হোমিওপ্যাথ এবং প্রকৃত হোমিওপ্যাথি করে রোগী আরোগ্য করাই আমাদের সর্বোচ্চ এবং একমাত্র লক্ষ্য। কাজেই, হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত বিষয়সমূহের জ্ঞান আমাদের কাছে মুখ্য এবং প্যাথলজি, মেডিসিন ইত্যাদি বিষয়সমূহের জ্ঞান গৌণ। কাজেই হোমিও প্যাথি সংক্রান্ত বিষয় সমূহের শিক্ষাকে অবহেলা করে উক্ত বিষয় সমূহের শিক্ষা কখনোই হোমিওপ্যাথিক পাঠ্যক্রমে প্রাধান্য পেতে পারে না। কিন্তু হোমিওপ্যাথির এমনই দুর্ভাগ্য, আজ আধুনিকতার মোহে এবং কপট প্রগতিবাদের নামে হোমিওপ্যাথিক বিষয় সমূহকে এক প্রকার উপেক্ষা

করে অন্যান্য বিষয় সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাসহ শিক্ষা দেওয়া হ'চ্ছে। এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে হোমিওপ্যাথির ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময় সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যাই হোক, দেখা যাক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্যাথলজি বা মেডিসিনের জ্ঞান কিভাবে প্রয়োগ করা যায়। রোগী বা তাঁর আত্মীয়স্বজন চিকিৎসকের কাছে প্রথমেই জানতে চান, রোগীর কি হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা নোসোলজিক্যাল একটা রোগের নাম জানতে চান। কারণ, কতকগুলি রোগের নাম এমনভাবে সাধারণের মধ্যে চালু হয়ে আছে যে তাঁদের ধারণা তাঁরা সব রোগের নামই জেনে গেছেন। তাছাড়া অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে সঠিক রোগ নির্ণয় না হ'লে চিকিৎসা সম্ভব হয় না ব'লে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধেও তাঁরা একই ধারণা পোষণ করে থাকেন। অনেকে তো আবার রীতিমত গল্প ফেঁদে বলেন যে, তাঁরা দেখেছেন, রোগ যদি কোনও হোমিওপ্যাথ একবার সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেন তবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যাদু মন্ত্রের মতো কাজ করে। কাজেই তাঁরা যে আমাদের কাছে প্রথমেই রোগের তথাকথিত নাম জিজ্ঞাসা করবেন এটা তো খুবই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে যদি হোমিওপ্যাথ বলেন "আমরা রোগের চিকিৎসা করি না, রোগীর চিকিৎসা করি, রোগ নির্ণয়ের আমাদের কোনও দরকার নেই," তবে তাঁকে যে অচিরেই চেম্বার বন্ধ করে দিতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া অল্পকথায় বোধগম্যভাবে রোগীর অবস্থা বোঝাতে গেলে রোগ নির্ণয়ের জ্ঞান অবশ্যই দরকার। তারপর আসে কতকগুলি অতি সাধারণ অথচ অত্যন্ত মূল্যবান কারণ-যেমন আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া, ছুটির জন্য সার্টিফিকেট, ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া ইত্যাদি। এসব স্থলে প্রচলিত রোগের একটা নাম না দিলে কেউ প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবেন না। কারণ, সংশ্লিষ্ট কেউ হোমিওপ্যাথ নন। স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরীর ক্ষেত্রেও সেই একই কথা।

এরপর আসে রোগীর দ্বিতীয় প্রশ্ন। তার অসুখ সারবে কিনা? এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে চিকিৎসককে প্যাথলজি অবশ্যই ভালভাবে জানতে হবে। কারণ রোগীর রোগাবস্থাজনিত পরিবর্তন কোন স্তরে

পৌঁছেছে- এর উপরেই নির্ভর করবে তার নিদান (Prognosis)। যকৃতের সিরোসিস রোগে খুব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দশায় আরোগ্য সম্ভভ নয়, যেমন সম্ভব নয় যক্ষ্মা রোগে ফুসফুসে বড় বড় শুন্যস্থান (cavity) সৃষ্টি হলে। তাছাড়া কোন কলা (tissue) কখন, কি অবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আবার পুনর্গঠন করতে পারে, আর কোন কলা তা পারে না- এই জ্ঞানও অ্যানাটমি ও রোগবিদ্যা থেকেই আমরা পাই। কাজেই নিদান দিতে, রোগের অবস্থা ও তার গভীরতা বুঝতে প্যাথলজির জ্ঞান অপরিহার্য।

এরপর রোগীর তৃতীয় প্রশ্ন- কতদিনে আরোগ্য হবে? এর জবাবও নির্ভর করে রোগের প্রকৃতি, স্তর এবং যান্ত্রিক পরিবর্তনের উপর। কাজেই এখানেও প্যাথলজির জ্ঞান অপরিহার্য। অবশ্য "অর্গ্যানন এবং ক্রনিক ডিসিস" গ্রন্থ, ডাঃ কেন্টের দ্বাদশ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি আয়ত্ত থাকলে প্যাথলজির জ্ঞান ছাড়াও রোগের মেয়াদ ও নিদান বলা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্যাথলজি ও হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের জ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক।

এরপর আসে রোগীর সাধারণ ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন। সংক্রামক রোগে রোগীর সংস্পর্শে এসেছে এমন লোকদের কতদিন তত্ত্বাবধানে (Quarnatine) রাখা দরকার, সংক্রামক রোগ নির্ধারণ করতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ইত্যাদি আমরা প্যাথলজি ও মেডিসিনের জ্ঞান থেকে পাই। তাছাড়া রোগীর পথ্য, বিশ্রাম, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ও বিভিন্ন রোগ প্রসঙ্গে মেডিসিন গ্রন্থে পাই। মোট কথা ঔষধ প্রয়োগ ছাড়াও রোগী চিকিৎসার জন্য অন্য যে সব ব্যবস্থাপত্র দিতে হয় তা ঠিকমত জানার জন্য উক্ত বিষয় সমূহের জ্ঞান বিশেষভাবে দরকার। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে আমাশয়ের (Bacillary dysentery) রোগীর পথ্য নির্ধারণ করতে হলে জানা দরকার কোন জীবাণুর কারণে রোগটি হয়েছে। যেমন যদি ফ্লেকসনার জীবাণুর কারণে হয়ে থাকে, তবে রোগীকে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য দিতে হবে। সেক্ষেত্রে বার্লি ইত্যাদি শর্করা জাতীয় খাদ্য পথ্য হিসাবে দিলে রোগটি বেড়ে যাবে। তেমনি, যদি সিগা জীবাণুর দ্বারা হয়ে থাকে তবে তাকে বার্লি ইত্যাদি শর্করা জাতীয় খাদ্য

দিতে হবে- প্রোটিন দিলে রোগের বৃদ্ধি হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্যাথলজির জ্ঞান এসবক্ষেত্রে অপরিহার্য।

তবে এ পর্যন্ত যা বলা হোল, এসব যে কোন শাস্ত্রের চিকিৎসকের পক্ষেই প্রযোজ্য। এবারে দেখা যাক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে এইসব বিষয়ের জ্ঞান কতটুকু সাহায্য করে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা রোগী-স্বাতন্ত্রীকরণের (Individualisation) উপর নির্ভর করে। এই স্বাতন্ত্রীকরণ আবার লক্ষণের মূল্যায়ণের উপর নির্ভর করে। রোগের সাধারণ লক্ষণ এবং লেবরেটরী পরীক্ষায় প্রাপ্ত লক্ষণগুলির মূল্য হোমিওপ্যাথিতে খুব কম। কারণ এই লক্ষণগুলি স্বাতন্ত্রীকরণে বিশেষ সাহায্য করে না। যেমন, নিউমোনিয়া রোগীতে প্রবল জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, সুরকির গুঁড়ার মত কফ, ফুসফুস শক্ত হওয়া, রক্তের শ্বেত কণিকা বৃদ্ধি পাওয়া, কফ পরীক্ষায় নিউমোকককাস পাওয়া ইত্যাদি নিউমোনিয়ার সাধারণ লক্ষণ। সব নিউমোনিয়া রোগীতেই এই লক্ষণ থাকে। কাজেই এইসব লক্ষণের উপর কোন ঔষধ নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু রোগী কোন পাশ ফিরে শুলে আরাম বোধ করে, জল পিঁপাসা কেমন, অস্থিরতা আছে কিনা, জিহ্বা পরিস্কার না প্রলেপযুক্ত,ঘাম কেমন, ঘামে স্বস্তি অনুভব করে কিনা এইসব লক্ষণ রোগীর স্বাতন্ত্রজ্ঞাপক এবং এগুলির উপরই ঔষধ নির্বাচন নির্ভর করে। কাজেই, প্যাথলজি না জানলে লক্ষণের মূল্যায়ণ হবে কি করে? কে বলে দেবে কোন রোগীতে কোন লক্ষণ সাধারণ বলে গণ্য করা হবে এবং কোথায় ও কখন তা স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক বলে গণ্য হবে? বুকে সুঁচ ফোটার ন্যায় যন্ত্রণা- জোরে চাপলে উপশম-এই লক্ষণটা ব্রায়োনিয়ার স্বাতন্ত্রজ্ঞাপক লক্ষণ কিন্তু একটা প্লুরিলি রোগীতে এই লক্ষণ পেলে তা প্লুরিসির লক্ষণ বলে গণ্য হবে এবং শুধু ঐ লক্ষণ দেখে ব্রায়োনিয়া নির্বাচন করা যাবে না। প্লুরিসি ছাড়া অন্য কোনো রোগে এই লক্ষণ থাকলে তা ব্রায়োনিয়াকে নির্দেশ করতে পারে কিন্তু প্লুরিসিতে ঐ লক্ষণের উপর ব্রায়োনিয়া দেওয়া যাবে না- কারণ এটা প্লুরিসির একটা সাধারণ লক্ষণ কাজেই দেখা যাচ্ছে, একই লক্ষণ কখনও স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক হচ্ছে, আবার কখনও বা অতি সাধারণ বলে গণ্য করা

হচ্ছে। এটা করা সম্ভব হবে যদি প্যাথলজির যথেষ্ট জ্ঞান থাকে। অন্যথায়, সাধারণ লক্ষণকে বেশী মূল্য দিয়ে এবং মূল্যবান লক্ষণকে কম মূল্য দিয়ে প্রতিপদে ভুল করা হবে এবং রোগী আরোগ্য হবে না। আমার তেইশ বছরের অভিজ্ঞতায় প্রতিদিন অনুভব করছি প্যাথলজি ও মেডিসিনের জ্ঞান কিভাবে আমাকে লক্ষণের মূল্যায়ণে তথা সঠিক ঔষধ নির্বাচনে সাহায্য করে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে এইসব বিষয়ের জ্ঞান লক্ষণের মূল্যায়ণের জন্যই একজন হোমিওপ্যাথের কাছে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। একটা নেফ্রাইট্রিস রোগীতে চোখের চারধারে প্রথমে ফোলা শুরু হয়- তারপর সারা শরীর ফুলে যায়, প্রস্রাব কম হয়, সাধারণতঃ জলপিপাসা থাকে না। এই সব সাধারণ লক্ষণের উপর নির্ভর করে এপিস দিলে ভুল করা হবে। কিন্তু যদি এই সঙ্গে সর্বশরীরে হুল বিদ্ধ মত যন্ত্রণা এবং ঠান্ডায় উপশমের লক্ষণ থাকে, তবেই তা এপিসকে নির্দেশ করবে। জ্বালা মিশ্রিত যন্ত্রণা থাকলে এবং গরম প্রয়োগে উপশম হলে কিন্তু আর্সেনিক দিতে হতে পারে। কাজেই, দেখা যাচ্ছে কোন রোগে কোন লক্ষণ সাধারণ এবং অসাধারণ তা জানা লক্ষণের মূল্যায়ণে অপরিহার্য।

অনেক সময় রোগী তার অতীত বা বংশ-ইতিহাস ঠিকমত বলতে পারে না বা ভুলে যায়। এসব ক্ষেত্রে প্যাথলজির জ্ঞান অনেক সময় যথেষ্ট সাহায্য করে। অতীতে কোনো সারভাইক্যাল গ্রন্থি পেকে উঠে থাকলে গলা স্কার মার্ক দেখে বোঝা যায়, তার টিউবারকুলার গ্ল্যান্ড হয়েছিল কিনা। তখন জিজ্ঞাসা করলে রোগীর স্মরণ হবে এবং তার বিবৃতিমত ঔষধ নির্বাচন করা সহজ হবে। পনেরো ষোল বছরের একটি ছেলেকে হাঁপানির চিকিৎসার জন্য আমার কাছে আনা হয়েছিল। তার সব ইতিহাস শুনে ও সামগ্রিক লক্ষণ বিচার করে সাইলিসিয়া দেবো মনে মনে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু রোগীকে পরীক্ষা করতে যেয়ে দেখলাম তার বুক পায়রার আকৃতি বিশিষ্ট। তখন অনুসন্ধান করে জানলাম_ রোগীর ছোটবেলায় মারাত্মক ধরণের হুপিংকাশি হয়েছিল এবং তার মাসখানেক পর থেকেই রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। অথচ যখন তার ইতিহাস প্রায় এক ঘন্টা ধরে নেওয়া হয়েছিল তখন কিন্তু রোগী একথা বলেনি। যাই হোক

সাইলিসিয়ার পরিবর্তে তাকে হাজার শক্তির পার্টসিন একমাত্রা দিই এবং আশ্চর্যের বিষয় যে ঐ ঔষধেই সে আরোগ্য লাভ করে। সাইলিসিয়া বা অন্য কোন ঔষধের আর কোন প্রয়োজন হয় নি।

এরপর আসে ঔষধের শক্তি নির্বাচন ও পুনঃ প্রয়োগে প্যাথলজি ও মেডিসিনের প্রয়োজনীয়তা। হোমিওপ্যাথিক শক্তিকৃত ঔষধ প্রয়োগের আগে তার শক্তি-নির্বাচন এক সমস্যা বিশেষ। কারণ, ঔষধের শক্তি নির্বাচন নির্ভর করে রোগীর প্রবণতার উপর। কিন্তু এই প্রবণতা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার কোনো উপায় নেই। বিভিন্ন উপায়ে আমরা মোটামুটি প্রবণতা বিষয়ে একটা অনুমান করতে পারি মাত্র। তাই একই রোগীতে কেউ তিরিশ শক্তির ঔষধ নির্বাচণ করেন, কেউ দু'শ শক্তি নির্বাচন করেন আবার কেউ বা এক হাজার, দশ হাজার বা এক লক্ষ ইত্যাদি শক্তি নির্বাচণ করেন। প্যাথলজি সম্বন্ধে মোটামুটি ভাল জ্ঞান থাকলে এই প্রবণতা সম্বন্ধে প্রায় সঠিক একটা ধারণা করা যায়। প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন যত বেশী হবে রোগীর প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা অর্থাৎ প্রবণতা তত কম হবে। কাজেই যে রোগীতে খুব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখা যায় সেখানে ছয়, বারো, তিরিশ ইত্যাদি নিম্ন শক্তির ঔষধ ব্যবহার করা বিধেয়। যেখানে অল্প পরিবর্তন হয়েছে বা সবে গঠনগত পরিবর্তন শুরু হয়েছে সেখানে ত্রিশ থেকে দু'শ শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। আর যেখানে একেবারেই কোন গঠনগত পরিবর্তন হয়নি, সেখানে দু'শ থেকে হাজার, দশ হাজার ইত্যাদি শক্তি ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে পঞ্চাশ সহস্রতমিক শক্তির প্রচলন হওয়ায় এই সমস্যার অনেকটা সুরাহা হয়েছে।

ঔষধের পুনঃ প্রয়োগেও এইসব বিষয়ের জ্ঞান যথেষ্ট সাহায্য করে। তরুণ রোগের প্রকৃতিই এমন যে খুব দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। ফলে ঔষধের ক্রিয়া বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। এসব ক্ষেত্রে গঠনগত পরিবর্তন খুব বেশী হয় না- হলেও গঠনগত বিপর্যয় বা ধ্বংস হওয়ার প্রবণতা সাধারণতঃ থাকে না। কাজেই, এসব ক্ষেত্রে উচ্চ শক্তির ঔষধ বারবার প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যায়। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর

ব্যক্তিক্রম আছে। এ বিষয়ে ঔষধের শক্তি নির্বাচন প্রবন্ধে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। যাই হোক, চিররোগে কিন্তু ঠিক বিপরীত অবস্থা। সেখানে ধীরে ধীরে রোগ শুরু হয় এবং গঠনগত বিনাশের প্রবণতা প্রথম থেকেই দেখা যায়। কাজেই এসব ক্ষেত্রে তিরিশ শক্তি বা তার চেয়ে কম শক্তির ঔষধ একমাত্রা প্রয়োগ করে ভালভাবে ঔষধের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে হয়। তারপর, প্রয়োজনমত পুনঃ প্রয়োগ করতে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঔষধের শক্তি ও তার পুনঃ প্রয়োগে প্যাথলজি ইত্যাদির জ্ঞান বিশেষভাবে সাহায্য করে।

সব শেষে আসে থেরাপিউটিক্স্, রেপার্টরী, মেটিরিয়া ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে সহায়তা। এইসব গ্রন্থে বিভিন্ন রোগের নোসোলিজিক্যাল নাম ও তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের কথা লেখা আছে। প্যাথলজি না জানলে এগুলি যথার্থভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে থেরাপিউটিকস পড়ার বা পড়াবার ঘোর বিরোধী। কারণ থেরাপিউটিস-এ কোন রোগের জন্য যে সব ঔষধ লেখা আছে তা ছাড়াও অনেক ঔষধ লাগতে পারে। কাজেই থেরাপিউটিকস পড়লে জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। তবে প্যাথলজি ইত্যাদির জ্ঞান থাকলে মেটিরিয়া মেডিকাতে ঔষধের যে ডাইনামিক প্যাথলজি দেওয়া আছে তা কোন ধরণের অর্গ্যানিক প্যাথলজি বা রোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং কোন ক্ষেত্রে উক্ত ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা করা যায়। তাছাড়া রেপার্টরীর সাহায্য আমাদের কাছে অপরিহার্য। কোন রেপার্টরী পড়তে গেলেও প্যাথলজি, মেডিসিন ইত্যাদির জ্ঞান বিশেষভাবে দরকার।

সবশেষে তরুণ-রোগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্যাথলজির জ্ঞান আমাদের মাত্র অল্প কয়েকটি ঔষধের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নির্দেশ করে। ফলে পরিশ্রম অনেক কমে যায়। প্রত্যেক রোগীতে একোনাইট থেকে জিঙ্কাম পর্যন্ত ঔষধের চিন্তা করার দরকার হয় না। অল্প কয়েকটা ঔষধের থেকে রোগীর স্বাতন্ত্রজ্ঞাপক লক্ষণের সাহায্যে সহজেই সঠিক ঔষধ নির্বাচন করা যায়।

এ বিষয়ে তাই আর কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় যে প্যাথলজি, মেডিসিন ইত্যাদির জ্ঞান ছাড়া প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা যায় না।

কিন্তু আমি শুরুতেই বলেছি এর সীমা সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় হোমিওপ্যাথির জন্য প্যাথলজি না শিখে প্যাথলজির জন্য হোমিওপ্যাথি শেখার মত হবে। দেশে প্যাথলজিষ্ট-এর অভাব নেই, অভাব আছে প্রকৃত হোমিওপ্যাথের। আমরা মুলতঃ হোমিওপ্যাথ এই সত্য যেন আমরা কখনও না ভুলি।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রেপার্টরীর ব্যবহার

রেপার্টরী লক্ষণসমূহের সূচক বিশেষ। সম্ভাব্য সব রকম লক্ষণ রেপার্টরীতে বিভিন্ন অধ্যায়ে ও শাখায় ভাগ করা আছে। প্রত্যেকটি লক্ষণের শিরোনামকে রুব্রিক (Rubric) বলে। প্রত্যেকটি রুব্রিক-এর পাশে সম্ভাব্য সবগুলি ঔষধের নাম লেখা আছে অর্থাৎ যে যে ঔষধে উক্ত রুব্রিক তথা লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে তার সবগুলির নাম মূল্যের ক্রম অনুসারে সাজানো আছে। যে লক্ষণ যে ঔষধে বেশীরভাগ প্রুভারের মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে দেখা গেছে এবং বারবার প্রুভিং করে সেই একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং রোগীতেও সেই লক্ষণ অনুসারে উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করে আরোগ্য সম্ভব হয়েছে সেই ঔষধগুলি মোটা হরফে (Bold letter) এ দেওয়া আছে। যে ঔষধগুলিতে যে লক্ষণ বেশ কিছু সংখ্যক প্রুভারের মধ্যে দেখা গেছে এবং পুনরায় প্রুভিং করে তার যথার্থতা নির্ণয় করা হয়েছে এবং সেই লক্ষণের উপর নির্ভর করে ঔষধ প্রয়োগ ক'রে আরোগ্য হতে দেখা গেছে সেই ঔষধগুলি বাঁকা হরফে (Italics)-এ দেওয়া আছে। কিন্তু যে ঔষধে যে লক্ষণগুলি মাত্র দু-চার জন প্রুভারের মধ্যে দেখা গেছে, পুনরায় প্রুভিং হয়নি অথচ যার উপর নির্ভর করে ঔষধ দিয়ে রোগী আরোগ্য হতে দেখা গেছে, সেই ঔষধগুলি সেই লক্ষণের পাশে সাধারণ হরফে লেখা আছে। ঔষধের এই মূল্যায়ণ রেপার্টরীর সাহায্যে ঔষধ-নির্বাচন করতে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করে।

লক্ষণ সমষ্টির চিত্র ঠিকমত পাওয়া গেছে রেপার্টরীর সাহায্য ছাড়াও ঔষধ নির্বাচনে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু একদেশদশী রোগে যেখানে লক্ষণ সমষ্টির সঠিক চিত্র পাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না সেখানে রেপার্টরী আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। তা ছাড়া লক্ষণ-সমষ্টি যদি একটিমাত্র ঔষধকে নির্দেশ না করে এবং দু-তিনটি ঔষধ আংশিকভাবে সদৃশ বলে মনে হয় তখন সঠিক ঔষধটি নির্বাচন করতে রেপার্টরীর সাহায্য অপরিহার্য। মেটেরিয়া মেডিকার যে কোন একটি

ঔষধের সব লক্ষণ মনে রাখা সাধারণত আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো রোগী হয়ত কোন একটি বিশেষ লক্ষণ দিল, যা কোন ঔষধে আছে আমার স্মরণ নেই- অথবা যে ঔষধে আছে বলে আমি জানি সেই ঔষধের সাথে রোগীর ধাতুগত ও মায়াজমেটিক অবস্থার মিল নেই, এক্ষেত্রে আর কোন ঔষধে ঐ একই লক্ষণ আছে তা জানতে হলে রেপার্টরী ছাড়া উপায় নেই। তরুণ রোগে রোগী যে সব লক্ষণ সচরাচর দেয় তার বেশীর ভাগই হল রোগের সাধারণ লক্ষণ। সে সব ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধরে পর্যবেক্ষণ করলে হয়ত একটা অদ্ভুত বা বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু রেপার্টরীর সাহায্য ছাড়া সেই লক্ষণ-বিশিষ্ট বিশেষ ঔষধটি খুঁজে পাওয়া অনেক সময় অসম্ভভ হয়ে পড়ে। একটা শিশুর তড়কা রোগে অনেকগুলি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করেও যেখানে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখতে পেলাম প্রত্যেকবার তড়কার পর শিশুটির মুখ দিয়ে প্রচুর লালা ঝরছে। কোন ঔষধে এই লক্ষণ আছে তখন আমার জানা ছিল না। রেপার্টরী দেখে রোগীকে Oenanche Crocata দিই এবং অচিরেই রোগী আরোগ্য লাভ করে। আরোগ্য সম্ভাবনাহীন ও দুরারোগ্য রোগে উপশম দেবার জন্যও রেপার্টরীর সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে এই বিষয়টির শিক্ষা ও ব্যবহার অত্যন্ত উপেক্ষিত। এর কারণ কি তা আমার জানা নেই। অনেকে বলেন রেপার্টরীর করতে অনেক সময় লাগে তাই এর প্রচলন বেশী নেই। কিন্তু দু-চার মিনিটের মধ্যেই কত সহজে রেপার্টরীর সাহায্যে ঔষধ নির্বাচন করা যায় এটা হয়ত তাঁরা কখনও দেখেন নি। তাই তাঁরা এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে রেখেছেন। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষাক্রমে এ পর্যন্ত রেপার্টরীর উপর কোন গুরুত্ব না থাকায় সদ্য পাশ করা চিকিৎসকেরা রেপার্টরীর সাহায্য লাভে এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভে বঞ্চিত হন। রেপার্টরীর ব্যবহার ঠিকমত না জেনে রেপার্টরীর ব্যবহার করতে যাওয়া সময়ের অপচয়, বিরক্তিকর এবং পন্ডশ্রম মাত্র। কিন্তু যাঁরা এর ব্যবহার জানেন তাঁদের কাছে রেপার্টরী করাটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসু একথা ভুক্তভোগী মাত্রই স্বীকার করবেন।

রেপার্টরীর অনেকগুলি বই আছে বিভিন্ন স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের লেখা-যথা ডাঃ কেন্ট, নার, বোনিংহোসেন, বোগার ইত্যাদি। আমি ডাঃ কেন্ট-এর রেপার্টরীই প্রথম থেকে অনুসরণ করি। তাই ডাঃ কেন্ট-এর রেপার্টরীর বিষয়বস্তু এবং তা ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে দু-চার কথা লিখছি। কিন্তু পাঠকদের অনুরোধ করবো অন্যান্য রেপার্টরীও বিশেষভাবে বোনিংহোসেন-এর রেপার্টরী যেন তাঁরা অবশ্যই ব্যবহার করেন। কারণ কোন একটা রেপার্টরী স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ডাঃ কেন্ট-এর রেপার্টরীতেও আমরা প্রয়োজনীয় সব রুব্রিক (Rubric) সব সময়ে পাই না। পেলেও তা এমনভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছড়ানো আছে যে খুঁজে পেতে বেশ অসুবিধা হয়।

ডাঃ কেন্ট তাঁর রেপার্টরীকে একত্রিশটি অংশে ভাগ করেছেন, যার শুরু "মন" এই অধ্যায় দিয়ে এবং শেষ "সামগ্রিক লক্ষণের" (generalities) অধ্যায়ে। শুরু ও শেষ এই অধ্যায় দুটিতে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর বেশীর ভাগই পাওয়া যায়। যাই হোক প্রত্যেকটি অধ্যায়ে লক্ষণগুলিকে বিভিন্ন রুব্রিক (Rubric) এ রূপান্তরিত করে সাজানো আছে। কিন্তু সব অধ্যায়েই অতি সুন্দরভাবে একই নিয়ম অনুসরণ করে রুব্রিক (Rubric)-গুলি সাজানো হ'য়েছে। অর্থাৎ সাধারণভাবে বর্ণিত লক্ষণ থেকে শুরু করে পরপর বিশেষভাবে বর্ণিত লক্ষণ দেওয়া আছে (from generals to particulars)। যেমন "মাত্রার যন্ত্রণা" এই রুব্রিক (Rubric)-এ প্রথমেই সাধারণভাবে একটা রুব্রিক (Rubric)-এ মাথার যন্ত্রণার সম্ভাব্য সব ঔষধগুলিই দেওয়া আছে। তারপর স্থান অনুসারে সামনের (forehead), পেছনের (occipital), পার্শ্বের (temporal) যন্ত্রণার বিভিন্ন রুব্রিক (Rubric) দেওয়া আছে। তারপর আবার যন্ত্রণার প্রকৃতি অনুসারে (দপদপ, কনকন, ইত্যাদি) রুব্রিক-এ ভাগ করা আছে। তারপর হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়গুলি, অসাধারণ বা অদ্ভুত লক্ষণ ইত্যাদির বিশদ বর্ণনাসহ বিভিন্ন রুব্রিক আছে। যেমন "মন" এই অধ্যায়ে "ভয়" এই লক্ষণের জন্য প্রথমেই একটা সাধারণ রুব্রিক 'fear' এই শিরোনামায় দেওয়া আছে। তারপর বিভিন্ন

রকম ভয়ের লক্ষণ বিভিন্ন রুব্রিক-এ পৃথক পৃথক শিরোনামায় দেওয়া আছে। যথা-ভুতের ভয়, অন্ধকারের ভয়, কুকুরের ভয়, চোর-ডাকাতের ভয়, ইত্যাদি। পরে আরও বিশদভাবে কোন ভয় কখন ও কিসে বাড়ে বা কমে তাও পৃথক পৃথক রুব্রিক-এ ভাগ করে পৃথক শিরোনামায় দেওয়া আছে।

রেপার্টরী ব্যবহার করতে হলে প্রথমেই বিভিন্ন অধ্যায়ের রুব্রিকগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে হবে। লক্ষণগুলি কিভাবে রুব্রিক-এ রূপান্তরিত করা আছে তা না জানলে রেপার্টরী ব্যবহার সম্ভব নয়। কারণ রেপার্টরীতে কি আছে, কোথায় আছে, কিভাবে আছে তা না জানলে রেপার্টরী থেকে ঔষধ খুঁজে বার করা যাবে কিভাবে? আমার কাছে কি অস্ত্র আছে তা যদি আমি না জানি তবে প্রয়োজনমত তা ব্যবহার করা কি সম্ভব?

রুব্রিক পরিচিতির পর দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় হল হ্যানিম্যানের নির্দেশমত রোগীর লক্ষণ সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা। লক্ষণ-সংগ্রহে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ পড়লে রেপার্টরী করা বৃথা পন্ডশ্রম হবে। যেমন রোগীর অতীত ইতিহাসে কোনো তরুণ রোগের ঘটনাকে মূল্যহীন মনে করে লিপিবদ্ধ করা হল না। কিন্তু সেই তরুণ রোগের ঘটনাই বা তার "অসদৃশ" চিকিৎসাই হয়তো এই রোগীর আরোগ্যের পথে বাঁধা হয়ে আছে। এক্ষেত্রে রেপার্টরী করে কখনোই সঠিক ঔষধ নির্বাচন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া রোগীর না বলতে পারা বা না বলা অনেক কথাই হয়ত লক্ষণ-সংগ্রহের সময় চিকিৎসকের অজ্ঞাত থেকে যায়। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করলে তবেই সব কিছু পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ লক্ষণ-সমষ্টি থেকে রেপার্টরী করায় কোনোই ফল হবে না।

লক্ষণ সংগ্রহের পর আসে লক্ষণের মূল্যায়ণ। যথাযথভাবে লক্ষণের মূল্যায়ণ করতে পারলে তবেই রেপার্টরী থেকে সঠিক ঔষধ পাওয়া যাবে। রোগের সাধারণ লক্ষণ মনে করে যে লক্ষণ বাদ দেওয়া হ'লো হয়তো তার মধ্যেই কোনো অসাধারণত্বঃ লুকিয়ে আছে। বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ

ও অনুধাবণ করলে তবেই তা বোঝা যায়। অথবা রোগীর কোনো বিশেষ মানসিক লক্ষণকে সাধারণ লক্ষণ বিবেচনা ক'রে কোনোই গুরুত্ব দেওয়া হলো না। এসব ক্ষেত্রে রেপার্টরী থেকে সঠিক ঔষধ নির্বাচন করা কি সম্ভব? আমরা যে লক্ষণ রেপার্টরীতে দেখতে চাই, তাই পাবো। কিন্তু কোন লক্ষণ দেখতে হবে আর কোনটা বাদ দিতে হবে তা তো রেপার্টরী বলে দেবে না- দেবে চিকিৎসকের মূল্যায়ণের ক্ষমতা। দশটি স্থানীয় লক্ষণের রেপার্টরী করে যে ঔষধ নির্বাচিত হবে তা হয়তো একটা মাত্রা সামগ্রিক লক্ষণ দ্বারা নাকচ হয়ে যাবে। কাজেই রেপার্টরী ব্যবহার করার মূল্যায়ণের দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। এই মূল্যায়ণে লক্ষণের অনুশীলন বা বিশ্লেষণ (analysis) এবং সংগৃহীত সব লক্ষণের অ্যানামনেসিস (anamnesis) বা সংগঠন একান্ত দরকার।

এর পরের কাজ হলো রেপার্টরীর জন্য নির্বাচিত লক্ষণগুলিকে রেপার্টরীর রুব্রিক-এর ভাষায় পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত করা। রোগী যে ভাষায় লক্ষণ প্রকাশ করে সেই ভাষায় রেপার্টরীর রুব্রিক নাও পাওয়া যেতে পারে। কাজেই রোগীর ভাষাকে রেপার্টরীর ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারলে তবেই রেপার্টরী আমাদের সাহায্যে আসবে, অন্যথায় নয়।

এরপর আসে রোগীর লক্ষণের প্রাবল্য। রোগীতে যে লক্ষণ খুব উগ্রভাবে বর্তমান, রেপার্টরী থেকে নির্বাচিত ঔষধেও সেই লক্ষণ তেমনই প্রকট থাকা দরকার। যেমন প্রচুর ঘাম-মুক্ত কোনো রোগীর জন্য ঘামের রুব্রিক থেকে মোটা অক্ষরে দেওয়া ঔষধগুলিই নেওয়া দরকার। অন্ততঃ বাঁকা অক্ষরে দেওয়া ঔষধ হওয়া চাই। সাধারণ অক্ষরে দেওয়া সামান্য ঘাম আছে এমন ঔষধ হলে হবে না।

রেপার্টরী করার পূর্ব-প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আলোচনা করা হলো। এবারে কিভাবে রেপার্টরী থেকে ঔষধ নির্বাচিত হবে সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

মূল্যায়ণ করা এবং রেপার্টরী করার জন্য বাছাই করা লক্ষণগুলি থেকে মানসিক এবং অন্য সামগ্রিক লক্ষণগুলির প্রয়োজনীয় রুব্রিক থেকে

ঔষধের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রত্যেকটি ঔষধের নামের পাশে মূল্য হিসাবে মোটা অক্ষরের জন্য তিন বাঁকা অক্ষরের জন্য দুই এবং সাধারণ অক্ষরের জন্য এক হিসাবে মূল্য লিখতে হবে। এইভাবে সামগ্রিক লক্ষণের রেপার্টরীকরণ শেষ হলে স্থানীয় লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল লক্ষণ এবং সবশেষে ল্যাবরেটরী থেকে প্রাপ্ত লক্ষণের রেপার্টরীকর। করতে হবে। ইতিপূর্বে বলা নিয়ম অনুসারে ঔষধের মূল্যও লিখতে হবে। কিন্তু একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে-মানসিক ও সামগ্রিক লক্ষণগুলি যদি খুব প্রকট থাকে তবে যে সব ঔষধে সেই লক্ষণগুলি থাকবে না, পরের রুব্রিক থেকে ঔষধের তালিকা লেখার সময় সেই ঔষধগুলিকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে কোনো একটি সামগ্রিক লক্ষণ যদি বিশেষভাবে প্রকট হয়, যাকে বাদ দিয়ে ঔষধ-নির্বাচন করা চলে না, তবে সেই লক্ষণটির রেপার্টরীকরণ প্রথমে করে নিয়ে পরের রুব্রিকগুলিতে যে সব ঔষধ ঐ লক্ষণ দেখায় না সেগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে। এই ধরণের লক্ষণকে এলিমিনেটিং (Eliminating) লক্ষণ বলে। যেমন প্রচন্ড গরমের সময়েও যদি কেউ শীতবোধ করে বা গরম পোষাক পরে বা রাত্রে গরম কম্বল গায়ে দিয়ে শয়ন করে, তবে তার জন্য প্রথম রুব্রিক হিসাবে "শীতকাতরতা" এই লক্ষণ নিতে হবে। পরের রুব্রিকগুলি থেকে গরমকাতর ঔষধগুলি সহজেই বাদ দেওয়া যেতে পারে।

যাই হোক সব লক্ষণের রেপার্টরীকরণ শেষ হলে- যে ঔষধ সর্বোচ্চ মূল্য লাভ করে, সেটাই সাধারণভাবে রোগীর জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। কিন্তু চুড়ান্ত নির্বাচন চিকিৎসকের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করে। অন্যথায় রেপার্টরীর ব্যবহার যান্ত্রিকতার পর্যায়ে পড়বে। ধরা যাক, কোনো চির রোগের রোগীতে সালফার সর্বোচ্চ মূল্য লাভ করলো, সিপিয়া দ্বিতীয় এবং ক্যালকেরিয়া কার্ব তৃতীয় মূল্য লাভ করলো। এখন রেপার্টরীর নিয়ম অনুসারে সালফারই রোগীকে প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু রোগীর চেহারা, মানসিক গঠন ইত্যাদি বিবেচনা ক'রে চিকিৎসক মনে করলেন ক্যালকেরিয়া কার্বই তার সঠিক ঔষধ। এখানে চিকিৎসককে মেটেরিয়া মেডিকার সাহায্য নিতে হবে। মেটেরিয়া থেকে তিনটি ঔষধই

ভালভাবে পড়ে তিনি নিশ্চিত হলেন যে ক্যালকেরিয়া কার্বই সঠিক ঔষধ এবং রোগীকে ক্যালকেরিয়া কার্ব প্রয়োগ করায় সে আরোগ্য লাভ করলো। কাজেই, দেখা গেল রেপাটরী ঔষধ নির্বাচনে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চিকিৎসকের। রেপার্টরী নির্বাচক নয়, সাহায্যকারী-এটা আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে। অন্যথায়, রেপার্টরী করে অকৃতকার্য হয়ে হোমিওপ্যাথির উপরই আস্থা চলে যাবে। অনেক সময় একই লক্ষণের জন্য আমাদের একাধিক রুব্রিক-এর সাহায্য নেবার দরকার হতে পারে। যেমন, ভুতের ভয় এই লক্ষণের জন্য অন্ধকারের ভয় এবং ভুতের ভয় এই উভয় রুব্রিকই গ্রহণ করতে হবে। অনেক সময় যে রুব্রিক দরকার তা যদি রেপার্টরীতে না থাকে, তবে তার বিপরীত রুব্রিক নেওয়া দরকার হতে পারে- যেমন কোনো লক্ষণ গরমে উপশম এই রুব্রিক হয়তো রেপার্টরীতে নেই। তখন ঠান্ডায় বৃদ্ধি এই রুব্রিক নিলে সঠিক ঔষধ-নির্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য হতে পারে অবশ্য সবক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এখানেও মেটেরিয়া মেডিকাই চুড়ান্ত সহায়ক হবে।

অনেক সময় কোনো লক্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধির ঘটনা বা বিশেষ প্রকৃতি হয়ত সেই লক্ষণের রুব্রিক-এ নেই। এ অবস্থায় সেই লক্ষণটির সাধারণ রুব্রিক এবং হ্রাস-বৃদ্ধির বা প্রকৃতির জন্য সামগ্রিক লক্ষণ বা জেনারালিটিস (generalities)এর উক্ত বিষয়ের হ্রাস বৃদ্ধির রুব্রিক নিতে হবে। যেমন কানে কম শোনা, শয়নে উপশম- এই লক্ষণের জন্য "শোনা" (Hearing)-এই অধ্যায়ে "কম শোনা" (hardness of hearing)এই রুব্রিক নিতে হবে এবং সামগ্রিক লক্ষণ (generalities) এই অধ্যায় থেকে শয়নে উপশম "Lyingameliorates") এই রুব্রিক নিতে হবে।

পরিশেষে, একটা কথা মনে রাখা বিশেষভাবে দরকার যে প্রত্যেকটি রোগীতে রেপার্টরীর উপর নির্ভর করলে তার ফল খুব বিপজ্জনক হবে। কারণ তাহলে আমরা লক্ষণ সমষ্টির চিত্র পেতে সচেষ্ট হবো না বরং রেপার্টরীর দাস হয়ে পড়বো। তখন রেপার্টরীই আমাদের চালাবে। আমরা

যন্ত্রচালিতের ন্যায় রোগীর ঔষধ নির্বাচন করে চলবো এবং অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতায় হোমিওপ্যাথির উপর আস্থা হারিয়ে একবারে তিন, চারটি ঔষধ, মাদার টিনচার, টনিক, স্পেসিফিক ইত্যাদি প্রয়োগ করতে বাধ্য হবো। রেপার্টরী চিকিৎসকের কাজ করতে পারে না। তা যদি হতো তবে একজন সাধারণ লোককে দিয়েই রেপার্টরী করিয়ে নিলেই চলতো। মেটেরিয়া মেডিকা-রূপ অগাধ সমুদ্রে রেপার্টরী একটা অবলম্বন মাত্র।

জাতীয়-স্বাস্থ্যে হোমিওপ্যাথির ভূমিকা
(The scope of Homoeopathy in Community Health)

আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে অনেকগুলি সমস্যা দেখা দেয়, যথা-সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা সম্পর্কীয়, স্বাস্থ্য ও ঔষধ সম্পর্কীয় ইত্যাদি। চিকিৎসক হিসাবে, আমরা স্বাস্থ্য ও ঔষধ সম্পর্কীয় সমস্ত জটিল সমস্যাগুলি বিষয়ে সচেতন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের অন্যান্য বিষয়ে কিছু করণীয় নেই। বরং চিকিৎসকেরা সমাজে এমনই একটা উচ্চস্থানে অবস্থান করেন যে, জাতীয় স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়গুলি একত্রিতভাবে গ্রহণ করতে হয়।

একজন লোকের শারীরিক ও মানসিক সুন্দর ভার-সাম্যের অবস্থা হচ্ছে স্বাস্থ্য। জনগণের সুন্দর স্বাস্থ্যের উপরই দেশের মেরুদন্ড নির্ভর করে। মানুষের শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা সব থেকে নির্ভর করে সুন্দর স্বাস্থ্যের উপর আবার একটা জাতির উন্নতি নির্ভর করে জনগণের শক্তির উপর।

জাতীয় স্বাস্থ্য অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন জল-সরবরাহ ও নিস্কাশন, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, জন্মের হার হ্রাস, মশা নিয়ন্ত্রণ, ঔষধজ শিক্ষা ও গবেষণা এবং বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক ও আরোগ্য ইত্যাদি। অকাল মৃত্যুর হার কমাবার জন্য রোগের প্রতিষেধকের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রতি বৎসর, আরোগ্যসম্ভাবনাহীন বলে ঘোষিত যে সমস্ত রোগে লক্ষ লক্ষ মূল্যবান জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেই সমস্ত মূল্যবান জীবন রক্ষার্থে কৃতকার্যতার সঙ্গে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী।

হোমিওপ্যাথি প্রতিষেধক ও রোগ আরোগ্য সম্পর্কীত বিষয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রতিটি মানুষই কিছু বংশগত রোগ প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যেটা কিছু রোগের অত্যধিক প্রবণতার জন্য দায়ী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, গ্রহণ ক্ষমতা, রোগ জীবাণু, এবং অনুভূতি প্রবণতা প্রভৃতি দ্বারা প্রতিটি মানুষ জন্মের পর পুনরায় প্রভাবিত হয়। এই

প্রবণতা আবার বয়স,স্ত্রী পুরুষ ভেদ, পেশা, জীবনযাত্রার ধরণ ও আরও অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই প্রবণতার উপর রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ভর করে। রোগের প্রতি অত্যধিক প্রবণতা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকা নির্দেশ করে এবং রোগের প্রতি কম প্রবণতা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার আধিক্য নির্দেশ করে।

রোগ প্রতিরোধ অথবা আরোগ্য করতে গেলে, আমাদের জীবাণু ও প্রতিটি মানুষের প্রবণতার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ব্যবস্থা হিসাবে ধরা যায় জল সরবরাহ, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা সুর্য্যকিরণ, নর্দমার ময়লা জল-নিস্কাশন ব্যবস্থা, মশক নিবারণ, ইত্যাদি। রোগী-সৃষ্টিকারী জীবাণুদের ব্যবস্থা করা এবং সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা, প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য, মানসিক শান্তি এবং সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন প্রবণতা এবং সেই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, রোগের হাত থেকে শীঘ্র মুক্তি পাওয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। হোমিওপ্যাথি ধাতুগত চিকিৎসা দ্বারা এই সমস্ত বংশগত ও অর্জিত অসুস্থতাকে সংশোধিত করতে পারে এবং সেই সঙ্গে প্রবণতা কমে যায় এবং রোগও প্রতিরোধ বা নিরাময় হয়।

হোমিওপ্যাথি মানুষের স্বাতন্ত্রীকরণের উপর বিশ্বাসী। এই পৃথিবীতে কখনই দু'টি মানুষ এক রকম নয়। সুতরাং, মানুষে মানুষে তার শারীরিক গঠন, মানসিক উন্নতি, বুদ্ধি-বৃত্তি সংক্রান্ত ক্ষমতায়, বাহ্যিক উত্তেজক জিনিষের প্রতিক্রিয়ায়, পছন্দ, অপছন্দ, ঘুম, স্বপ্ন ইত্যাদি বিষয়ে ধাতুগত লক্ষণের পার্থক্য দেখা যায়। একজন মানুষ যাকে দৃশ্যতঃ সুস্থ বলে মনে হয়, সে কিন্তু উপরোক্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্যান্য মানুষের থেকে কিছু পৃথক লক্ষণ দেখাতে পারে। বিভিন্ন ধাতুগত লক্ষণ সমন্বিত প্রুভার-এর উপর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং সেই-জন্যই তাদের ধাতুগত লক্ষণ পরিবর্তন করতে পারা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। যে কোন প্রকার দৈহিক গঠনের মানুষের মধ্যে কোন অসাধারণ দৈহিক অথবা মানসিক লক্ষণ প্রকাশ পেলে, ঠিকমত বিচার করে এবং সময়মত ঔষধ দিয়ে সহজেই ভাল করা যায়। একমাত্র হোমিওপ্যাথিতে বোধহয় এই ধাতুগত চিকিৎসা সম্ভব। কারণ, আমার যতদুর সম্ভব জানা আছে, অন্যান্য শাখার চিকিৎসাবিদ্যায়, কোন লোকের মধ্যে কোন রকম ধাতুগত লক্ষণের অসাধারণ ত্বকে তাঁরা রোগ বলে মনে করেন না, যদি না তার মধ্যে কোন

গঠনগত পরিবর্তন সাধিত হয় অথবা নোসোলজিক্যাল কোন রোগের নাম দেওয়া যায়। একমাত্র মানসিক রোগ অথবা যাঁদের স্নায়ুগ্রস্থ ব্যক্তি বলা হয় তাঁদের ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ ক্ষেত্রেও তুলনামূলক পার্থক্য দেখা যায়। হোমিওপ্যাথিতে সমস্ত দৈহিক অথবা মানসিক পরিবর্তনকে রোগ বলে চিহ্নিত করা হয়। সমগ্র লক্ষণ সমষ্টির উপর ঔষধ নির্বাচন করা হয় এবং তাদের অপসারণকে আরোগ্য বলা হয়। কারণ কোন রোগ ভেতরে লুকায়িত অবস্থায় থাকতে পারে না। এটা অবশ্যই লক্ষণ অথবা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ পাবে অথবা যান্ত্রিক বা পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত তথ্য দ্বারা জানা যাবে। সেই জন্য ছেলেবেলায় ধাতুগত সামান্য পার্থক্যকে, ভবিষ্যতের সাংঘাতিক আরোগ্যসম্ভাবনাহীন রোগের ছায়া হিসাবে চিন্তা করা হয়। অর্থাৎ যে সমস্ত রোগের লক্ষণ ছেলেবেলায় দেখা যায় সেগুলিকে ভবিষ্যতের অনেক আরোগ্যসম্ভাবনাহীন রোগ লক্ষণের সুচনা হিসাবে হোমিওপ্যাথিতে চিন্তা করা হয়। সুতরাং যদি ধাতুগত ঔষধ দ্বারা ছেলেবেলোয় এই সমস্ত লক্ষণের পরিবর্তন সাধন করা যায় তাহ'লে ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর রোগবস্থা সৃষ্টি হওয়ার বহু আগেই এগুলিকে দমন করা যায়। আমরা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা প্রতিদিন সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে এটা করে থাকি। ধরা যাক, একজন শিশু টনসিল প্রদাহের জন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাধীন হল। হোমিওপ্যাথিতে আমাদের রোগীর জন্ম থেকে বর্তমান অসুস্থতা পর্যন্ত বিস্তারিত ইতিহাস সংগ্রহ করতে হবে। সেই সঙ্গে তার বংশগত ইতিহাসও নিতে হবে। শিশুর পীড়ার মূল কারণ সম্বন্ধে সযত্ন সিদ্ধান্ত বা এনামনেসিস (anamnesis)-এ উপনীত হতে হবে। এই মূল কারণ (মায়াজম-জনিত অসুস্থতা) হয় তার মায়ের অথবা বাবার দিক থেকে সুপ্ত অবস্থায় এসেছে বা আছে। প্রকৃতপক্ষে ঠিকমত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা শিশুর যে শুধুমাত্র টনসিল জনিত প্রদাহই আরোগ্য হবে তা নয়, সেই সঙ্গে তার ধাতুগত অস্বাভাবিক কোন গোলযোগ থাকলেও তাও আরোগ্য হবে। এইভাবে সেই শিশুর ভবিষ্যতের কোন আরোগ্য সম্ভাবনাহীন রোগের হাত থেকেও মুক্তি পাবে।

ক্যান্সার রোগকে একটি মিশ্র মায়াজম জনিত রোগ বলে মনে করা হয়। এর পেছনে সোরিক, সিফিলিটিক ও সাইকোটিক এই তিনটি মায়াজমই আছে। ক্যান্সার রোগগ্রস্থ পিতামাতার সন্তান সাধারণতঃ

ক্যান্সার- জনিত অসুস্থতা বহন করে অথবা অধিকার করে। যদি আমরা শিশুটিকে ধাতুগত মায়াজম বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করি তাহলে আমরা তার অস্বাভাবিক প্রবণতা সংশোধিত করতে পারি এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহকারি রোগের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পারি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়া এটা সম্ভবপর নয়। বিশ্বব্যাপী ক্যান্সারের মত মারাত্মক রোগকে আরোগ্য এবং দমনের চেষ্টা চলছে। যেহেতু নিশ্চিত কারণ বোঝা যায় নি সেই হেতু নিরলস ও ব্যয়বহুল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য লাভ করা যায় নি। এই রোগকে সমাজ থেকে নির্মূল করার ক্ষেত্রে, হোমিওপ্যাথির একটি বিশেষ ভুমিকা আছে বলে মনে হয়। ধাতুগত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অনেক ক্যান্সার রোগীকে এমনকি শেষ অবস্থায়ও আরোগ্য করেছে।

হোমিওপ্যাথিতে টিউবারকিউলোসিসকে সোরিক মায়াজম জনিত অথবা সোরিক ও সিফিলিটিক মায়াজমজনিত মিশ্র অবস্থা হিসাবে গণ্য করা হয়। টিউবারকিউলোসিস রোগগ্রস্থ পিতামাতার সন্তানের মধ্যে অল্পতেই ঠান্ডা লাগার প্রবণতা, গ্রীবা-দেশের গ্রন্থি-স্ফীতি, ক্ষুধামন্দ, ভগ্ন স্বাস্থ্য প্রভৃতি অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়। ধাতুগত সোরা-বিষঘ্ন তারপর সিফিলিস-বিষঘ্ন ঔষধ এবং আবার সোরা-বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারা এই সমস্ত শিশুদের অসুস্থতা চিরতরে আরোগ্য করা সম্ভব।

অনেক শিশুদের অন্ধ, কালা এবং বোবা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করতে দেখা যায় অথবা জন্মের অল্প কিছুকাল পরেই এই সমস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত অবস্থার জন্য সিফিলিস-জনিত অসুস্থতা অথবা জন্মগত কোন গোলোযোগ দায়ী। মাকে যদি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধাতুগত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করানো যায় অথবা শিশুটিকে যদি হোমিওপ্যাথিক ধাতুগত চিকিৎসা করান হয় তাহলে অধিকাংশক্ষেত্রে এই সমস্ত অবস্থার নিরাময় করা সম্ভব। নিজেদের অভাগা, অসহায় এবং সমাজের অভিশাপ হিসাবে চিন্তা করার পরিবর্তে তাদের পক্ষেও অন্যান্য সাধারণ লোকের ন্যায় সুন্দর জীবন যাপন করতে পারা বোধ হয় সম্ভবপর।

কুষ্ঠও আমাদের দেশে বহু প্রচলিত একটি ভয়ঙ্কর রোগ। কুষ্ঠ রোগীরা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ সমাজচ্যুত ভাবে নির্জন জীবন যাপন করেন। এমনকি কুষ্ঠ রোগীর পরিবারের অন্যান্য লোকজনও (রোগের ছোঁয়াচে লাগার ভয়ে) তাঁর সঙ্গে একই পরিবারে বসবাস করতে চান না। নিঃসন্দেহে এটা একটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার এবং আমরা সময়মত শৈশবকালে ধাতুগত ঔষধ দ্বারা এই ভয়ঙ্কর রোগের হাত থেকে সম্ভবতঃ তাদের মুক্ত করতে পারি।

সেইরকম ব্রঙ্কীয়াল অ্যাসমা (Bronchial Asthma), ডায়েবেটিস মেলিটাস (Diabetes Mellitus), স্পন্ডিলাইটিস (Spondylities), লিউপাস এরিথিমেটোসাস (Lupus Erythematosus), সিকল-সেল এনিমিয়া (Sickle cell anaemia), থেলাসিমিয়া (Thallassaemia), লিউকিমিয়া (Leukaemia) এবং আরও অন্যান্য রোগ যেগুলিকে বংশগত উৎপত্তি হিসাবে বলা হয় বা মনে করা হয়, সেগুলিকেও দমন করা সম্ভব যদি মাকে অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় অথবা সন্তানকে জন্মের ঠিক পরেই ধাতুগতভাবে চিকিৎসা করান যায়। উপরক্ত ধাতুগত চিকিৎসা একজন মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় যেটা তাকে ফলপ্রসুভাবে বংশগত রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বা বাধাদানের ক্ষমতা দেয়।

উপরোক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে ভারতের সর্বত্র বেশ কিছু সংখ্যক মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ চিকিৎসা কেন্দ্র খুলতে হবে যেখানে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা তাঁদের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এবং শিশুরা জন্মের ঠিক পরেই বাধ্যতামূলকভাবে চিকিৎসিত হতে পারে। দেশের বিভিন্ন স্থানে নবদম্পতিদের জন্যও ক্লিনিক খুলতে হবে, যেখানে তাঁরা কোন সন্তান কামনা করার পূর্বে, ধাতুগত বিশৃঙ্খলার জন্য নিজেদের চিকিৎসা করাতে পারেন, যাতে করে বংশগত অসুস্থতা যতদুর সম্ভব দূর করা যায়।

কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে, এই সমস্ত রোগ মহামারী আকার ধারণ করার পূর্বে সময়মত যথোপযুক্ত শক্তিকৃত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সাফল্যের সহিত গড়ে তোলা যায়। এমনকি, মহামারী আকার ধারণ করার পরও এই সমস্ত রোগ যাতে সাধারণ মানুষকে

আক্রমণ করে ছড়াতে না পারে, সেটাও সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। অবশ্য এর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের জন্য দরকার বিরাট পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিসংখ্যান তথ্য।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধাবলীর দাম কম এবং সহজেই প্রয়োগ করা যায় এবং সেইজন্য সরকার যদি সাহায্য করেন তবে কম খরচে বিরাট ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করে এলোমেলো অ্যান্টিবায়টিকস ঔষধের ব্যবহার, চর্ম্মরোগের উপর প্রলেপ দেওয়া, অযথা অস্ত্র-চিকিৎসা প্রভৃতি চিররোগ চাপা পড়ার অন্যতম কারণ। সেই সঙ্গে পুনঃপুনঃ টিকা নেওয়াও অনেক দূরারোগ্য রোগের কারণ। হোমিওপ্যাথিক ধাতুগত চিকিৎসা এই সমস্ত অবস্থা সাফল্যের সঙ্গে আরোগ্য করতে পারে, অবশ্য অবস্থা যদি খুব অবনতির দিকে না গিয়ে থাকে।

হোমিওপ্যাথি আরও বিশ্বাস করে যে, চির-রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে, এই চিকিৎসা পদ্ধতিই (সদৃশ বিধান মতে চিকিৎসা, যেটা প্রকৃতির রোগ-আরোগ্য সম্বন্ধীয় নিয়মের উপর নির্ভরশীল) একমাত্র পথ। এই নিয়মের বিপরীত অন্য চিকিৎসা পদ্ধতি একমাত্র উপশমদায়ক, এবং এই উপশম দেওয়াই বহু আরোগ্য সম্ভাবনাহীন রোগের মূল কারণ। এসব ক্ষেত্রেও হোমিওপ্যাথি কৃতকার্যতার সহিত উপশমের কুফলগুলিকে আয়ত্বের মধ্যে আনতে পারে এবং সেইসঙ্গে আরোগ্যসম্ভাবনাহীন অবস্থার সুচনাকেও বাধা দিতে পারে।

এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন করতে হ'লে প্রচুর অর্থ এবং পরিচালন ব্যবস্থার দরকার এবং সেটা একমাত্র সরকারের চেষ্টাতেই সম্ভব। অপরদিকে, আমরা যাতে করে এই ধরণের দায়িত্বপূর্ণ কাজ প্রয়োজন মত সম্পন্ন করতে পারি তার জন্য দরকার হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের সম্যক জ্ঞান।

আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রাম্য স্বাস্থ্য উন্নয়ণ প্রকল্পে হোমিওপ্যাথি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারে, যদি ভারত সরকার অথবা রাজ্য সরকার এই চিকিৎসা শাস্ত্রের দিকে আরও একটু নজর দেন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা এই ধরণের সুযোগের সদব্যবহার করতে পারেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলাকালীন রোগীর পথ্য, ব্যায়াম ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নিয়ম ও নিষেধাবলী
(Diet and Regimen during the Course of Homoeopathic treatment)

হ্যানিম্যান তাঁর ক্রনিক ডিসিজ্ গ্রন্থে রোগীর পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে একটা তালিকা দিয়েছেন। তাঁর অর্গ্যানন গ্রন্থেও এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান উপদেশ বলে আমি যেটা মনে করি সেটাই প্রথমে আলোচনা করছি।

হ্যানিম্যান বলেছেন রোগীকে আরোগ্য করাই যখন চিকিৎসকের একমাত্র ব্রত তখন পথ্যাপথ্য এবং আনুষঙ্গিক নিয়মাবলী সম্পর্কে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে অবশ্যই রোগীর অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে রোগীরই স্বার্থে বিধি-নিয়মের কড়াকড়ি যথেষ্ট শিথিল করে রোগীর অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে হবে। রোগীর পক্ষে মেনে চলা সম্ভব নয় এমন সব বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি করলে আরোগ্য লাভ তো দূরের কথা রোগীর পক্ষে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করাই হয়ত সম্ভব হবে না। অনেকের ধারণা বিধি-নিষেধের কড়াকড়ির ফলে আরোগ্য ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় তার ফল হয় বিপরীত। কফি খাওয়া ক্ষতিকর বলে হ্যানিম্যান বলেছেন কিন্তু কোন ব্যক্তি হয়ত শিশুকাল থেকেই কফি খেতে অভ্যস্ত। তার ক্ষেত্রে কফি একেবারে বন্ধ করলে তার হয়ত নানারকম মানসিক অথবা দৈহিক অবসাদ জনিত লক্ষণের সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে কফির অভাব-বোধটা আরোগ্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই একেবারে কড়াকড়িভাবে সব কিছু বন্ধ না করে মধ্য-পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়।

পথ্যাপথ্য নির্বাচনে দু'টি বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে-(১) ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট হয় বা ব্যাহত হয় এমন কিছু যেন রোগী না খান বা

করেন এবং ২) রোগী যে রোগে ভুগছেন সেই রোগের পক্ষে ক্ষতিকর কোন কিছু না খান বা করেন।

পেঁয়াজ থুজার প্রতিষেধক। কাজেই কোন রোগীকে থুজা ঔষধ প্রয়োগ করলে তাকে পেঁয়াজ খেতে নিষেধ করা উচিত। এই রকম প্রত্যেক ঔষধের যে প্রতিষেধক তালিকা দেওয়া আছে রোগীর খাদ্য তালিকা থেকে সেই সব দ্রব্য বাদ দেওয়াই উচিত। এখানে, একটা কথা আমি বলতে চাই যে, শক্তিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া কোন খাদ্যই সম্পূর্ণ নষ্ট করতে পারে না- তবে তার ক্রিয়া আংশিক ব্যাহত হতে পারে মাত্র। নিয়মিত পেঁয়াজ খেয়ে চলেছে এমন রোগীতেও থুজা ভালভাবে ক্রিয়াশীল দেখেছি এবং দেখছি। কফি, কর্পূর, হিং ইত্যাদিতে ঔষধজ গুণ বর্তমান থাকায় এগুলি চিকিৎসা চলাকালীন রোগীর পক্ষে গ্রহণ না করাই ভাল। কিন্তু এগুলি গ্রহণ করলেও ঔষধ কাজ করবে এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে ঘরোয়া ঔষধ ব্যবহার খুবই ক্ষতিকর। যেমন অনেকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সাথে দূর্বার রস, শিউলি পাতার রস, কালমেঘ, চিরতার জল, ইসবগুলের ভুসি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। এগুলি কিছুতেই অনুমোদন করা চলে না। কারণ এদের ঔষধজ ক্রিয়া, ঔষধের ক্রিয়ার সাথে মিশে ভুল চিত্র দেবে- যার ফলে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্বাচনে খুবই অসুবিধা হবে। কাজেই এই ধরণের ঘরোয়া ঔষধ একেবারেই নিষিদ্ধ করতে হবে। এখানে কোন আপোষ করলে রোগীর পক্ষে তা অবশ্যই ক্ষতিকর হবে।

হৃদ-রোগের রোগীকে বেশী পরিশ্রম করতে দেওয়া যেমন কখনই উচিত নয় তেমনি মেদবহুল রোগীর পক্ষে পূর্ণ বিশ্রাম ক্ষতিকর। অপ্রকৃত চির-রোগে (Pseudo Chronic disease) রোগের কারণ অনুসন্ধান করে তার প্রতিকার করতে না পারলে কোন ঔষধেই তাকে আরোগ্য করা সম্ভব হবে না। রোগীকে ঔষধ দেওয়া চিকিৎসকের একমাত্র কাজ নয়। সঠিক পথ্য নির্বাচন, আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় বিষয় সমুহের যথোপযুক্ত প্রয়োগ-কৌশল এবং রোগী আরোগ্যের সহায়ক যে কোন ব্যবস্থার সময়মত সাহায্য গ্রহণ চিকিৎসকের একান্ত কর্তব্য। হাড় ভেঙ্গে গেলে সঠিকভাবে জোড়া লাগার জন্য প্লাস্টার (Plaster) করা, পক্ষাঘাতগ্রস্থ

রোগীর জন্য ফিজিওথেরাপির (Physiotherapy) সাহায্য গ্রহণ করা, ডিফথিরিয়া রোগীর জীবন রক্ষায় প্রয়োজনবোধে ট্রেকিওটমির সাহায্য নেওয়া, কলেরা রোগীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে স্যালাইন-এর সাহায্য নেওয়া প্রভৃতি নানাবিধ সাহায্যকারী চিকিৎসা সমূহ চিকিৎসককে অবশ্যই জানতে হবে এবং প্রয়োজনমত কাজে লাগাতে হবে। অস্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য কতই না দৈহিক ও মানসিক রোগ দেখা দিচ্ছে। ঔষধ প্রয়োগের সাথে সেই অস্বাভাবিকতা দূর করতে না পারলে আরোগ্য হবে কি ভাবে? সেইজন্য হ্যানিম্যান চিকিৎসককে (Preserver of health) হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। শুধুমাত্র যথাযথ উপদেশ, সমতাপূর্ণ খাদ্য তালিকা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নির্দেশাবলীর দ্বারা বহু রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকেন। মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ, যোগাসন ইত্যাদিও রোগ আরোগ্যে যথেষ্ট সাহায্য করে। কাজেই Diet ও Regimen নির্বাচন করার আগে চিকিৎসককে উপরোক্ত বিষয়গুলির কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে।

এবারে দেখা যাক হ্যানিম্যান Diet ও Regimen সম্বন্ধে কি নির্দেশ দিয়েছেন।

অর্গ্যাননে তিনি লিখেছেন তরুণ রোগে Diet ও Regimen সম্বন্ধে [illegible]কম কড়াকড়ি করার প্রয়োজন নেই। রোগী যা খেতে চায় বা যেভাবে থাকতে চায় তাকে তা করতে দেওয়া যেতে পারে। কারণ, সাধারণতঃ তরুণ রোগে রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর কোন খাদ্য রোগী চায় না- বরং এই সব খাদ্যের প্রতি একটা তীব্র অনিচ্ছা দেখা যায়। তার কারণ হলো রোগের আকস্মিকতা, ভয়াবহতা এবং উত্তেজক কারণ বর্তমান থাকা। তরুণ রোগ হঠাৎ আক্রমণ করে এবং ভীষণভাবে তার লক্ষণ প্রকাশ করে। জীবনীশক্তি এখানে চির-রোগের তুলনায় যথেষ্ট সতেজ থাকে। প্রকৃতির স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধী শক্তিতে জীবনীশক্তি তরুণ রোগের উত্তেজক কারণকে দ্রুত অপসারিত করার চেষ্টা করে। ফলে উত্তেজক কারণের সহায়ক এবং জীবনীশক্তিকে দূর্বলতর করার পক্ষে সহায়ক কোন খাদ্য বা ব্যায়াম ইত্যাদি রোগী স্বাভাবিকভাবেই চাইবে না। যদি চায়ও তবু সেই খাদ্য তাকে খেতে দিলে এমন

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে যে ডাক্তারও রোগী উভয়েই বুঝতে পারবেন উক্ত খাদ্য তার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। নিউমোনিয়া রোগীর পক্ষে খোলা হাওয়া খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ ফুসফুসের Consolidation এর জন্য অক্সিজেনের অভাব ঘটে-অবশ্য জোলো হাওয়া বা শীতের ঠান্ডা হাওয়ার কথা বলছি না। কিন্তু হেপার সালফ এর রোগী কিছুতেই খোলা হাওয়া চাইবে না, তাতে তার অস্বস্তি বাড়বে। কাজেই এই রোগীতে জোর করে তার মাথার কাছের জানালা খুলে রাখলে তার ক্ষতিই হবে। এক্ষেত্রে রোগীর শয্যা থেকে দূরের কোন জানালা খুলে রাখাই শ্রেয়। কোন প্রদাহে সেঁক দিলে সাধারণতঃ রোগী আরাম বোধ করে। কিন্তু এমন রোগীও আছে যার সেঁক মোটেই ভাল লাগে না বরং সে আক্রান্ত স্থানে ঠান্ডা প্রয়োগ করতে চায়। এক্ষেত্রে জোর করে গরম সেঁক দিলে রোগীর ক্ষতিই হবে। কাজেই তরুণ রোগে রোগীর পছন্দমত ব্যবস্থা করাই ভাল যদি না সেই ব্যবস্থা রোগীর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর বলে চিকিৎসক মনে করেন। যেমন Gastor-Enteritis এর রোগী যদি ভরপেট খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে তা কখনই অনুমোদন করা সম্ভব নয়।

চির-রোগের প্রকৃতি সম্পুর্ণ আলাদা। চির-রোগ অতি ধীরে শুরু হয়-এমনকি রোগী বুঝতেও পারে না কখন সে রোগাক্রান্ত হ'য়েছে। দীর্ঘদিন পরে যখন রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যান্ত্রিক পরিবর্তন দেখা দেয় তখনই রোগীর অসুস্থতা ধরা পড়ে। জীবনীশক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে এতই নিস্তেজ হয়ে পড়ে যে ক্ষতিকর খাদ্য, ব্যায়াম ইত্যাদিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না, বরং ক্ষতিকর খাদ্য ইত্যাদির উপর রোগীর একটা অস্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায়। কারণ চির-রোগের প্রকৃতিই হলো সুনির্বাচিত এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধ ছাড়া আরোগ্য তো হবেই না- বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং এই বৃদ্ধির অনুকুল পরিবেশই সে সৃষ্টি করতে চাইবে। কাজেই চির-রোগের ক্ষেত্রে অতি বিচক্ষণতার সাথে রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেই তবেই তার পথ্যাপথ্য ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি স্থির করতে হবে হ্যানিম্যান যে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নির্দেশ করে গেছেন তা এই চির-রোগের নিরাময়ের জন্যই বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের জন্য তিনি কেবলমাত্র পেঁয়াজ ও লঙ্কার ব্যবহার সীমিত করতে বলেছেন, অন্য খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে কোন প্রকার কড়াকড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তার কারণ কি? দরিদ্র শ্রেণীর লোকের পক্ষে খাদ্যের কড়াকড়ি মেনে চলা প্রায় অসম্ভব। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র মত পথ্যের ব্যবস্থা করা তাঁদের সাধ্যের বাইরে। তাছাড়া ঔষধের পক্ষে ক্ষতিকর খাদ্যদ্রব্য তাঁরা কমই গ্রহণ করেন। যাই হোক, দরিদ্রের বেলায় যদি খাদ্যা খাদ্যের কড়াকড়ি ছাড়াই চিকিৎসা সম্ভব হয় তবে অন্য শ্রেণীর বেলাতেও বা তা হবে না কেন? আসলে ধনী শ্রেণীর লোকেরা অধিকতর অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রণালীতে অভ্যস্ত। তাঁরা ঔষধজ গুণ সম্পন্ন এত বেশী জিনিষ ব্যবহার করেন যে সুক্ষ্ম শক্তির ঔষধের ক্রিয়া সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই হ্যানিম্যান তাঁদের বেলায় একটু বেশী মাত্রায় কঠোর হয়েছেন।

গন্ধদ্রব্য যথা সেন্ট, উগ্রগন্ধযুক্ত পাউডার, স্নো ইত্যাদি, সুবাসিত গোলাপ জল, এমনকি গন্ধযুক্ত দাঁতের মাজন পর্যন্ত হ্যানিম্যান চির-রোগ চিকিৎসাকালে ব্যবহার নিষেধ করেছেন। যে কোন গন্ধ দ্রব্যের ক্রিয়া স্নায়ুর উপর ডাইনামিসের ন্যায় কাজ করে। যদিও এই ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী তবু তা ঔষধের ডাইনামিক ক্রিয়াকে প্রভাবিত বা অংশতঃ বিঘ্নিত করার ক্ষমতা সম্পন্ন। কিন্তু বর্তমান যুগে মধ্যবিত্ত বা ধনী শ্রেণীর রোগীর এইসব দ্রব্য ব্যবহার সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ করলে তাঁদের পক্ষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা হয়ত সম্ভব হবে না। কফি, নস্য এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ। ঔষধের ক্রিয়া বিঘ্নিত হওয়া ছাড়াও এদের প্রত্যেকটির ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয় উপেক্ষা করা যায় না। তবুও কফির পেয়ালায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ মিশ্রিত বটিকা মিলিয়ে বা মদের গ্লাসে ঔষধের পুরিয়া ঢেলে খেলেও ঔষধের ক্রিয়া হতে দেখেছি। আমাদের দেশে নস্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা নগণ্য নয়। তাঁদের পক্ষেও নস্য ত্যাগ করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চালান অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। হালকা চা দিনে একবার বা দুবারের বেশী খেতে দেওয়া উচিত নয়, এমনকি সম্ভব হলে একেবারে বন্ধ করাই ভাল। ভিনিগার খুব টকজাতীয় দ্রব্য, এমনকি টক ফল বেশী খেতে দেওয়া উচিত নয়। যেসব রোগী ধাতু দৌর্বল্য আছে তাদেরকে মুরগী, ডিম ও মশলা দেওয়া খাবার বেশী খেতে দেওয়া উচিত

নয়। যে সব স্ত্রীলোকদের মাসিক ঋতুস্রাব খুব কম হয় তাদেরকে লবঙ্গ, দারুচিনি, মুস্কিপাতি ইত্যাদি খেতে দেওয়া উচিত নয়। হজমের গোলমালযুক্ত রোগীদের মশলা, লবঙ্গ, দারুচিনি, লঙ্কা, তিতা, মরিচ ইত্যাদি খেতে দেওয়া উচিত নয়। যে সব শাক সবজীতে পেটে গ্যাস জমে সেগুলি বর্জন করাই ভাল। ধূমপান যথাসম্ভব কমানো বা একেবারেই বর্জন করা ভাল।

পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে হ্যানিম্যান বলেছেন, অন্তর্বাস সুতীর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পশমের অন্তর্বাস ব্যবহার করা উচিত নয়। এটা অবশ্য তিনি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হিসেবেই নিষেধ করেছেন। মানসিক উত্তেজনাকর বিষয়সমূহ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা একান্ত দরকার- যথা মানসিক দুশ্চিন্তা, অশান্তি, ভয়, দুঃখ, নৈরাশ্য, রাগ, অভিমান ইত্যাদি। ক্রমাগত মানসিক অশান্তির কারণ বর্তমান থাকলে আরোগ্যের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নিয়মানুবর্তিতা, সংযত জীবনযাপন, কিঞ্চিত ব্যায়াম, ভ্রমণ, যোগাসন ইত্যাদিও রোগ আরোগ্যে যথেষ্ট সাহায্য করে। সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি দেখা, হাসি, ঠাট্টা, আনন্দদায়ক গান শোনা ইত্যাদি নিষেধ তো নয়ই বরং আরোগ্যের পক্ষে সহায়ক। কিন্তু তাস খেলা, দাবা খেলা ইত্যাদি একেবারেই অনুমোদন করা উচিত নয়। কারণ এইসব খেলায় মানসিক চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদি দেখা দেয় এবং স্নায়ুর উপর যথেষ্ট চাপ পড়ে। রাত্রি জাগরণ, অনিয়ম, মানসিক দুশ্চিন্তা, ভয় ইত্যাদির ফলে অসুস্থতা দেখা দিলে সেই উত্তেজক অথবা বাহক কারণ দূর না করলে সুনির্বাচিত ঔষধেও আরোগ্যের আশা বৃথা।

সমাপ্ত